বিহানবেলা

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

মমতা প্রকাশনী
১১, পারমার রোড
ডাকঘর : ভদ্রকালী
জেলা : হুগলী

প্রকাশিকা :
মমতা প্রকাশনী
৯৯, পারমার রোড
ডাকঘর : ভদ্রকালী
জেলা : হুগলী

প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন, ১৩৬৪

প্রচ্ছদ চিত্রণ : শ্রীপূর্ণেন্দু পত্রী

মুদ্রক :
শ্রী সুরেন্দ্রনাথ দাস
বাণীরূপা প্রেস
৯ এ, মানামোহন বসু স্ট্রীট
কলিকাতা—৬

বিশ্বের সব প্রাতঃ ভ্রমণকারীর উদ্দেশে

ভোরে ঘুম ভাঙলেই তাঁর দোতলা বাংলো থেকে নেমে, সবুজ মাঠটা পার হয়ে ওপাশের মস্ত অরফানেজটা একবার রাউন্ড দিয়ে আসা ফাদার উইলিয়ামের বহু দিনের অভ্যাস। আজ যখন ঘুম ভাঙল, তখনও রাত শেষ হয় নি, বাইরে অন্ধকার দেখে দেওয়ালঘড়িটার দিকে তাঁর ঘুমচোখ ন্যস্ত করতে দেখলেন, কাঁটাদুটো একশো ডিগ্রির মতো একটা কোণ তৈরি করে জানান দিচ্ছে, চারটের ঘণ্টা শব্দ করে বেজে উঠবে এখনই।

পাজামার ওপর সাদা আলখাল্লা ধরনের পোশাকটা পরে নীচে নেমে দ্রুত পার হয়ে চললেন দুপাশে দুটো সবুজ মাঠের ভেতর দিয়ে লাল সুরকি ফেলা পথটা। এখনও দুটো মাঠই শান্ত, সুনসান, জনপ্রাণীটি নেই, শুধু খাকি উর্দি পরা তাঁদের গার্ডদের একজন রামবিলাস চোখ ডলে ঘুম তাড়াতে তাড়াতে ধীরপায়ে এগিয়ে চলেছে গেটের চাবি খুলতে। আর একটু পরেই দক্ষিণের এই শহরতলিটার এ-পাড়া ও-পাড়া থেকে কিছু স্বাস্থ্যপিপাসু মানুষ একে-একে এসে ঢুকবেন গেট দিয়ে, শুরু করবেন মাঠ জুড়ে তাঁদের প্রাত্যহিক রাউন্ড।

লাল সুরকির পথ দ্রুত পার হয়ে ফাদার উইলিয়াম অর্ফানেজটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন একলহমা। ভেতরে প্রতিটি ঘরেই এখনও স্তব্ধ হয়ে আছে ভোররাতের ঘুম, তবে তা খুব বেশিক্ষণের জন্য নয়, ঠিক পাঁচটার সময় বেজে উঠবে জেগে ওঠার অ্যালার্ম। অ্যালার্ম বাজিয়ে দেবে ওই রামবিলাস। সত্তরের কাছাকাছি পৌঁছেও সাদাচুলের রামবিলাস কর্তব্যপরায়ণতায় তার প্রথম যৌবনের মতো এখনও টায়টায় পাঙ্কুয়াল।

অ্যালার্ম বাজার সঙ্গে সঙ্গে অর্ফানেজের প্রতিটি ঘরেই তখন শোনা যাবে তৈরি হওয়ার হুড়োহুড়ি। দ্রুত মুখ হাত ধুয়ে জামাপ্যান্ট পরে নিয়ে প্রার্থনাগৃহে যাওয়ার প্রস্তুতি চলবে কিছুক্ষণ। ঠিক ভোর ছ' টায় প্রেয়ার। তার আগে তৈরি হয়ে নিতে হবে ফাদারকেও।

নিঃশব্দ, গভীর ঘুমের ভেতর লীন হয়ে থাকা অর্ফানেজটির সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে, এপাশে ওপাশে ঘোরাঘুরি করে নিশ্চিন্ত হলেন ফাদার উইলিয়াম, যেন একজন পিতা তাঁর সন্তান-সন্ততিদের অঘোরে ঘুমিয়ে থাকতে দেখে স্বস্তি বোধ করছেন। হ্যাঁ, এরা তো তাঁর সন্তানের মতোই।

অথচ এই প্রতিষ্ঠানটিতে যখন যোগ দিয়েছিলেন ফাদার ম্যাকডোনাল্ডের আহ্বানে, সেদিন তিনি কিন্তু ভাবেনওনি ক' বছরের মধ্যেই এভাবে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়বেন এতগুলি অনাথ বালকের ভবিতব্যের সঙ্গে। ফাদার ম্যাকডোনাল্ড তাঁকে যিশুর কথা বলতেন, বারবার শোনাতেন যিশুর উপদেশগুলি, 'যিশু বলতেন, তোমাদের মধ্যে যে বড় হতে চায়, তাকে হতে হবে তোমাদের সেবক। মানবপুত্র তো সেবা পাওয়ার জন্য আসেনি ; সে এসেছে সেবা করতে এবং বহু মানুষের মুক্তিপণ হিসেবে নিজের প্রাণ বিসর্জন করতে।' তারপর বহুদিন এ-মিশন ও-মিশনে ব্রাদার হিসেবে নিজেকে তৈরি করার পর মিশনের নিয়ম অনুযায়ী একদিন দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন যাতে ফাদারপদে অভিষিক্ত হতে পারেন যথাসময়ে। পিতৃদত্ত নাম বদলে যেদিন ফাদার উইলিয়াম হলেন, তখনও জানতেন না এত বড় প্রতিষ্ঠানটির ভার তাঁর কাঁধেই বর্তাবে একদিন। তারপর একসময় অনুভব করলেন, এই মিশন, এই অর্ফানেজ, এই সবুজ মাঠ তাঁর রক্তের গভীরে শিকড় চারিয়ে দিয়েছে, তাঁর সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই।

এখন এই প্রতিষ্ঠানটিই ফাদার উইলিয়ামের ধ্যান, জ্ঞান, স্বপ্ন। এই অনাথ বালকেরাই তাঁর সন্তান।

অর্ফানেজটি নিরীক্ষণ করে পরম নিশ্চিন্ততায় যে মুহূর্তে পেছন ফিরতে যাবেন, তখনই একটা ছোট্ট 'খুট' শব্দ শুনে সচকিত হয়ে দেখলেন, অর্ফানেজের ভেতর থেকে দরজা খুলে বেরিয়ে আসছে ডালিম। ডালিম নামটি তাঁরই দেওয়া। ন-দশ বছরের ফর্সা, ফুটফুটে চেহারার বালকটি বলতে গেলে তাঁরই হাতে গড়া। আজও ভোররাতে ঘুম ভেঙে বাইরে এসেই ফাদারকে দেখতে পেয়ে তার সাদা ঝকঝকে দাঁত মেলে হাসল, গুড মর্নিং, ফাদার।

—গুড মর্নিং, ফাদার উইলিয়াম এগিয়ে গিয়ে সস্নেহে তার কাঁধে হাত রাখলেন, এর মধ্যে ঘুম ভেঙে গেল!

—রোজই এরকম ভোরে ঘুম ভেঙে যায় আমার। তখন আর বিছানায় শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করে না।

—দেন গেট রেডি, বলে ছোট্ট ডালিমের পিঠে আলতো করে চাপড় দিলেন আবার, ভোরে ঘুম থেকে উঠতে পারাই তো স্বাস্থ্যের লক্ষণ। রেডি হয়ে একটু পরে

মাঠে ছোটাছুটি করে এসো।

ডালিম আর একবার তার সরল, সুন্দর হাসিটি ফাদারকে উপহার দিয়ে তার ঘরে ঢুকে গেল পরক্ষণে। ফাদার উইলিয়াম তার ওপর কিছুক্ষণ নজর রেখে আবার ফিরে চললেন তাঁর বাংলোর দিকে। হাঁটতে হাঁটতে কিছুটা অন্যমনস্কও হয়ে পড়লেন সহসা। গোটা অর্ফানেজে তাঁর অনেক সন্তান-সন্ততি, তবু তারই মধ্যে দু-একটা মুখ কেন যেন তাঁকে উদাস, বিভোর করে তোলে প্রায়শ। ঠিক এমনই একটি মুখ ডালিমের। গত এক-দেড় বছর হল অর্ফানেজের পরিবেশে নিজেকে মোটামুটি মানিয়ে নিতে পেরেছে সে। অনেকটা সহজ হয়ে উঠেছে। হাসি-খুশিও হয়ে উঠেছে আগের চেয়ে। আজও তার অনাবিল নিষ্পাপ মুখখানা দেখে এই পবিত্র ভোরে একটা অদ্ভুত তৃপ্তিতে ভরে উঠল ফাদারের শরীর।

এক-দেড় বছর আগেও কিন্তু ভারী গম্ভীর আর রুক্ষ দেখাতো ডালিমকে। অর্ফানেজে আরও বহু অনাথ বালকদের পাশে তাকে মনে হত বিষণ্ণতার একটি প্রতীক। কারও সঙ্গে মিশত না, কথা বলত না, সারাক্ষণ অর্ফানেজের বারান্দার এককোণে, কিংবা মাঠের ঘাসের ওপর বসে অপলক তাকিয়ে থাকত আকাশের দিকে। কেউ তার কাছে গিয়ে বসলে, কিংবা কথা বললে রুক্ষগলায় বলত, কেন বিরক্ত করছেন?

এমনকী ফাদার উইলিয়াম পর্যন্ত সস্নেহে তার পিঠে হাত রেখে, তার সঙ্গে কথা বলে, হেসে, তাকে সহজ করে তুলতে চাইলে সে ফাদারের দিকে না তাকিয়েই বলত, আমাকে আমার মতো থাকতে দিন না।

ফাদার তার এই উদাসীনতায়, উপেক্ষায় কিংবা রুক্ষতায় রুষ্ট হননি কখনও। বরং আরও বেশি করে কাছাকাছি হওয়ার চেষ্টা করেছেন ডালিমের। শিশুদের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর ঢের ঢের অভিজ্ঞতা। তিনি ভালই উপলব্ধি করতে পারেন কেন ডালিমের এই শোকার্ত চেহারা, কেন তাঁর একান্ত আন্তরিকতা, নিবিড় সাহচর্যের পরেও ডালিম স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারছে না।

তাই-ই তিনি ধীর, শান্তভাবে অপেক্ষা করেছেন। সময় বয়ে যেতে দিয়েছেন ডালিমের ওপর সস্নেহ নজর রেখে। তিনি জানেন, সময়, একমাত্র সময়ই মানুষকে ভুলিয়ে দিতে পারে সমস্ত শোক, দুঃখ। ডালিম শিশু বলেই তার মনের ভেতর যে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে তার গভীরতা অনেক বেশি। শুধু ক্ষত নয়, একটা শক। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট মানুষ যদি কোনও ক্রমে বেঁচে যায়, তবে সেই ভয়ঙ্কর ঝাঁকুনির রেখা তাকে তাড়িয়ে বেড়ায় বাদবাকি জীবন।

ডালিমকে এই অর্ফানেজে কুড়িয়ে নিয়ে এসেছিলেন ফাদার উইলিয়াম নিজেই।

এ নয় যে, ডালিম কোনও অবৈধ সন্তান, কোনও ভুলের ফসল। এ নয় যে, সে পড়ে ছিল পথের ওপর, উপেক্ষিত, অনাদৃত, পিতৃমাতৃপরিচয়হীন। সে প্রায় ছ' বছর আগেকার কথা, যখন হঠাৎই ডালিমের খবর পৌঁছেছিল ফাদার উইলিয়ামের কাছে। আর পাঁচটা ফুটফুটে শিশুর মতোই পৃথিবীর বুকে তার মায়ের কোলে চোখ মেলেছিল সুন্দর ডালিম। বড় হয়ে উঠছিল তার বাবা-মায়ের কাছে। এক তরুণ শিখ-দম্পতির একমাত্র সন্তান তখন টুকটুক করে কথা বলে সারাক্ষণ। দিল্লির শিখ-অধ্যুষিত এলাকায় আরও পাঁচটা দম্পতির মতো ডালিমের বাবা-মাও সোনালি স্বপ্ন দেখছিলেন তাঁদের সন্তানকে ঘিরে।

সে সময় হঠাৎই এক বীভৎস ঘূর্ণির ভেতর টাল খেয়ে তলিয়ে গিয়েছিল গোটা ভারতবর্ষ। দেশের প্রধানমন্ত্রীকে দুই শিখ নিরাপত্তারক্ষী গুলি করে হত্যা করতেই যে অভূতপূর্ব পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, তার জেরে দিল্লির শিখ-অধ্যুষিত কলোনিতে এক নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড চলেছিল ক'দিন ধরে। ডালিমের নাম তখন কী ছিল তা ফাদার জানেন না, তিন বছরের সেই শিশুপুত্রের চোখের সামনে একদল পশু নির্বিচারে হত্যা করেছিল তার বাবা-মাকে। শিশুটিকে কেন রেহাই দিয়েছিল পশুগুলি, তা কেউ জানে না। কেন না এরকম আরও বহু শিশুরই সেসময় প্রাণান্ত হয়েছিল জহ্লাদদের অস্ত্রের মুখে।

ফাদার উইলিয়াম মিশনেরই কাজে দিল্লিতে ছিলেন সেসময়। গোটা দিল্লি যখন শিখনিধনযজ্ঞে মত্ত, তিনি যীশুর কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন মত্ত পশুদের সুমতি ফেরানোর জন্য। দাঙ্গা থেমে গেলে ফাদার উইলিয়াম সেই শ্মশানপুরীতে দাঁড়িয়ে হঠাৎই খবর পেয়েছিলেন তিনবছরের সদ্য পিতৃমাতৃহীন এই শিশুটির। ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে দেখেছিলেন বাঘের তাড়া-খাওয়া হরিণশিশুটির মতো ভয়ে নীল হয়ে তখনও যেন থরথর কাঁপছে সদ্য অনাথ হওয়া বালক।

তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ফাদার, শিশুটিকে তিনি তাঁদের অনাথ-আশ্রমে নিয়ে গিয়ে প্রতিপালন করবেন নিজের মতো করে। নিজেই তার নামকরণ করেছিলেন ডালিম।

সেই শিশুটিকে এতখানি বড় করে তোলার পেছনে তাঁর কত যে মেহনত তা সবাই জানে না। কতদিন কতরাত যে শিশুটি ভয়ে, আতঙ্কে নীল হয়ে উঠেছে, কখনও ফুঁপিয়ে, কখনও ডুকরে কেঁদেছে অনন্ত সময় ধরে। তাকে শান্ত করতে, স্বাভাবিক করে তুলতে ঘাম ছুটে গেছে তাঁর। তবু কি স্বাভাবিক হতে পেরেছিল ডালিম! হওয়ার তো কথাও নয়, কেননা অতটুকু শিশুর চোখের সামনে সেই বীভৎস হত্যাদৃশ্য, রক্তস্রোত, তার পরেও কি কোনও শিশু ক্ষমা করতে পারে পৃথিবীর

মানুষদের! তখন সব মানুষই তো তার চোখে জহ্লাদ।

ফাদার উইলিয়াম আজ, এতকাল পরেও ভুলতে পারেন না, কতখানি ঘৃণা জমা হয়েছিল কাঁদতে ভুলে যাওয়া সেই শিশুর ছোট্ট চোখ দু'টোয়। সে দৃশ্য যতবার মনে পড়ে, আজও আতঙ্কে কেঁপে ওঠেন তিনি।

আজ বাংলোয় ফিরেও বহুক্ষণ সেই স্মৃতিকাতরতায় আচ্ছন্ন হয়ে রইলেন ফাদার উইলিয়াম। বাংলোর বারান্দায় পায়চারি করতে করতে এমন বহু বিষন্নতাই তো তাঁকে তাড়া করে প্রায়শ। একটু পরেই সব দুঃখ, সব হতাশা, সব বিষন্নতা বুনোহাঁসের ডানা ঝাপটানির মতো ঝেড়ে ফেলে ব্যস্ত হয়ে পড়েন তাঁর সারাদিনকার রোজনামচায়।

ততক্ষণে আরও একটু ফর্সা হয়ে এসেছে ঈশ্বরের পৃথিবী। ভোরের নরম আলোয় সেসময় তাঁর চোখে পড়ল, মিশনের সবুজ গেট পেরিয়ে ধীর পায়ে মাঠে ঢুকছেন কর্নেল রায়চৌধুরি। রোজ ভোরে মর্নিং-ওয়াক করতে যাঁরা এই চত্বরে আসেন, কর্নেলই বোধ হয় তাঁদের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ। অন্তত তাঁর ঋজু, দীর্ঘ চেহারা, কথাবার্তা, অন্য সবাইকার ওপর তাঁর প্রশান্ত অভিভাবকত্বের ধরনে সেরকমই মনে হয় উইলিয়ামের।

নরম উমসুম ঘাসের উপর পা দিতেই কর্নেলের মনে হল, একঝলক সবুজ হাওয়া ঢুকে পড়ল ফুসফুসের জাফরির মধ্যে। শেষ-বর্ষার এই দিনগুলিতে মাঠের ঘাসগুলো আরও নধর, আরও সবুজ হয়ে উঠেছে। দূর থেকে দেখায় যেন একটা সবুজ ভেলভেটের আস্তরণ। এখনও অন্ধকারের ঘোর কাটেনি বলে মনে হচ্ছে বট্‌ল্-গ্রীন কালার। এখন মাঠের নরম সবুজের উপর দিয়ে হাঁটতে ভারী চমৎকার লাগে এই ব্রাহ্মসময়ে। আজ কতকাল ধরে ভোরের এহেন মোলায়েম মুহূর্তগুলো তারিয়ে তারিয়ে রেলিশ করেন কর্নেল অম্লান রায়চৌধুরী।

হাঁটতে হাঁটতে কব্জির ঘড়িতে নজর পড়ে গেল একপলক। ঠিক পৌনে পাঁচটা বাজে। ভোর চারটে পঁয়ত্রিশে নেভি-ব্লু রঙের প্যান্ট আর সাদা হাওয়াইশার্ট পরে, প্রিয় ছড়িটি হাতে নিয়ে বেরিয়েছিলেন ঘর থেকে। তাঁর ব্রজমণি দেব্যা রোডের বাড়ি থেকে মাঠে পৌঁছতে পাক্কা দশ মিনিট। আজ মাঠে ঢুকে দেখলেন তিনিই প্রথম। এই নিয়ে পরপর পাঁচদিন মাঠে প্রথম ঢুকে ফার্স্ট হচ্ছেন। তাতে অবশ্য তাঁর মুখে হাসি ফুটল না। হাইকোর্টের রিটায়ার্ড ব্যারিস্টার নীলেশ ব্রহ্মচারী গত পাঁচদিন মাঠে আসছেন না বলেই কর্নেল রায়চৌধুরীর পক্ষে প্রথম আসাটা সম্ভব হচ্ছে। অন্যদিন হলে কর্নেল মুচকি হেসে বলতেন, যাক, তাহলে আজ অন্তত আপনাকে হারিয়ে

দিতে পেরেছি, ব্যারিস্টার। বলার মুহূর্তে কর্নেলের কণ্ঠস্বরে থাকত একটা আত্মতৃপ্তির ছোঁয়া। কারণ এই একটা ব্যাপারে ব্যারিস্টারকে কিছুতেই হারাতে পারেন না। কে কত ভোরে মাঠে ঢুকতে পারে এই নিয়ে দুজনের মধ্যে মনে মনে একটা প্রতিযোগিতা হয়। কিন্তু যত ভোরেই কর্নেল মাঠে আসুন না কেন, মাঠে পা দিয়েই দেখেছেন, তাঁর আগেই পৌঁছে রাউন্ড দিতে শুরু করেছেন নীলেশ ব্রহ্মচারী। হয়তো মাসে একদিন কি দুদিন এমন হয়েছে যেদিন দৈবাৎ তিনি ব্রহ্মচারীসাহেবের আগে পৌঁছে গিয়েছেন মাঠে।

আজও প্রথম এসেছেন সেরকম, কিন্তু এই মুহূর্তে সেই আত্মতৃপ্তিটুকু উপভোগ করা গেল না। ছদিন আগে এমনই এক ভোরবেলায় বারতিনেক রাউন্ড দেওয়ার পর হঠাৎই শরীরটা টলে গিয়েছিল নীলেশ ব্রহ্মচারীর। হয়তো পড়েই যেতেন ধুপ করে। কীভাবে যেন এই অস্বাভাবিকতাটুকু নজরে পড়ে গিয়েছিল অধ্যাপক খাসনবীশের। দেখতে পেয়েই চট করে দুহাত বাড়িয়ে ধরে ফেলেছিলেন ব্যারিস্টারকে। তৎক্ষণাৎ তিনি আর কর্নেল দুজনে ধরাধরি করে এনে বসিয়ে দিয়েছিলেন মাঠের ধারে কংক্রিটের লম্বা বেঞ্চিতে। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসেছিলেন প্রাতঃভ্রমণকারীদের আরও অনেকে। একটা রিকশ ডেকে পৌঁছে দিয়েছিলেন তাঁর নতুনপাড়ার বাড়িতে। হাউস-ফিজিসিয়ান এসে বলেছেন, প্রেসার ঊর্ধ্বমুখী, কোলেস্টেরল উপছে পড়ছে রক্তে। দুদিন আগেও গিয়ে দেখে এসেছেন, বিপদসীমার কাছেই দুলছে রক্তচাপ। তবে হসপিটালাইজ্ করতে হয়নি। কমপ্লিট বেডরেস্ট।

এতসব ভাবতে ভাবতে সেকেন্ড রাউন্ড শেষ করে ফেললেন কর্নেল। মাঠে এখনও তিনি একাই। অন্ধকারের ঘোর কেটে গিয়ে ভোরের নরম আলো পুবের আকাশে উঁকি দিচ্ছে আস্তে আস্তে। পৃথিবীর রং হয়ে উঠেছে কুয়াশা রঙের। ধোঁয়া-ধোঁয়া আলোর রেণু ঝিরঝির করে ঝরে পড়ছে বিশাল রেন-ট্রিগুলোর বট্‌ল্-গ্রীন রঙের পাতার খাঁজেখোঁজে। ডাঁটালো মাঠটা পরিসরে আরও বড় হয়ে উঠছে যেন।

লোকে বলে, ম্যাকসাহেবের মাঠ। কেতাবি ভাষায় বলতে গেলে, ম্যাকডোনাল্ড'স গ্রাউন্ড। চল্লিশের দশকে সুদূর অস্ট্রেলিয়া থেকে ডেভিড ম্যাকডোনাল্ড নামের এই সাহেব তাঁর যুবকবয়সে এসে পৌঁছেছিলেন কলকাতায়। তখন বেহালার দক্ষিণ প্রান্তের এই অঞ্চল রীতিমতো বনবাদাড়ে ভর্তি। সেখানেই জঙ্গল পরিষ্কার করে ডায়মণ্ডহারবার রোডের দুপাশে অনেকখানি জায়গা নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন দু-দুটো অর্ফানেজ।

মেয়েদের অর্ফনেজটা ডায়মণ্ডহারবার রোডের পূর্বদিকে। তার চারপাশে

অনেকখানি পাঁচিলঘেরা জায়গায় চমৎকার ফুলের বাগান। তার সঙ্গে বিচিত্র রকমের গাছগাছড়া। অর্ফানেজের পাশে ছোট্ট একটি বাংলো। বাংলোটি নান্‌দের বসবাসের জন্য।

ডায়মণ্ডহারবার রোডের পশ্চিমে ম্যাকডোনাল্ডসাহেবের দোতলা বিশাল বাংলো। দোতলার টানা লম্বা বারান্দা থেকে ডায়মণ্ডহারবার রোডের যানবাহন চলাচলের ব্যস্ততা, মানুষজনের হাঁটাহাঁটি দেখতে পাওয়া যায় সারাক্ষণ। বাংলোর পাশে গির্জা, গির্জার সংলগ্ন প্রার্থনাগৃহ। গির্জার পাশে শান-বাঁধানো এক মস্ত পুকুর। বাংলোর চৌহদ্দি পার হলেই পাশাপাশি দুটো পেল্লাই মাঠ। মাঝখান দিয়ে সরু একচিলতে পায়ে-চলা পথ দুটো মাঠের সীমানা নির্ধারণ করে রেখেছে। উত্তরের মাঠের মাঝখানে ক্রিকেট-পিচ। মাঠের বাউন্ডারি-এরিয়ার পশ্চিমে চমৎকার একটা টেনিস-কোর্টও। দক্ষিণের মাঠের দুদিকে দুটো গোলপোস্ট। দুপুরে-বিকেলে এ দুটো মাঠের অধিকার এই এলাকার খেলাপাগল তরুণদের। কিন্তু ভোরের দিকে দুটো মাঠই প্রাতঃভ্রমণকারীদের দখলে চলে যায়। মাঠের চারপাশে ছাতার মতো বিছিয়ে থাকা অনেকগুলো রেন-ট্রি থেকে তখন দ্রুত বেরিয়ে আসতে থাকে সবুজ ভিটামিন-ভরা অক্সিজেন। সেই অক্সিজেনের টানে, ভোরের ওজন-মেশানো বাতাসের লোভে এ মাঠে ভোররাত থেকে একের পর এক ভিড় করতে থাকে আশেপাশের পল্লীর স্বাস্থ্যলোভী মানুষ। মাঠের সীমানার পশ্চিমপ্রান্ত জুড়ে ছেলেদের অর্ফানেজ, তার পাশে একটা ছোট্ট ফুলবাগান, একটা মাঝারি পুকুরও। আর গোটা এলাকাটাই উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা।

ম্যাকডোনাল্ডসাহেব এখন আর নেই। প্রায় বছরদশেক আগে, উনিশশো আশির এমনই এক সেপ্টেম্বরে হঠাৎই মারা গিয়েছিলেন সামান্য অসুস্থতার পর। কিন্তু তাঁর গড়া এই প্রতিষ্ঠানটিতে এখনও অনাথ ছেলেমেয়েদের ভিড়। প্রতিষ্ঠানের বর্তমান কর্ণধার ফাদার উইলিয়াম অবশ্য সাহেব নন। সেন্টপার্সেন্ট বাঙালি। তবু পাদ্রিদের আলখাল্লাধরনের সাদা পোশাকটি পরে যখন গম্ভীরমুখে হেঁটে যান রাস্তা দিয়ে তখন প্রায় সাহেবই মনে হয় তাঁকে। কখনও কর্নেলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে পরিষ্কার বাংলাতেই বলেন, সুপ্রভাত, কর্নেল।

ফাদার উইলিয়ামের মুখেই একদিন শুনেছিলেন কর্নেল, ডেভিড ম্যাকডোনাল্ড কেন তরুণ বয়সে তাঁর মাতৃভুমি ছেড়ে পাড়ি দিয়েছিলেন ভারতবর্ষের উদ্দেশে, সেট্‌ল্‌ করেছিলেন এই কলকাতায়। ঠিক সেট্‌ল্‌ বলা যায় না, বলা যায় কিছু অনাথ ছেলেমেয়েদের জন্য আত্মত্যাগ করেছিলেন। অস্ট্রেলিয়ার প্রাচুর্য ছেড়ে, আভিজাত্য ছেড়ে কিছু দীনদরিদ্র শিশুকে লালন করে কাটিয়ে দিয়েছেন বৃদ্ধবয়স অবধি। কারণটা

খুবই অদ্ভুত। অল্পবয়সে তিনি প্রেমে পড়েছিলেন এক কিশোরীর। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই কিশোরী তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে। সেই অপমান, সেই প্রত্যাখ্যান সইতে না পেরে ডেভিড ম্যাকডোনাল্ডের এই কৃচ্ছ্রসাধন। সেই যে দেশ ছেড়ে চলে এসেছিলেন কলকাতায়, আর কখনও ফিরে যাননি তাঁর প্রিয় অস্ট্রেলিয়ায়।

ফাদার ম্যাকডোনাল্ডের গল্পটা কর্নেল রায়চৌধুরীকে খুবই আহত করেছিল। জিভে চুকচুক শব্দ করে বলেছিলেন, আহা, বেচারি।

আজও মাঠে তৃতীয় রাউন্ড দিতে দিতে ম্যাকডোনাল্ডসাহেবের কথাই হঠাৎ মনে পড়ছিল তাঁর। হয়তো তাঁর নিজের জীবনের সঙ্গে কিছুটা মিল ছিল বলেই।

তৃতীয় রাউন্ডের মাঝামাঝি হঠাৎ খেয়াল করলেন, পাকারাস্তা ছেড়ে মাঠের দিকে গুটিগুটি হেঁটে আসছেন অধ্যাপক খাসনবীশ। হাতে ধুতির কোঁচাটি ধরা, গায়ে ফর্সা ধবধবে পাঞ্জাবি, চোখে সোনার রিমঅলা চশমা। থাকেন চৌরাস্তার কাছে। অধ্যাপকের চেহারাটা ছোটখাটো। কর্নেলের ছ-ফুটের চেহারা, কিংবা ব্রহ্মচারীসাহেবের পাঁচ-নয়ের পাশে অধ্যাপকের পাঁচ-পাঁচের চেহারাটা ছোটই মনে হয়। বয়সেও তাঁদের দুজনের চেয়ে বছরচারেক কম। সবে সেভেনটি ফোর ক্রশ করেছেন খাসনবীশ। দূর থেকে কর্নেলকে দেখে বললেন, আপনি এসে পড়েছেন তাহলে। আমি ভাবলাম, আপনি আজ নিশ্চয়ই আসবেন না।

কর্নেল হেসে উঠলেন, কেন!

—আজ সকালে আপনার ছোটগিন্নির আসার কথা বলেছিলেন না?

—ওহো, কর্নেল আবারও হেসে উঠলেন হো হো করে। ছোটগিন্নি বলতে তিতিরের কথা বলতে চাইছেন অধ্যাপক। তাঁর একমাত্র নাতনি। ক্লাস নাইনের ছাত্রী তিতির। ভারী চৌখস আর মেধাবী মেয়ে। জব্বলপুরের সবচেয়ে নামী গার্লস স্কুলের ক্লাস নাইনের ফার্স্টগার্ল।

মাত্র কয়েকদিন আগেই চিঠি পেয়েছেন তাঁর মেয়ে মালবিকার কাছ থেকে। জব্বলপুরে খুব ঝামেলার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে ওরা। ঝামেলাটা তিতিরকে নিয়েই। তাই অন্তত কিছুদিনের জন্য তিতিরকে কলকাতা পাঠিয়ে ঝামেলার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাইছে মেয়ে-জামাই। জব্বলপুর থেকে ওদের কনসার্নের এক কলিগ কলকাতা আসছেন আজ সকালের বোম্বে মেলে। তার সঙ্গেই তিতিরকে পাঠিয়ে দিয়েছে মালবিকা। অধ্যাপকের কথার উত্তরে বললেন, হ্যাঁ, আসব না ভেবেছিলাম। কিন্তু সকালে হাওড়া-স্টেশনের এনকোয়ারিতে ফোন করে জানলাম, বোম্বে মেল ভায়া এলাহাবাদ আজ চার ঘণ্টা লেট।

—চার ঘণ্টা!

—মাত্র চার ঘণ্টা, এনকোয়ারিতে ফোন করতেই জানাল, গতকাল আট ঘণ্টা লেট ছিল। তার আগের দিন বাইশ ঘণ্টা। সে তুলনায় চার ঘণ্টা লেট কোনও লেটই নয়।

—মাই গড্! অধ্যাপক খাসনবীশ প্রায় হেঁচকি তুললেন, হোয়াট অ্যা ক্রাইসিস, তারপর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, তো ছোটগিন্নি হঠাৎ এই অসময়ে কলকাতা চলে আসছে! এখন স্কুল তো খোলা।

—সেও আর এক ক্রাইসিস, প্রফেসর। কাল জব্বলপুরে টেলিফোন করেছিলাম তিতির আসছে কি না জানতে। টেলিফোনে যেটুকু জানতে পারলাম, তা শুনে আমি তাজ্জব। র‍্যাদার অ্যাস্টনিস্‌ড্।

—তাই নাকি! কীরকম?

—আসলে কদিন আগে মণ্ডল কমিশনের যে রিপোর্ট বেরিয়েছে সংরক্ষণ নিয়ে, এ তারই জের। আমাদের প্রাইম মিনিস্টার তো রিপোর্ট প্রকাশ করে দিলেন। তাতে দিল্লিতে রাজীব গোস্বামী বলে যে ছেলেটা কয়েকদিন আগে সেল্‌ফ্-ইমোলেশনের চেষ্টা করেছিল, তার জের এখন জব্বলপুরেও এসে ঠেকেছে।

অধ্যাপক বিস্মিত হয়ে বললেন, তাই নাকি!

—হ্যাঁ, সেল্‌ফ্-ইমোলেশনের হিড়িক লেগেছে জব্বলপুরের স্কুলের ছেলেমেয়েদের মধ্যেও। হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই, ভাল-ভাল ছেলেমেয়েরা গায়ে পেট্রল ঢেলে দেশলাইকাঠি ঠুকে দিচ্ছে। তিতিরদের স্কুলেও তিন-চারটে মেয়ে এভাবে সুইসাইড করেছে। তারা সবাই ক্লাসের ফার্স্ট কিংবা সেকেন্ড গার্ল। তিতির ক্লাসে ফার্স্ট হয়। তাই মালবিকারা তাড়াতাড়ি ভয় পেয়ে মেয়েকে পাঠিয়ে দিচ্ছে কলকাতায়

অধ্যাপক খাসনবীশ হাঁটতে হাঁটতে ততক্ষণে দাঁড়িয়ে পড়েছেন ঘাসের উপর, মাই গড্। বলেন কী, কর্নেল? হোয়াট অ্যা ক্রাইসিস!

—হ্যাঁ, আমি কদিন ধরে খুব টেনশনের মধ্যে আছি, বলতে বলতে কর্নেলের নজরে পড়ল, রেন-ট্রি গাছের নীচে যে কয়েকটি কংক্রিটের বেঞ্চ রয়েছে, তারই একটার তলা থেকে খানচারেক থান ইট বার করছে বিশ্বজিৎ। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের এই সুদর্শন যুবক ম্যাকসাহেবের মাঠের এক মস্ত আকর্ষণ। সে নিজেই শুধু স্বাস্থ্যচর্চা করে তা নয়, তার কাছে নিয়মিত স্বাস্থ্যচর্চার তালিম নেয় আরও কয়েকটি তরুণ ও কিশোর। খুব লাইভ্‌লি ছেলে।

বিশ্বজিৎ প্রতিদিন মাঠে আসে ভোর পাঁচটা নাগাদ। সে এসেই কোনওদিন পঞ্চাশ, কোনওদিন ষাট-সত্তরটি বুকডন দেয়। তারপর গুণে-গুণে একশ-দেড়শ

বৈঠক। তারপরেও আরও আধঘণ্টা নানান কসরত। তার ব্যায়ামের মাঝপথে গুটিগুটি এসে পৌঁছয় পুলক, রীতেশ, নিলয়, সৌপ্তিক, বারীন। আরও চার-পাঁচজন। মাঠের কোণের দিকে তখন রীতিমতো ব্যায়ামের আখড়া।

প্রতিদিনকার মতো আজও বিশ্বজিৎ দুটি-দুটি চারখানা ইট দুপাশে সাজিয়ে জোরে জোরে বুকডন দিতে শুরু করল। তার বুকের পেশি, বাইসেপ, ট্রাইসেপ বেশ খানিকক্ষণ তাকিয়ে দেখবার মতো। রাউন্ড দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে কর্নেল তার কাছে এসে দাঁড়ালেন একমুহূর্ত, ক্যারি অন, মাই বয়।

বিশ্বজিৎ লাজুক হেসে তার বুকডন চালিয়ে যেতে থাকে। ততক্ষণে আরও একটু সকাল হয়ে এসেছে। পুবের আকাশে ছিট-ছিট লালরং। পাঁচটা পনেরো নাগাদ কলকল করতে করতে মাঠে এসে পড়লেন থ্রি মাস্কেটিয়ার্স। তাদের মধ্য থেকে ছোট্ট গোলগাল চেহারার নিশীথ দাশগুপ্ত হাত নেড়ে বললেন, গুড্ মর্নিং কর্নেল। গুড মর্নিং প্রফেসর।

কর্নেল, প্রফেসর দুজনেই তার প্রত্যুত্তরে গুড্মর্নিং করলেন ওদের। তিনজনেই থাকেন শীলপাড়ার দিকে। নিশীথ দাশগুপ্ত রেলদপ্তরের অফিসার, মাত্র কয়েকমাস পরেই রিটায়ার করবেন। তাঁর দুই সঙ্গীর একজন অনিমেষ ঘোষদস্তিদার, বনদপ্তরের চাকরি থেকে রিটায়ার করেছেন সম্প্রতি, একটু স্পষ্টবক্তা, কিন্তু রসিক ধরনের মানুষ। অন্যজন ক্ষৌনীশ হালদার, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি থেকে তিনিও সবে অবসর নিয়েছেন, কথা বলেন বেশি, কিন্তু ভাবপ্রবণ। প্রতিদিন তিনজনে একই সঙ্গে মাঠে আসেন, কয়েক রাউন্ড হাঁটার পর কংক্রিটের বেঞ্চে বসে আড্ডা মারেন আরও চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ মিনিট। কখনও বেশ ভালভাবে রোদ ওঠা পর্যন্ত চলে তাঁদের কথোপথন। মাঝেমধ্যে ঝগড়ার ঝোঁকেও কথা বলতে দেখা যায় ওঁদের।

গুডমর্নিংয়ের পালা শেষ হলে তাঁরা তিনজনে শুরু করেন মাঠের চারদিকে ঘুরতে।

প্রায় চার-পাঁচ রাউন্ড ঘোরা শেষ হতে কর্নেল খানিকক্ষণ দাঁড়ালেন রেন-ট্রি গাছের তলায়। একটু হাঁপিয়ে পড়েছেন যেন। এবার বর্ষার সময়ে বেশ কয়েকদিন শ্বাসকষ্টে ভুগেছেন। এখন অবশ্য লাঙ্স্ ফ্রি আছে। তবু চার-পাঁচ রাউন্ডের পর একটু যে টায়ার্ড হয়ে পড়বেন তা তো এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়। সেভেনটি এইট পার হয়ে গেলেন যে মাসকয়েক আগে!

অধ্যাপক খাসনবীশ বললেন, কী হল কর্নেল, এর মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়লেন? আমার যে সেকেন্ড রাউন্ড শেষ হল সবে।

কর্নেল হাসলেন, কিন্তু আমার যে এটা ফিফ্থ্ রাউন্ড চলছিল। আপনি আজ দেরি

করে মাঠে এসেছেন তা ভুলে গেছেন বুঝি! কিন্তু কী ব্যাপার, প্রফেসর, এত দেরি হল কেন আজ? রাতে ভাল ঘুম হয়নি বুঝি?

—আর বলবেন না। আমার আজকাল সাউন্ড স্লিপ হচ্ছে। কিন্তু আমার গৃহিণী সারারাত কোঁক কোঁক করছেন বাতের ব্যথায়। মাঝরাতে অনেকক্ষণ জেগেই ছিলাম প্রায়। তারপর হঠাৎ ভোরবেলা চোখ জুড়ে এসেছিল। এখন দেখছি, এই বুড়োবয়সে বউ থাকাটাই ঝকমারি। একে তো নিজের রক্তে কয়েক টন সুগার, তার উপর গৃহিণীর বাত। এ বয়সে আপনার মতো ফ্রি থাকাটাই ভাল—

হেসে উঠতে যাচ্ছিলেন কর্নেল, কিন্তু তেমন করে হাসতে পারলেন না। প্রফেসরের 'ফ্রি' শব্দটা কাঁটার মতো বিঁধল গায়ে। মনে পড়ে গেল স্ত্রী রেবার কথা। আজ থেকে আঠাশ বছর আগে, নাইনটিন সিক্সটি টু-তে তাঁকে চিরকালের মতো রেবা ছেড়ে গিয়েছিল একবুক অভিমান নিয়ে।

ভোরের লালসূর্য ততক্ষণে লাফিয়ে উঠে এসেছে দিগন্তরেখা অতিক্রম করে। কিন্তু তাতে তখনও রোদের ঝিলিক চলকে ওঠেনি। ডায়মণ্ডহারবার রোড পেরিয়ে পুব-আকাশে এই লাল আবিরের খেলা কিছুক্ষণ আনমনা হয়ে দেখাটা কর্নেলের অনেকদিনের অভ্যাস। এ যেন অদৃশ্য থেকে কোনও ঈশ্বর এসে রাঙিয়ে দিয়ে যাচ্ছেন সূর্যদেবের আবির্ভাবক্ষণটিকে। জবাকুসুম সঙ্কাশং গরিমায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে মানুষের পৃথিবী। সে দৃশ্য প্রতিদিনই তাঁর কাছে নতুন বলে মনে হয়।

আজ কিন্তু সেদিকে তাকিয়ে আর সম্মোহিত হতে পারলেন না কর্নেল। প্রফেসর খাসনবীশ সহসা উসকে দিয়েছেন তাঁর অভিমানে উপছানো অতীত।

আর্মির চাকরিটা নিয়েছিলেন বাধ্য হয়ে নয়, ভালবেসেই। শৈশবে স্কুলে পড়াকালীন কেন যেন নেতাজি সুভাষচন্দ্রের যুদ্ধাযাত্রার পোশাকটি বারবার উদ্দীপিত করে তুলত তাঁকে। মনে হত, এই হল পুরুষ। প্রায়-উড়ন্ত ঘোড়ার পিঠে চড়ে বজ্রমুষ্টি তোলা পৌরুষদীপ্ত ভঙ্গিটি দেখে তাঁর ইচ্ছে জেগেছিল, বড় হয়ে আর্মিতে যোগ দেবেন। স্কুল-কলেজের পরীক্ষায় ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট করার পর সৈন্যবাহিনীতে নাম লেখানোয় অবাক হয়েছিল তাঁর বন্ধুবান্ধব, তাঁর আত্মীয়-পরিজনরা। কিন্তু কাজটিতে যথেষ্ট জব্‌-স্যাটিস্‌ফেকশন ছিল বলে আর কখনও পিছু ফিরে তাকাননি। কয়েক বছরের মধ্যেই পর পর প্রমোশন। ফেরার প্রশ্নই নেই।

তবু পিছনে তাকাতে হয়েছিল একবার। স্ত্রী হিসেবে রেবা ছিল আদর্শ। স্বামীর কল্যাণ, ছেলেমেয়েদের মানুষ করে তোলা ছাড়া তার জীবনে অন্য কোনও বিলাসিতা কখনও ছিল না। ফলে নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছিলেন তাঁর অফিসের কাজে। রেবার

দিকে ভাল করে তাকাবার ফুরসতই পেতেন না যেন।

রেবার ভিতরে বোধহয় তাই জমা হয়েছিল তীব্র অভিমান। সে আজ প্রায় আঠাশ বছর আগের কথা, যে-সময় ভারত-চীন যুদ্ধের মোকাবিলায় নিদারুণ ব্যতিব্যস্ত তিনি। লাদাখ-সীমান্তের কাছাকাছি ক্যাম্প করে রয়েছেন। তাঁবুর ভেতর প্রচণ্ড শীতে হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে একদিন টেলিগ্রাম পেয়েছিলেন, রেবা সিরিয়াস্‌লি ইল্‌। কাম শার্প। টেলিগ্রাম পেয়ে তাঁর মনে হয়েছিল, তাঁর রিলেটিভরা সব এক-একটি ফুল। যখন তাঁর প্রতিটি মুহূর্ত কাটছে গোলাগুলির মধ্যে, সে সময় তারা এহেন একটি টেলিগ্রাম পাঠাল কোন বুদ্ধিতে! তাঁর তখন মরবারও সময় নেই। কদিন পরে বুঝেছিলেন, তাঁর মরার সময় না থাকতে পারে, কিন্তু রেবার তো ছিল। তাঁর চল্লিশ বছরের সুন্দরী স্ত্রী তাঁর অনুপস্থিতিতে দিনসাতেক পরে তাঁকে গুড়্‌বাই করে চলে গিয়েছিল পৃথিবীর অন্যপারে। মৃত্যুসংবাদ বয়ে আনা টেলিগ্রামটি হাতে নিয়ে অবিশ্বাস্য চোখে তাকিয়ে ছিলেন হিজিবিজি অক্ষরগুলোর দিকে। নিজের মনেই বিড়বিড় করেছিলেন, হাউ অ্যাব্‌সার্ড। মাত্র নদিনের অসুখে! কী এমন হয়েছিল রেবার! তিনি যুদ্ধে রওনা দেওয়ার আগের দিনও মুখ ভার করে ছিল রেবা। রাতে বুকের ভেতর মুখ লুকিয়ে কেঁদেছিল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। ভেবেছিল তার স্বামী যদি যুদ্ধ থেকে আর না ফেরে! কর্নেল যুদ্ধান্তে রাষ্ট্রপতির পদক গলায় ঝুলিয়ে লাদাখ থেকে ফিরে এসেছিলেন কলকাতায়। কিন্তু রেবাকে আর দেখতে পাননি। ফিরে এসে দেখেছিলেন, রেবার ফেলে যাওয়া সংসার ক্ষোভের আঙুল তুলে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে। দুই ছেলে অমলেশ আর পুলকেশ, মেয়ে মালবিকা, কেউই তখনও কৈশোরে উপনীত হয়নি। দু-চোখে ক্ষোভ, অভিমান, কান্না মিশিয়ে নিঃশব্দে তাকিয়ে রয়েছে তাঁর দিকে। যেন তারা বলতে চাইছিল, তুমি মায়ের মৃত্যু সংবাদ শুনেও আসতে পারনি, বাবা? কর্নেল রায়চৌধুরী সারাক্ষণ মাথা নিচু করে ছিলেন। যেন মাথা পেতে গ্রহণ করেছিলেন সবাইকার ভর্ৎসনা, ক্রোধ আর অশ্রু। পরে শুনেছিলেন, রেবা শেষ সময়ে বারবার বলেছিল, ও এল না? ও আসেনি!

মা-মরা তিন ছেলেমেয়েকে নিয়ে তারপর এক দারুণ লড়াই শুরু হয়েছিল কর্নেলের। একে-একে মানুষ করে তুলেছেন ছেলেমেয়েদের। অমলেশ এখন তার বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে আমেরিকায়। পুলকেশ তার বউ-মেয়ে নিয়ে জার্মানিতে। মালবিকাও ষোলো বছর আগে বিয়ে হয়ে চলে গেছে জব্বলপুরে। এই দীর্ঘকাল কর্নেল তাঁর বিশাল দোতলা বাড়িতে পড়ে আছেন একা।

একা, তবু তাও মানিয়ে নিয়েছেন কর্নেল। চাইলে মানুষের সঙ্গীর অভাব হয় না। বইটই নিয়েও দিনরাতের অনেকখানি সময় কাটিয়ে দেওয়া যায়। রেবার স্মৃতিও

এই দীর্ঘ আঠাশ বছরে ক্ষীণ হতে হতে ক্ষীণতর হয়ে এসেছে। এখন দু-তিন মাস অন্তর কখনও আমেরিকা কখনও জার্মানি থেকে ছেলেরা চিঠি দেয়। মেয়ে মালবিকার চিঠি অবশ্য মাসে দুখানা তিনখানা করে আসে। বেশ ভাল বাংলা লিখতে পারে মালবিকা। চিঠিতে একটু সাহিত্য করার অভ্যাস তার ছোটবেলায় ছিল, এখনও রয়ে গেছে। কিন্তু তিতিরকে সে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াচ্ছে। চেহারায়, কথাবার্তায় এর মধ্যে দিব্যি তুখোড় হয়ে উঠেছে মালবিকার মেয়েটি।

তিতিরের কথা মনে পড়তেই সামান্য চঞ্চল হয়ে উঠল কর্নেলের মন। চার ঘণ্টা লেটে আসছে বোম্বে মেল। একা-একা আসছে মেয়েটা, নিশ্চয়ই খুবই কষ্ট পাচ্ছে। সেই রাগ এসে ছুড়ে দেবে তাঁরই উপর, উফ্, কী যে তোমরা করে ফেলেছ দেশটাকে, দাদু, অ্যাব্সলিউটলি হেল।

ভাবতে ভাবতে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন কর্নেল। এদিক-ওদিক তাকাতেই হঠাৎ ডালিমের দিকে নজর পড়ল তাঁর। ন-দশ বছরের উস্কখুস্ক চুলের ফর্সা বাচ্চাটা মাঠের কোণাকুণি ছোটে বলে সবাইকার নজর চট করে ওর দিকেই পড়ে। পরনে নীল গেঞ্জি, তার সঙ্গে নীল হাফ্প্যান্ট। মাথাটা নিচু করে টগবগ করে এক কোণ থেকে ছুটে যাচ্ছে আর-এক কোণে। ওদিকে বুড়ি ছুঁয়েই ফের ছুটে আসছে এদিকে। ছুটতে ছুটতেই হঠাৎ দেখতে পেল কর্নেলকে, হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, কটা বেজেছে, কর্নেলজেঠু?

—পাঁচটা কুড়ি। তোমার প্রেয়ার শুরু হতে আরও অনেকটা দেরি আছে। ক্যারি অন—

ডালিম আবার দৌড়তে শুরু করে।

সাড়ে পাঁচটা নাগাদ এসে পৌঁছুলেন মিস্টার আর মিসেস সিন্‌হা। তাঁরা কর্নেলকে সুপ্রভাত জানাতেই কর্নেল হেসে বললেন, কী ব্যাপার, দুজনে আজ জোড়ে যে।

চল্লিশ অতিক্রান্ত এই দম্পতি রোজই প্রাতঃভ্রমণে আসেন। থাকেন চৌরাস্তার কাছেই, বীরেন রায় রোড ইস্টে। মিস্টার আসেন সাড়ে পাঁচটার অনেক আগেই। মিসেস খানিক দেরিতে। 'কেন দেরি' জানতে চাইলেই চোখে কৃত্রিম ভর্ৎসনা মাখিয়ে মিসেস সিন্‌হা বলেন, আপনাদের আর কি। ঘুম থেকে উঠলেন, বাথরুম হয়ে ড্রেস চাপিয়ে চলে এলেন। মেয়েদের ভোরবেলা কত-যে টুকিটাকি কাজ থাকে সংসারে। আজ কর্নেলের কথা শুনে মিসেস সিন্‌হা হেসে বললেন, আজ আমাদের ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি। তাই কর্তা কিছুতেই আমাকে ফেলে মাঠে আসতে রাজি হলেন না।

—কনগ্রাচুলেশন্‌স্। তা কততম বিবাহবার্ষিকী আজ?

ঊনবিংশতিতম শব্দটি বোধ হয় চট করে হাতের কাছে খুঁজে পেলেন না মিস্টার

অর্ণব সিন্‌হা, হেসে বললেন, নাইটিন্‌থ্‌।

অধ্যাপক খাসনবীশ এতক্ষণে বললেন, তাহলে এই শুভদিনে রাতের বেলা নিশ্চয় একটা গ্যালা পার্টি হচ্ছে। আর উই ইনভাইটেড্‌ দেয়ার?

মিসেস সিন্‌হা মিষ্টি করে একটা হাসি উপহার দিলেন, উঁহু, আজ আমার ছোট-বোন আর ভগ্নিপতি ওদের ওখানে রাতে নিমন্ত্রণ করেছে আমাদের।

—দেন লেট ইউ এনজয়, হাসতে হাসতে বললেন অধ্যাপক খাসনবীশ।

বিশ্বজিৎ ততক্ষণে তার ব্যায়ামপর্ব শেষ করে অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছে রাস্তার দিকে। এতক্ষণের একনাগাড় পরিশ্রমে তার পেশল বুক ওঠানামা করছে। ঘামে ভিজে চপ্‌চপ্‌ করছে তার সবুজরঙের স্যান্ডো গেঞ্জি। তার নজর অনুসরণ করে রাস্তার দিকে তাকিয়ে কর্নেল দেখলেন, হ্যাঁ, যা অনুমান করেছেন, ঠিক তাই। কাবেরী আর চামেলি, দুই বোন দুই সঙ্গীর মতো গল্প করতে করতে ঢুকে পড়েছে মাঠে। কাবেরীর হাতে একটা দুধের ক্যান। শখেরবাজারে মাদার ডেয়ারি থেকে ক্যানে দুধ ভর্তি করে রোজ একটিবার তার 'ম্যাকসাহেবের মাঠে' আসা চাইই। তাদের দেখে মুখে হাসি ফুটল বিশ্বজিতের। শরীরের ব্যায়াম শেষ হবার পর এবার তার মনের ব্যায়ামের শুরু।

চামেলি মাঠে ঢুকে টুকটুক করে হেঁটে যাবে পুব দিকের বিশাল নাগকেশর গাছটার কাছে। ওখানে একটা কাঠের সিঁড়ি আছে। সিঁড়িতে তিনটে স্টেপ। সিঁড়ির পেছনদিকে ম্যাকসাহেবের বাংলো-সংলগ্ন চমৎকার ফুলের কেয়ারি। কিন্তু চামেলির গন্তব্য সেই ফুলের বাগানে নয়। সে এখন সিঁড়ির উপর কয়েকদণ্ড বসবে। বসে নজর রাখবে তার দিদি কাবেরী আর বিশ্বজিতের উপর। বিশ্বজিৎ আর কাবেরী এখন দু-তিন রাউন্ড চক্কর দেবে মাঠের চারপাশে। হাঁটতে হাঁটতে ওদের সমস্ত জমানো কথা খরচ করবে একে-একে। দুজন দুজনকে প্রায় সাড়ে তেইশ ঘণ্টা দেখেনি কিনা।

বিশ্বজিতের দুই সাগরেদ রীতেশ আর নিলয় ততক্ষণে ব্যায়াম শেষ করে দৌড় শুরু করেছে মাঠের চারদিকের ট্র্যাক বরাবর। ছুটতে ছুটতে বিশ্বজিৎ আর কাবেরীকে অতিক্রম করে গেল। অতিক্রম করার মুহূর্তে যেন কিছু একটা ইয়ার্কিও করে গেল ওদের দুজনকে উদ্দেশ করে। বিশ্বজিৎ হাসতে হাসতে বলল, খুব দুষ্টু হয়েছিস তোরা কিন্তু—

কর্নেলও মুচকি মুচকি হাসছিলেন। এইসব সুন্দর দৃশ্যের জন্যই সকালের এই মুহূর্তগুলো আরও মনোরম হয়ে ওঠে। আস্তে আস্তে চমৎকার সব মানুষেরা এসে ভরে তুলছে ম্যাকসাহেবের মাঠ। এক-একজন মানুষের এক-একরকম পোশাক, এক-একরকম অভিব্যক্তি। এই শহরতলির এ-পল্লী ও-পল্লী থেকে ভোরঘুমের চোখ

নিয়ে তারা সবাই এসে হাজির হয় এখানে। প্রায় সবাই সবাইকার চেনা। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের দিকে তাকিয়ে একঝলক হাসে। কেউ সুপ্রভাত, কেউ গুডমর্নিং বলে পরস্পরকে শুভকামনা করে। তারপর প্রত্যেকেই এক-এক ঝলক বিশুদ্ধ বাতাসের খোঁজে সবুজ মাঠের পটভূমিকায় মেলে ধরে তাদের ফুসফুস। কলকাতার বিষবাষ্পে ভরা শরীরটা শোধন করে নেবে বলে এই ধারাবাহিক পরিক্রমা।

হঠাৎ মোটর সাইকেলের ভট্‌ভট্ শব্দে ফিরে তাকালেন কর্নেল। মনোজিৎ রায় এসে মাঠের কংক্রিটের বেঞ্চগুলোর ওপাশে পার্ক করছেন তাঁর বাইকটি। কর্নেল তৎক্ষণাৎ এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, ব্রহ্মচারীসাহেবের কোনও খবর পেলে নাকি?

—হ্যাঁ, আপাতত ভালই আছেন। তবু বেড্‌রেস্ট প্রেসক্রাইব করেছেন ডাক্তার। অ্যানাদার ওয়ান উইক।

কর্নেল আর প্রফেসর দুজনেই বিস্মিত হলেন, আরও এক সপ্তাহ!

—হ্যাঁ, মাইল্ড হলেও এটা একটা স্ট্রোকই তো। সেকেন্ড স্ট্রোক যখন, ডাক্তার একেবারেই রিস্ক নিতে চাইছেন না।

মনোজিৎ রায় তার সাদা শার্ট আর সাদা শর্টস্ পরা শরীরটা একবার ঝাঁকিয়ে শুরু করলেন জগিং।

মনোজিৎ রায় স্বভাবে পরোপকারী মানুষ, থাকেন নতুনপাড়ায়, পাড়ার একটি ক্লাবের কর্মকর্তা। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, মাঝারি হাইট, মাথার মাঝখানে একটি সুখটাক চকচক করে। রকমারি স্পেয়ার পার্টসের বিজনেস করে চমৎকার দোতলা বাড়ি করেছেন রাস্তার পাশে। দোতলার লিভিং রুমটি এত বড় যে তাতে অনায়াসে ব্যাড্‌মিন্টন খেলা যায়। একটা ছোট অফিস আছে মহাত্মা গান্ধী রোডে। সেখান থেকে সন্ধের পর বাড়ি ফিরে বাইক নিয়ে বেরিয়ে পড়েন কোথাও কেউ ঝামেলায় পড়লে তাঁকে সাহায্য করতে।

তার কাছ থেকে ব্রহ্মচারীসাহেবের খবরটা পেতে খুবই উদ্বিগ্ন দেখাল কর্নেলকে। চিন্তিতমুখে বললেন, তাহলে আজ একবার সন্ধের দিকে দেখতে যাই, প্রফেসর।

—অবশ্যই, অধ্যাপক খাসনবীশ ঘাড় নাড়লেন। কর্নেলের হঠাৎ নজর চলে গেল মাঠের ভেতর কয়েকটি কিশোরীর কলকাকলির দিকে। ফ্লাইং-ডিস হাতে নিয়ে ছোড়াছুড়ি করছে কজন। কারও পরনে স্কার্ট-ব্লাউজ, কারও সালোয়ার-কামিজ, কারও বা প্যান্ট-শার্ট, তাদের হইচই ছোটাছুটিতে ভোরের মাঠটি আরও প্রাণ পেয়ে উঠেছে যেন। দৃশ্যটা এত চমৎকার লাগল কর্নেলের যে, হঠাৎ উদাস হয়ে যেতে ইচ্ছে হল।

ম্যাকডোনাল্ডসাহেবের গড়ে তোলা এই সবুজ পরিসরটি এই তল্লাটের মানুষদের কাছে বুকভরে শ্বাস নেওয়ার একটা জায়গা। চারদিকের সমস্ত খালি জায়গা যখন প্রমোটারদের হাতে পড়ে হু-হু করে আকাশচুম্বীতে পরিণত হচ্ছে, ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে মাথার ওপরের নীল আকাশ, তখনও এই মাঠদুটো যেন বেঁচে থাকার প্রতীক। যে হারে মানুষ বসবাসের সন্ধানে ছুটে আসছে এই দক্ষিণপ্রান্তিক শহরতলিতে, তাতে কদিন পরে খেলার মাঠ, পুকুর-ডোবা, দিঘি—এ সব কোনও কিছুই আর পড়ে থাকবে না মানুষের ফুসফুস বাঁচিয়ে রাখার জন্য।

সত্যিই খুব দ্রুত মানুষে-মানুষে ভরে উঠছে বেহালা-বড়িশার গোটা এলাকা। অথচ কবছর আগেও এ সব জায়গা সম্পর্কে এতটা ক্রেজ ছিল না। সেভেনটি ফাইভে, জরুরি অবস্থার সময় বেহালার ঘিঞ্জি সরু রাস্তার দু' পাশের বাড়িগুলো ভেঙে হঠাৎ চওড়া করে ফেলা হল ডায়মণ্ডহারবার রোড। তারাতলা থেকে জোকা পর্যন্ত ছ-সাত কিলোমিটার চওড়া রাস্তাটা এখন রীতিমতো আকর্ষণীয়। বেহালা ট্রামডিপোর কাছাকাছি দোকানপাট তো সন্ধের পর নিয়নের আলোয় সেজেগুজে গড়িয়াহাট মোড়ের মতো অপ্সরা হয়ে ওঠে। তবে তার চেয়েও সুন্দরী দেখায় শিমুলতলা ব্লাইন্ড স্কুল থেকে জোকা পর্যন্ত ঝকঝকে চওড়া রাস্তাটা। হয়তো তার আকর্ষণেই আসছে মানুষ। একটু সবুজের টানে, একটু নীল আকাশ দেখার লোভে।

সেই মুহূর্তে বাংলোর ওপাশে গির্জায় ঘণ্টাধ্বনি শোনা যেতে চমকে উঠলেন কর্নেল। পবিত্র গম্ভীর শব্দ প্রতিধ্বনিত হল দূরের বাড়িটির দেওয়ালে। তাতে ভোরের আবহাওয়া আরও একটু পবিত্র হয়ে উঠল যেন। তার একটু পরেই ফাদার উইলিয়াম বেরিয়ে এলেন বাংলো থেকে তাঁর সাদা ধবধবে আলখাল্লা ধরনের ঢোলা পোশাকটি পরে। দুহাতে কোমরের নীল বন্ধনীটি দ্রুত বাঁধতে বাঁধতে একবার তাকালেন দূরে রেন-ট্রি গাছের নীচে দাঁড়িয়ে থাকা কর্নেল রায়চৌধুরী আর অধ্যাপক খাসনবীশের দিকে। মুচকি হেসে নড্ করলেন এক মুহূর্ত। তারপর মাথা নিচু করে ঢুকে গেলেন গির্জার পাশের প্রার্থনাগৃহটির মধ্যে।

ছেলেদের অর্ফানেজের ভেতর থেকে তখন মূর্ত হয়ে উঠেছে কোলাহল। গেট খুলে পিলপিল করে বেরিয়ে আসছে সুন্দর পোশাকে, পরিপাটি করে চুল আঁচড়ে প্রায় শদেড়েক বালক ও কিশোর। তাদের চোখেমুখে কেমন একটা দুঃখী-দুঃখী ছাপ। সার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সবাই একে একে ঢুকে গেল প্রার্থনাগৃহের ভেতর।

কর্নেল এই সময়টুকু চুপচাপ তাকিয়ে থাকেন তাদের চলার দিকে চোখ রেখে। তারা প্রার্থনাগৃহে প্রবেশ করার একটু পরেই ভেসে আসে পিয়ানোর টুংটাং সুর। সে সুর ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় ম্যাকডোনাল্ডসাহেবের চমৎকার বাংলো, গির্জা, দুটো সবুজ মাঠ,

শান-বাঁধানো মস্ত পুকুর, রেন-ট্রি গাছ—সবই। ছুঁয়ে যায় যারা প্রাতঃভ্রমণ করতে এসেছে সেইসব সুন্দর মানুষদের হৃদয়। কয়েক মুহূর্ত যেন স্তব্ধ হয়ে থাকে গোটা প্রকৃতি, মানুষজন। মনে হয়, বহুদূর থেকে ধীর পায়ে হেঁটে আসছেন আর কেউ নন, ঈশ্বর।

প্রার্থনাগৃহের ভেতর থেকে ততক্ষণে ভেসে আসছে কোরাস-সংগীত : ও গড্, দাউ লিভ্ ইন আওয়ার হার্ট.....

কয়েকদিন রোদ পেয়ে মাঠটা শুকিয়ে এসেছিল প্রায়। হঠাৎ কাল রাতে ফের একপশলা বৃষ্টি হতে আবার জল জমে গেছে কোথাও কোথাও। অনিরুদ্ধ শাসমল মাঠে পা দেওয়ার সময় দেখলেন, কাদাও হয়েছে দু-এক জায়গায়। জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর, বর্ষার এই তিন মাস ম্যাকসাহেবের মাঠে প্রাতঃভ্রমণ করা প্রায়শ মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়। তবু স্বাস্থ্যান্বেষী মানুষেরা ঝড়-জল-কাদা কিছুই মানেন না। ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বাধা উপেক্ষা করে ঠিকঠাক হাজিরা দেবেন সবুজ মাঠ আর বিশুদ্ধ বাতাসের টানে-টানে। ঝিরঝিরে বৃষ্টি পড়লেও ছাতা নিয়ে হাজির হয়ে যান কেউ-কেউ। এ প্রায় এক নেশার মতো।

অনিরুদ্ধ শাসমলও কি গত তিনবছরের মধ্যে একটি দিনও গরহাজির থেকেছেন! না থাকতে পেরেছেন! যেদিন থেকে ভোর-ভোর উঠে মর্নিং-ওয়াকে আসা অব্যেস করেছেন, সেদিন থেকেই মনে হচ্ছে রোজই তাঁর আয়ু আর একদিন বেড়ে যাচ্ছে। আরও একদিন তিনি এই পৃথিবীর জল-হাওয়া-আলোর স্বাদ ভোগ করতে পারছেন প্রাণভরে। তারপর থেকে প্রতিদিনই মনে হয়, বেঁচে থাকাটা সত্যিই কী আরামের। বেঁচে না থাকলে পৃথিবীটা যে এত সুন্দর তা উপলব্ধি করা যায় না, বেঁচে না থাকলে পৃথিবীর এত-এত মানুষ, এত-এত কর্মযজ্ঞ, এত দৃশ্যাবলী—তার কোনও কিছুরই শরিক হওয়া যায় না।

অথচ অনিরুদ্ধ প্রতি মুহূর্তেই বুঝতে পারছেন, তাঁর আয়ু ফুরিয়ে আসছে দ্রুত। হিজ ডেজ আর নাম্বার্ড্।

প্রায় তিন বছর আগে বুকের বাঁদিকে একটা ব্যথা অনুভব করতে ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলেন। এ-ডাক্তার সে-ডাক্তার ঘুরে শেষমেশ শরণাপন্ন হয়েছিলেন কলকাতার একনম্বর হার্ট-স্পেশালিস্ট ডাঃ সুশীল সেনের। তাঁর নির্দেশে তোলা কিছু এক্সরে প্লেট, ইসিজি রিপোর্ট ইত্যাদি নিয়ে একদিন যেতেই সেগুলো দেখেশুনে চমকে উঠেছিলেন ডাক্তার, কী করেছেন আপনি, এ্যাঁ?

অনিরুদ্ধর সঙ্গে ছিলেন তাঁর বড়দা সুরথ শাসমল। তিনিই জিজ্ঞাসা করেছিলেন,

খুব খারাপ কিছু নাকি?

ডাঃ সেন তাঁর ভারী চশমার ভেতর দিয়ে কড়াচোখে তাকালেন সুরথ শাসমলের দিকে, চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, স্যরি, এখন আর কিছু করার নেই। হিজ ডেজ আর নাম্বারড্।

অনিরুদ্ধ কেঁপে উঠেছিলেন হঠাৎ। তাকিয়ে দেখেছিলেন বড়দার মুখের দিকে। বড়দার মুখখানাও হঠাৎ কেমন সাদা হয়ে গিয়েছে।

কাঁপা-কাঁপা গলায় সুরথ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কী দেখলেন, ডাক্তারবাবু?

ডাঃ সেন ভারী প্রফেশনাল গলায় রায় দিয়েছিলেন তৎক্ষণাৎ, এক্সপ্যান্ডেড হার্ট। একেবারে শেষ স্টেজে নিয়ে এসেছেন পেশেন্টকে। নিশ্চয় হাতুড়েদের পাল্লায় পড়েছিলেন? তারা হার্টের অবস্থা যা করেছে, তাতে আর বড়জোর তিন মাস—

—তিন মাস! বড়দা সুরথ শাসমলের শরীরটা ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল মনে হয়েছিল। অনিরুদ্ধ নিজেও তখন থরথর করে কাঁপছেন। চকিতে মনের পর্দায় ভেসে উঠেছিল স্ত্রী কাকলির মুখখানা। পরক্ষণেই মেয়ে লালির মুখ। লালি সেবছরই ক্লাস সিক্সে উঠেছে।

ডাঃ সেন অবশ্য ডাক্তারি নিয়ম অনুযায়ী মস্ত একখানা প্রেসক্রিপশন লিখে দিয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ফিজ হিসেবে হাত পেতে নিয়েছিলেন নোটের ভারী তাড়াটাও। তারপর বেল টিপে নির্দেশ দিয়েছিলেন চেম্বারের বাইরে অপেক্ষারত পরবর্তী পেশেন্টকে ভেতরে আসার জন্য। ডাক্তারদের নিয়ম তো এ রকমই।

অনিরুদ্ধর মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করে দেওয়ার পরও আশ্চর্য নির্লিপ্ত দেখাচ্ছিল ডাক্তার সেনকে। অনিরুদ্ধর দু-চোখ তখন ঝাপসা। অস্পষ্ট চোখে দেখেছিলেন, বড়দা চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলছেন, চল্ অনি—

অনিরুদ্ধ চেয়ারথেকে উঠে দাঁড়াতেই পারবেন না এমন মনে হচ্ছিল। সারা গা টলছিল তাঁর। পা বাড়াতে গিয়ে মনে হয়েছিল, মাথাটা বাঁই করে ঘুরে গেল। তার চোখের দিকে তাকিয়ে কী মনে হতে সুরথ হাত বাড়িয়েছিলেন, ধরব?

অনিরুদ্ধ ঘাড় নেড়েছিলেন, না—

বলেছিলেন বটে, কিন্তু মনে হচ্ছিল, বড়দা তাঁর হাতটা ধরলেই বুঝি ভাল হত। নইলে হয়তো পড়েই যাবেন।

দুজনে বাইরে বেরিয়ে এসেও কেউ কারও মুখের দিকে তাকাতে পারছিলেন না। মোটে চুয়াল্লিশ বছর বয়স অনিরুদ্ধর। কলকাতার একটা কলেজে ফিজিক্সের অধ্যাপক। স্টুডেন্ট হিসেবে ছিলেন ব্রিলিয়ান্ট। কেরিয়ার নিয়েই ব্যস্ত থেকেছেন বরাবর। কাকলিকে বিয়ে করার পর থেকে সংসার নিয়েও। লালিকে মানুষ করে

তুলতে হবে এমন ভাবনাতেই ব্যাপৃত রেখেছেন নিজেকে। বলা যায়, তাঁর প্রতিষ্ঠাপর্বের তখন সবে শুরু। লাইফ স্টার্টস অ্যাট ফর্টি, এই প্রবাদবাক্যটি নিয়ে কখনও আলোচনা করতেন কলিগদের সঙ্গে। চল্লিশের পর যখন সত্যিই সব কিছু ঠিকঠাক ক্লিক করতে শুরু করেছে, ঠিক সেইসময় এই বজ্রপাত।

ডাক্তারের চেম্বারের বাইরে এসে সুরথ ততক্ষণে সামলাতে চেয়েছেন অনিরুদ্ধকে, এ সব ডাক্তাররা নাম হয়ে গেলে শুধু টাকাটাই চেনে,—

অনিরুদ্ধ কোনও জবাব দেননি। ডাক্তারের একটা কথাতেই তাঁর সমস্ত পৃথিবী তখন উলটপালট হয়ে গেছে। মনে মনে শুধু বলছিলেন, কাকলি, তোমার কী হবে। লালির কী হবে?

—তোকে আমি অন্য ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব। সেদিন আমার এক কলিগ বলছিলেন, সুশীল সেনের ডায়াগ্‌নসিস এখন প্রায়ই ঠিকঠাক মিলছে না। বহুবাজারের কাছে ডাঃ ডে সি মুখার্জি বলে একজন ইয়াং হার্ট-স্পেশ্যালিস্ট আছেন। খুব নাম করেছে নাকি—

পরদিন সন্ধেয় তাঁরা জে সি মুখার্জির কাছে গিয়েছিলেন। এক্স-রে, ইসিজি দেখে ডাঃ মুখার্জী কিন্তু বলেছিলেন, সে কি! ডাঃ সেন এ কথা বলেছেন! আমার মনে হচ্ছে, একেবারে প্রাথমিক অবস্থা। ডোন্ট ওরি। ঠিকঠাক ওষুধ খাবেন, আর একটু সাবধানে থাকবেন। সব ঠিক হয়ে যাবে। আর হ্যাঁ, বেশি পরিশ্রম করবেন না আপাতত। রেস্টে থাকবেন, ভোরের দিকে একটু হাঁটাচলা করবেন। ফ্রেস অক্সিজেন উইল বী হেল্পফুল।

অনিরুদ্ধ ডাঃ মুখার্জির কথায় একটু আশার আলো দেখেছিলেন। ডাক্তারের সুদর্শন চেহারা, তাঁর গলার স্বর, মৃদু অথচ ভরাট আওয়াজ, সুন্দর বাচনভঙ্গি, আশ্বাসবাণী সব মিলিয়ে মনে হয়েছিল, এই হল ডাক্তার। একদিন আগেই ডাক্তার সেনকে দেখে মনে হয়েছিল, একজন কসাই। এখন ডাক্তার মুখার্জিকে মনে হল, একজন ঈশ্বর। ঈশ্বরই তো। ডাক্তাররা হয়তো জানেন না, শুধু তাঁর উপস্থিতি, তাঁর আশ্বাসবাণীই একজন পেশেন্টকে ভালো করে তুলতে পারে। একজন অসুস্থ মানুষকে দিতে পারে সুস্থ জীবন।

সেটা ছিল নাইনটিন এইট্টি সেভেন। তিনমাস নয়, ইতিমধ্যে তিন বছর কেটে গেছে। এই তিন বছরে তাঁর হার্ট আরও একটু বড় হয়েছে। হৃৎপিণ্ড বড় হওয়া মানে আয়ু আরও একটু কমে আসা। ডাঃ মুখার্জি তাঁকে আশ্বাস দিয়ে যান প্রতিনিয়ত, ডোন্ট ওরি, মিঃ শাসমল। কিন্তু অনিরুদ্ধ বুঝতে পারছেন, যে-কোনওদিনই থেমে যাবে তাঁর হৃৎপিণ্ড। যে কোনও মুহূর্তে। কাকলি বা লালিকে তিনি বা তাঁর দাদা

সুরথ কেউই পরিষ্কার করে বলেননি তাঁর এই মারাত্মক অসুখটির কথা। তিনি অসুস্থ এটুকুই জানে ওরা। তবু মাঝেমধ্যেই হেসে কাকলিকে কখনও একান্তে বলেছেন, কী জানি কতদিন বাঁচব!

কাকলি নিজেও মাঝেমধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজ্‌মা। বছরে অন্তত একবার ডেকাড্রন ডেরিফাইলিনের কোর্স তার বাঁধা। কিন্তু নিজের অসুখকে সে কখনও গুরুত্ব দেয় না। তাই অনিরুদ্ধর কথাও হেসে উড়িয়ে দিয়েছে, তুমি ভীষণ নার্ভাস। অসুখ কি আর মানুষের হয় না?

কাকলি বলেছে, তবু অনিরুদ্ধ আজকাল বুঝতে পারেন, কাকলি বোধহয় সবকিছু জানে। নিজের কথা না ভাবলেও অনিরুদ্ধর কথা ভাবে। সেও আজকাল অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে প্রায়ই। লালিকে ধমক দেয়, ভাল করে লেখাপড়া কর। এত ফাঁকি দিলে কি মানুষ হওয়া যায়! বাবার শরীরের এই অবস্থা—

সবুজ মাঠে ঘুরপাক খেতে খেতে অনিরুদ্ধ প্রায়শ দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। মাঝে-মাঝে হিসেব করতে থাকেন, কত টাকা জমল প্রভিডেন্ট ফান্ডে। এর মধ্যে দুটো এল আই সি-ও করে ফেলেছেন চুপিচুপি। অন্তত তার থেকেও যদি লাখখানেক টাকা কাকলিরা পায়—

অনিরুদ্ধ আগে কয়েকটা টিউশনি করতেন। শরীরের জন্য সেগুলো ছেড়ে দিতে হয়েছে একে-একে। শুধু মাইনেই এখন ভরসা। অথচ তাঁর কলিগরা ঢালাও কোচিং ক্লাস করে অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেছে এই কবছরে। কেউ-কেউ দোতলা বাড়িও করে ফেলেছে। শুধু তিনিই রয়ে গেছেন একই জায়গায়—

মাঠের চারদিকে একপাক ঘুরে আসার পর অনিরুদ্ধর হঠাৎ মনে হল, দূরে, মাঠের ফেন্সিংয়ের কাছে একটা টকটকে লাল বল ক্রমাগত মাঠের এক কোণ থেকে আর-এক কোণে ছুটে যাওয়া-আসা করছে। একটু খেয়াল করে দেখলেন, লাল বল নয়, লাল জামা-প্যান্ট পরে ডালিম।

ভেজা মাঠের উপর দিয়ে কোণাকুণি দৌড়চ্ছিল ডালিম। তার কেড্‌স্ থেকে ছপছপ করে জল ছিটকোচ্ছিল বারবার। যতটা জোরে দৌড়তে পারে ডালিম, আজ ততটা জোরে দৌড়তে পারছিল না। বৃষ্টি হলে এই এক ঝামেলা। তার সাদা কেড্‌সের এখানে-ওখানে কাদা লেগে যাচ্ছে। তার জামার পেছন দিকেও দু-চার ছিটে কাদা। তাদের অর্ফানেজের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ব্রজগোপাল মিত্রের চোখে পড়লেই বলবেন, যাও ডালিম, এক্ষুনি জামা-প্যান্ট ধুয়ে দাও। ঝকঝকে পরিষ্কার করে মেলে দিয়ে এস রোদ্দুরে। নইলে পরে আর দাগ উঠতে চাইবে না।

অর্ফানেজের সবকিছুই নিজের হাতে করতে হয় ডালিমদের। এঁটো থালা-বাসন

পরিষ্কার করা থেকে শুরু করে জামা-কাপড় কাচা, রাতে বিছানা করা, ভোরে বিছানা তোলা, সব। সবকিছুই পরিপাটি না দেখলে ভীষণ রেগে যান সুপারিন্টেন্ডেড। প্রায়ই একে-ওকে ডেকে ধমক দেন। প্রায়ই বলেন, আজ সন্ধের পর ফাদার আসবেন হোস্টেলে। সবকিছু ঝকঝকে না দেখতে পেলে—

দ্বিতীয় পাক ঘুরে এসে অনিরুদ্ধ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন মাঠের কোণের দিকে। একটু যেন হাঁপিয়ে পড়েছেন এর মধ্যে। ততক্ষণে বার তিন-চার কোণাকুণি দৌড়নোর পর ডালিমও দাঁড়িয়ে পড়েছে জিরোতে। সেও হাঁপাচ্ছে বেশ। লাল গেঞ্জির ভেতর তার বুক ওঠানামা করছে পরিশ্রমের ফলে। ছোটাছুটির জন্য বেজায় ঘেমে গেছে তার চোখমুখ। চুলের রাশ এসে পড়েছে কপালে। অনিরুদ্ধ হঠাৎ তার কাছে গিয়ে ডাকলেন, হ্যাল্লো, ডালিম—

ডালিম তার চোখমুখের উপর লুটিয়ে পড়া কোঁকড়াচুলের রাশ ডানহাত দিয়ে সরিয়ে তাকাল অনিরুদ্ধের দিকে। সাদা প্যান্ট-শার্ট পরা মানুষটার দিকে এগিয়ে এল পায়ে-পায়ে, ডাগর চোখদুটো তুলে বলল, গুড মর্নিং, আঙ্কল্।

অনিরুদ্ধ তার পরনের লাল জামা-প্যান্টের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমাদের পুজোর জামা-প্যান্ট কেনা হয়ে গেছে নাকি?

ডালিম হেসে বলল, এটা আমাদের ফাদারের দেওয়া জামা-প্যান্ট নয়। সেটা কাল প্রেয়ারের পর ফাদার আমাদের সবাইকে দেবেন বলেছেন। এটা আমাদের স্কুলের নতুন আন্টি দিয়েছেন।

—তাই! বাহ্। অনিরুদ্ধ হাসি-হাসি মুখে বললেন, তাহলে নতুন আন্টি তোমাকে খুব ভালবাসেন, বলো?

ডালিম আবার তার কপালের উপর ঝরে-পড়া চুল সরিয়ে বড় বড় চোখ করে বলল, আমাকে তো সবাই ভালবাসে—, বলেই আবার সে ছুটল মাঠের দিকে। কেড্‌সের জল আবার ছিটোতে লাগল ছপছপ করে। ততক্ষণে তার সঙ্গী হয়েছে অর্ফানেজের আরও তিন-চারটি ছেলে। রতন, টোটন, সমীর, তপেশ, মধু। মাঠে জল জমলে ওদের দৌড়তে বেশ মজাই লাগে বলে আজ মাঠময় হইচই করে ছুটছে ওরা।

ওদের ছোটাছুটির দিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়েছিলেন অনিরুদ্ধ। যেন জীবনের মূর্ত প্রতীক ওরা। গোটা জীবনটাই ওদের সামনে ছড়ানো রয়েছে। একরাশ বাধাবন্ধ ঠেলে সেই প্রাণময়তার দিকে ছুটছে সবাই।

হঠাৎ চমক ভাঙল অধ্যাপক খাসনবীশের গলার স্বরে, কী অমন করে দেখছ, শাসমল?

—ডালিমকে লাল জামা-প্যান্টে কী চমৎকার দেখাচ্ছে বলুন তো। ওদের নতুন আন্টি ওকে দিয়েছে জামা-প্যান্টটা, বলেই হঠাৎ অনিরুদ্ধ প্রশ্ন রাখলেন, আচ্ছা, ওদের নতুন আন্টি কোনটা, প্রফেসর খাসনবীশ? ওই সেদিন হেড-মিস্ট্রেসের সঙ্গে মাঠে এসেছিল যে চশমা-পরা সুন্দর মেয়েটা?

অধ্যাপক খাসনবীশ ঘাড় নাড়লেন, এক্‌জ্যাক্টলি। ফাদার উইলিয়াম সেদিন বলছিলেন, খুব ব্রিলিয়ান্ট মেয়ে। ওদের একজন হিস্ট্রির টিচার দরকার ছিল। নিউজপেপারে টিচারের জন্য অ্যাড্‌ভার্টাইজমেন্ট করেছিলেন। সাতষট্টিটা অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে ওই বন্দনা রায়কেই শেষ পর্যন্ত সিলেক্ট করেছেন ওঁরা। মডার্ন হিস্ট্রির এম-এ। বছরতিরিশেক বয়স। এখনও বিয়ে হয়নি।

—তা এমন ব্রিলিয়ান্ট মেয়ে এত কম মাইনেতে স্কুলে টিচারি করতে চলে এল? এরা তো ছ-সাতশর বেশি কাউকেও দেয় না শুনেছি।

—চাকরির যা বাজার তাতে এই চাকরির জন্যই এখন হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। এটা অরফ্যান স্কুল হলেও পড়াশুনোয় তো ভালই শুনেছি। খুব ডিসিপ্লিন্‌ড্। তা ছাড়া ঘরের খেয়ে চাকরি, যা পায় তাইই অনেক। তবে কর্নেল বলছিলেন, মেয়েটা নাকি ইন্টারভিউতে বলেছে, তার নাকি এ রকম অনাথ শিশুদের পড়ানোর একটা মিশন ছিল ছোটবেলা থেকে। আর বন্দনা খুব পপুলারও হয়ে উঠেছে নাকি।

কর্নেলের কথা উঠতে হঠাৎ অনিরুদ্ধ জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি আজ একা হয়ে গেছেন মনে হচ্ছে, কর্নেল আজ আসেননি।

অধ্যাপক খাসনবীশ ঘাড় নাড়লেন, সেই যে পরশু তাঁর ছোটগিন্নি জব্বলপুর থেকে এসেছে। ব্যস্, কর্নেল সেই থেকে ঘরে অন্তরিন। কাল সন্ধেবেলা গিয়েছিলাম খবর নিতে। অমনি ছোটগিন্নি করকর করে উঠল, ওয়েস্টবেঙ্গলে তো হরবকত বন্ধ্ কল করা হয়, তাই আমিও কলকাতা এসে দাদুর মর্নিং-ওয়াকের উপর বন্ধ্ কল করে দিয়েছি। পর পর দুদিন।

—বাহ্, ভারী ইন্টারেস্টিং।

—কর্নেল কাল মাঠে আসবেন বলেছেন। উইথ হিজ ছোটগিন্নি।

অনিরুদ্ধ জোরে হেসে উঠতে গেলেন, কিন্তু বাঁদিকের বুকে একটা পুরনো ব্যথা চাগাড় দিয়ে উঠল তৎক্ষণাৎ। যন্ত্রণায় বেঁকে গেল তাঁর মুখখানা। কিন্তু অধ্যাপক খাসনবীশ তা দেখতে পেলেন না। তিনি ততক্ষণে টুকটুক করে রাউন্ড দিতে শুরু করেছেন মাঠের অন্যপ্রান্তের দিকে।

ভাগ্যিস দেখতে পাননি ভদ্রলোক। তা হলে সে বড় লজ্জার হত। একজন চুয়াত্তর বছরের ইয়াংম্যানের পাশে তাকে সাতচল্লিশের ওল্ড ফুল বলে মনে হত যে। কিছুক্ষণ

চোখ বুজে ব্যথাটা সামলে নিয়ে ফের হাঁটতে শুরু করলেন। কবে যে হৃৎপিণ্ডটা একেবারে থেমে যাবে তা তিনি জানেন না। তবে যাবেই যে, এ কথা বুঝতে পারছেন প্রতিদিন। কিন্তু তার আগে তো তাঁর অনেক কাজ বাকি রয়ে গেছে। লালি সবে ক্লাস নাইনে উঠেছে। মেয়েটা মানুষ হয়ে গেলে একটু নিশ্চিন্ত হতে পারেন।

অনিরুদ্ধর ঠিক সামনেই হেঁটে যাচ্ছেন কুণ্ডু-দম্পতি। সবে বোধহয় সত্তর পেরিয়েছেন অবনীলাল কুণ্ডু। তাঁর স্ত্রী হেমাঙ্গিনী পঁয়ষট্টি প্লাস। অবনীলাল সবার কাছে এভাবেই পরিচয় করিয়ে দেন তাঁর স্ত্রীর। দুজনে পাঁচ বছরের ছোট-বড়। খুব অল্পবয়সে ভালবেসে বিয়ে করেছিলেন দুজনে। সে যুগের পক্ষে বেশ দুঃসাহসিক কাজই। তেইশ বছরের অবনীলাল আঠারো বছরের হেমাঙ্গিনীকে নিয়ে হঠাৎ পালিয়ে গিয়েছিলেন রাতারাতি। আর মাত্র তিনবছর পরে বিবাহের সুবর্ণজয়ন্তী পালন করবেন বলে মাঠের সবাইকে আগাম নিমন্ত্রণ করে রেখেছেন। শুধু একটাই যন্ত্রণা তাঁদের। তাঁরা নিঃসন্তান। গত সাড়ে সাতচল্লিশ বছর ধরে দুজনের সুখ-দুঃখের শরিক।

আজও সেভাবেই খুঁতখুঁত করছিলেন হেমাঙ্গিনী, তোমাকে কতবার বললাম, গলায় কিছু একটা জড়িয়ে এস। তখন শুনলে না, এখন কীরকম হিম-হিম লাগছে না?

অবনীলাল হেসে উঠে বললেন, কোথায় হিম! সবে আশ্বিন মাস চলছে। পুজো পার হয়ে গেলে তবু না-হয় বলা যেত কার্তিকে হিম। তাও আজকাল হেমন্তও যেন আর আগেকার দিনের হেমন্ত নেই। তখনও ফুলস্পিডে ফ্যান চালাতে হয়।

—কিন্তু শীত পড়ার আগেই তো তোমার বুকে কফ জমে। এই এক-দেড় মাসই তো তোমাকে সাবধানে রাখতে হয়।

—উঁহু। এ বছর আমি বেশ সুস্থ আছি। বরং তুমিই অম্বলের ব্যথায় কাবু হয়ে পড়েছ। বললাম, চল, পুজোর পর দেওঘর-মধুপুর কিংবা বিন্ধ্যাচলের দিকে মাসদুয়েক থেকে আসি, তা সে কথায় কান দিলে না।

হেমাঙ্গিনী প্রবলভাবে ঘাড় নাড়লেন, ও বাবা, অতদূরে গিয়ে মরি আর কী। সেবার চুনারে গিয়ে মনে নেই, তোমার বুকে কফ বসে কী টানটাই না উঠল। ডাক্তার নেই বদ্যি নেই, শেষে এমন অবস্থা হল, তোমাকে নিয়ে কলকাতা ফিরতে পারব এমন আশাও ছিল না।

অবনীলাল মুহূর্তে নস্যাৎ করে দিলেন সে কথা, সেবার তো একটু বেশি রিস্ক নিয়ে ফেলেছিলাম। কোনও প্রোটেকশন ছাড়াই ভোরবেলা সন্ধেবেলা ঘোরাঘুরি করতাম। একবার ভুল করেছি বলে কি বারবার সে ভুল করব। ও আমার আর কিচ্ছু

হবে না।

—না, না। আমার অম্বলের ব্যথা কমাতে গিয়ে শেষে তুমিই অসুস্থ হয়ে পড় আর কি। এ আমার কলকাতাই ভাল। হঠাৎ কিছু হলে ডাঃ দে সাগরের কাছে ছুটে যেতে পারব।

অনিরুদ্ধ মুগ্ধ হয়ে শুনছিলেন কুণ্ডু-দম্পতির কথাগুলো। শুনতে শুনতে হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। চার-পাঁচ বছর আগে কাকলি একদিন বলেছিল, লালির বিয়ে হয়ে গেলে আমরা একদম একা হয়ে যাব, তাই না? বুড়ো হয়ে গেলে তখন আমাদের কে দেখবে? মেয়ের যদি অনেক দূরে কোথাও বিয়ে হয়ে যায়! আজ হঠাৎ অনিরুদ্ধর মনে হল, সত্যিই তো, লালির যদি বিয়ে হয়ে যায়, আর তিনি যদি না থাকেন, তখন কাকলির কী হবে! কাকলি তো একদম একা হয়ে যাবে—

মাঠের কাদা বাঁচিয়ে স্যান্ডেল ফেলতে ফেলতে কংক্রিটের বেঞ্চের দিকে নজর ছুড়ে দিলেন নিশীথ দাশগুপ্ত। হ্যাঁ, তাঁর দুই বন্ধু রাউন্ড শেষ করে ইতিমধ্যে বসে পড়েছেন। ঘড়িতে এখন পাঁচটা বেজে পঁয়ত্রিশ। মর্নিং-ওয়াকে বেরুতে একটু দেরিই করে ফেলেছেন আজ। রোজই তাঁরা তিনজন শীলপাড়া থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একসঙ্গে মাঠে আসেন, ফেরেনও একসঙ্গে। মাঠের অনেকে তাঁদের বলে থাকেন থ্রি মাস্কেটিয়ার্স।

তাঁর দেরি হলে অন্য দু'জন—ক্ষৌণীশ হালদার আর অনিমেষ ঘোষদস্তিদার তাঁকে বলেন, কী ব্যাপার, মিঃ দাশগুপ্ত, শীত তো এখনও পড়েইনি, এর মধ্যে লেট রাইজার হয়ে গেলেন? না কি ইয়ং বৌ আর একটু বেশিক্ষণ ধরে রেখেছিল ভোরবেলা?

দুই মাঠ-বন্ধুর এই খোঁচাটি প্রায়শ হজম করতে হয় নিশীথবাবুকে। হালদার-ঘোষদস্তিদার দু'জনেই বছরখানেক হল রিটায়ার করেছেন। তাঁর অবশ্য চাকরি আছে আরও চোদ্দ মাসের মতো। তিনবন্ধুর জন্মসাল একই হওয়া সত্ত্বেও সার্টিফিকেটে নিশীথবাবুর বয়স বছরদুয়েক কমানো ছিল। তাই তাঁর চাকরিও অন্য দুজনের তুলনায় বছর দুয়েক বেশি হবে। সেজন্য অন্য বন্ধুরা তাঁকে মনে-মনে কিছুটা ঈর্ষাও করেন। তার উপর বেশি বয়সে বিয়ে করার ফলে তাঁর স্ত্রী শুক্লা এখনও চল্লিশ। ন' মাস ছ' মাসে শুক্লা তাঁর সঙ্গে মাঠে বেড়াতে এসে বন্ধুদের ঈর্ষা বাড়িয়ে দিয়ে যায় কয়েক ডিগ্রি। এখনও শুক্লা যথেষ্ট যুবতী এবং সুন্দরীও। মাঝেমধ্যে গ্রুপ-থিয়েটারে অভিনয় করে বলে চেহারাটা অতিযত্নে আরও ঠিকঠাক করে রেখেছে এখনও। স্ত্রী-ভাগ্য তো ভালোই, উপরন্তু নিশীথ দাশগুপ্তর শরীর স্বাস্থ্যও অন্যদের তুলনায় একটু বেশিরকম ভালো। মাঠের প্রৌঢ় বা বৃদ্ধরা মর্নিং-ওয়াকে এসে যখন পারস্পরিক রোগের খবর

বিনিময় করেন, তখন মুচকি হাসতে হাসতে সেটা বেশ উপভোগ করেন তিনি। বলেন, ঘাটের কাছে পৌঁছেছি বটে, কিন্তু আমার শরীরে মাত্র একটাই রোগ। আমি একটু পানাসক্ত।

কথাটা শুনে কেউ একটু বাঁকাচোখে তাকালে সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঝাঁকাবেন, উঁহু, যা ভাবছেন তা নয়। ওইসব বীয়ার, হুইস্কি বা রামের সঙ্গে দোস্তি নেই আমার। এ পান সে পান নয়। সর্বক্ষণ মুখের ভেতর জাবর কাটি। হুঁ, খয়ের, সুপুরি আর জর্দা-সহযোগে।

সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত সারাদিনে কতগুলো যে পান খান, তা তিনি নিজেও হিসেব রাখতে পারেন না আজকাল। তাঁর স্ত্রী শুক্লাও নয়। তাঁর শরীরের কোনও রোগ নেই জেনে রিটায়ার্ড ম্যাজিস্ট্রেট ক্ষৌণীশ হালদার প্রায়ই বলেন, ধুর মশাই, এমন সলিড্ চেহারা যখন, তখন কোন দুঃখে সুখের ভোরঘুম ছেড়ে মাঠে আসেন বলেন তো। আমার প্রেশার রোজই হাই হয়ে যাচ্ছে বলেই না—

হা হা করে হাসেন নিশীথ দাশগুপ্ত। ছোট্ট গোলগাল চেহারা তাঁর, ভুঁড়িটাই যা একটু বড় হয়ে উঠছে দিনকে দিন, বলেন, ইন ফ্যাকট, আই ওয়ান্ট টু লিভ আ লঙ্ লাইফ। তাইই—

ক্ষৌণীশ হালদার বলে ওঠেন, সত্যি, শরীর ভালো থাকতে শরীরের মর্যাদা বুঝতে শিখিনি। ছেলেবেলায় স্বাস্থ্যবইতে পড়তাম, হেলথ্ ইজ ওয়েল্থ্। কথাটার মানে বুঝলাম এই বুড়ো বয়সে, যখন রোগের ডিপো হয়ে উঠেছি। আগে বুঝতে পারলে, আপনার মতো আরও কিছুদিন এনজয় করা যেত জীবনটা।

নিশীথবাবু হেসে ওঠেন, জাবর কাটতে কাটতে বলেন, সবই তো ভালো আমার শুধু চাকরিটা আরও বছর দশেক বেশি করতে পারলেই সোনায় সোহাগা হতো।

নিশীথবাবুর মুখে হাসি লেগে থাকলেও তাঁর বুকের ভেতরটা কিন্তু চিনচিন করতে থাকে সর্বক্ষণ। আর ক'মাস পরেই রিটায়ার করবেন, অথচ তাঁর দুই ছেলেমেয়ে এখনও নাবালক। মেয়েটি বড়, ক্লাস টেনে উঠেছে এবার। ছেলেটি ছোট, তার ক্লাস এইট। এই দুই ছেলেমেয়েকে নিয়েই তাঁর যাবতীয় ভাবনা। রিটায়ারমেন্ট হলে কী করে সংসার চালাবেন তা ভেবে কুলকিনারা করতে পারেন না। শুধু বুঝতে পারেন, আরও অনেকদিন বেঁচে থাকতে হবে তাকে। তাইই ভোরবেলা উঠে, শরীর-স্বাস্থ্য আরও দীর্ঘদিন অটুট রাখতে চলে আসতে হয় মাঠে। হালদার আর ঘোষদস্তিদার দু'জনেই বাড়ি করে, ব্যাঙ্কে ক্যাশব্যালেন্স নিয়ে আপাতত নিশ্চিন্ত। ক'দিন পরেই ক্ষৌণীশ হালদারের মেয়ের বিয়ে। প্রায় একইসময়ে অনিমেষ ঘোষদস্তিদারেরও ছেলের বিয়ে। দু'জনেরই এইটেই শেষ কাজ। তারপর দু'জনেই

নিশ্চিন্ত। শুধু তিনিই গাড্ডায় পড়ে গেছেন বেশ।

এতসব কথা মনের ভেতর ঢালা-উপুড় করতে করতে নিশীথ দাশগুপ্ত কংক্রিটের বেঞ্চের কাছে পৌঁছে দেখলেন, বাকি দুই মাস্কেটিয়ার্স ভীষণ উত্তেজিত, ক্রুদ্ধ। হঠাৎ আবার কী হল, বুঝতে পারলেন না। দু'জনের মধ্যে প্রায়শ তর্ক শুরু হয়ে যায়। কথা বলতে বলতে ক্ষৌণীশ হালদার চট করে রেগে যান মাঝেমধ্যে। অনিমেষ ঘোষদস্তিদার ফোড়ন কেটে তাঁকে আরও একটু উস্কে দেন। শেষে নিশীথ দাশগুপ্তকে মধ্যস্থ করতে হয় দুজনের কাজিয়ায়। আজ আবার কী ইস্যু, কে জানে! হয়তো পাঞ্জাব-ইস্যু।

কিন্তু না, কান পাততেই শুনলেন, ক্ষৌণীশ হালদার বলছেন ওটি হচ্ছে না, ঘোষদস্তিদার। অঘ্রাণ মাসের প্রথম দিনটিই আমার। আমার মেয়ে নিজেই পাঁজি দেখে দিনক্ষণ নির্ধারণ করে ফেলেছে। আপনার ছেলের বিয়েই পিছোতে হবে, নইলে দু' জনেরই লস। কেউ কারোর বাড়ি নেমন্তন্ন খেতে যেতে পারব না। বন্ধুবান্ধবরাও কার বাড়ি যাবে, কার নেমন্তন্ন রাখবে, তা ভাবতে জেরবার হয়ে যাবে।

অনিমেষ ঘোষদস্তিদার মাথা নাড়ছেন, তা কী করে হবে। আমার ছেলে তো বিয়ের জন্য পাগল হয়ে উঠেছে। পারলে এই আশ্বিন-কার্তিকেই বিয়ে করে ফেলে আর কি। নেহাৎ পাঁজিতে দিন নেই তাই। তাও বলে কিনা, রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করবে। আশ্বিন-কার্তিকে দিনক্ষণ নেই যখন, তখন অনুষ্ঠান করতে হবে না। তারপরে ঠিক হয়েছে, অঘ্রাণের প্রথম দিনেই—

ক্ষৌণীশ হালদার ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললেন, তা হয় না, আমার হবু জামাই অফিসে ছুটির জন্যে দরখাস্ত করে ফেলেছে। এখন কি আর দিন বদলানো যায়? আপনি কী বলেন, দাশগুপ্ত? আপনি তো এককালে ল পড়েছিলেন, একটু পরামর্শ দিন তো—

নিশীথ দাশগুপ্ত মুচকি হেসে বলেন, এ বড় কঠিন প্রশ্ন। এহেন পরামর্শ কি এত সহজে দেওয়া যায়? আরও শুনানি প্রয়োজন। প্লিজ প্রসিড—

রিটায়ার্ড ম্যাজিস্ট্রেট ক্ষৌণীশ হালদার হো হো করে হেসে বললেন, আমার কেসটা বরং আপনাকেই দিই, দাশগুপ্ত। ঘোষদস্তিদার একেবারে গোঁ ধরে রয়েছে। আপনিই বরং আমার হয়ে প্লিড্ করুন—

নিশীথ দাশগুপ্ত মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন। গত কয়েকমাস ধরে দু'জনের মধ্যে ছেলে-মেয়ের বিয়ে ছাড়া অন্য আলোচনা নেই। অনিমেষ ঘোষদস্তিদার চাকরি করতেন ফরেস্টে। সারাজীবন বন-বাদাড় নিয়েই কাটিয়েছেন। কিন্তু তাঁর নেশা হল মাছ-ধরা। মাছের সীজনে প্রায় প্রতি রবিবারেই তাঁকে মাঠে দেখা যায় না। মাঠ-বন্ধুদের ছেড়ে মাছ-বন্ধুদের নিয়ে কোনওদিন পাড়ি দেন বারাসাতের দিকে, কোনও

দিন ফলতা বা ক্যানিং এ। এখন হঠাৎ ছেলের বিয়ের ঠিক হওয়ায় মাছ-ধরার প্রোগ্রাম বন্ধ রাখতে হয়েছে গৃহিনীর হুকুমে। রবিবারেই যত লোক-লৌকিকতার দিন কিনা।

অনিমেষবাবুর এক ছেলে এক মেয়ে। মেয়ের বিয়ে আগেই সেরে ফেলেছিলেন। এবার ছেলের বিয়ে। ছেলেটি ডাক্তার। রেলে চাকরি পেয়েছে। এখন পোস্টিং চক্রধরপুরে। বলছিলেন, বিয়েটা হয়ে গেলে ঝাড়া হাত-পা হয়ে যাই। বুড়ো আর বুড়ি দু'জনে থাকিব, আর মৎস্য মারিব খাইব সুখে। ওদিকে ক্ষৌণীশ হালদারের ছেলে নেই দুটিই মেয়ে। জ্যেষ্ঠ কন্যার বিয়ে হয়েছে অনেক আগে। এবার কনিষ্ঠার বিয়ে। একটু দেরি করেই দিচ্ছেন। দেরি করার একটা অন্য কারণও ছিল। দু'জনে প্রায় একই সময়ে রিটায়ার করার পর গল্পে-গল্পে নিজেদের মধ্যে একদিন আলোচনা করেছিলেন, দু'জন বেয়াই সম্পর্কে আবদ্ধ হলে মন্দ হয় না। দু'জনের ছেলেমেয়েই যখন বিয়ের যুগ্যি—

তা নিয়ে যথেষ্ট হাসিতামাশাও করেছেন মাঠে এসে। অপেক্ষা করছিলেন অনিমেষবাবুর ছেলের চাকরিটার জন্যে। চাকরি পেতেই যখন বিয়ের কথাবার্তা পাকা, তখনই হঠাৎ একটা গোলযোগ। অনিমেষবাবুর ছেলে চাকরির নিয়োগপত্র হাতে পেতেই বাড়িতে জানাল, বহুকাল ধরেই একটি মেয়ের প্রেমে পড়ে আছে সে। এখনই বিয়ে করতে চায়। ঘটনাটা অনিমেষবাবুর কাছে প্রায় বজ্রপাতের মতো।

ব্যাপারটা জানাজানি হওয়ার পর দুই বন্ধুতে সম্পর্কের ফাটল ধরার উপক্রম। সে সময় নিশীথ দাশগুপ্তই মধ্যস্থ করে মিটিয়ে ফেলেছিলেন ব্যাপারটা। ক'দিন চেষ্টা চরিত্রের পর ক্ষৌণীশ হালদার একটি সুপাত্রের সন্ধান পেতে আপাতত সেই মনোমালিন্য নেই। দু'জনেই এখন ছেলে-মেয়েদের বিয়ের গল্প করে জমিয়ে রাখছেন আসর।

অনিমেষ ঘোষদস্তিদার তখনও খুঁতখুঁত করছেন, ছেলেটাকে বুঝিয়ে পারা যাচ্ছে না মশাই। পনেরদিন আগে পরে বিয়ে করলে মহাভারত এমন কিছু অশুদ্ধ হবে না, কিন্তু সে তা বুঝতেই চাইছে না। যেন সাতদিন পরে বিয়ে করলে পালিয়ে যাবে মেয়েটা।

নিশীথ দাশগুপ্ত বললেন শুনেছি। মেয়েটা একেবারে ডানাকাটা পরী। হয়তো তাইই ভাবছে, দেরি করলে যদি হাতছাড়া হয়ে যায়। তাহলে এক কাজ করুন। আপাতত রেজিস্ট্রিটা করে রাখুক। তারপর অঘ্রাণের মাঝামাঝি একটা দিনক্ষণ দেখে—

অনিমেষ ঘোষদস্তিদার অবাক হয়ে বললেন, বাহ্, আপনি বেশ লোক তো, দাশগুপ্ত। হালদার আপনাকে প্লিড্ করার জন্য বলল, আর আপনি অমনি তার হয়ে

মামলা লড়তে শুরু করলেন?

নিশীথ দাশগুপ্ত একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, আসলে ব্যাপারটা কি জানেন। আমি বরাবরই মেয়েদের ফর-এ। হালদারের মেয়ে একবার বিয়ের কথা ভেঙে যাওয়ায় একটু আপসেট হয়ে আছে। তার উপর নিশ্চয় শুনতে পাবে, তার প্রতিদ্বন্দ্বী ডানাকাটা পরী। তাতে তার মনে একটু কমপ্লেক্স হওয়ার সম্ভাবনা। অতএব তার বিয়েটা আগেই হয়ে যাক—

অনিমেষ ঘোষদস্তিদার দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, কী আর করব বলুন, সবই কপাল। যার যেখানে বিয়ের লেখন আছে, তার বাইরে হওয়ার উপায় নেই। নইলে হালদারের মেয়েকে এভাবে ঠেলতে পারে আমার ছেলে! মেয়েটি কী ব্রিলিয়ান্ট! যেমন দেখতে-শুনতে, তেমনি বুদ্ধিমান। আর গুরুজনদের কী সম্মান করে কথা বলে। আমি ওদের বাড়িতে গেলে কী ভক্তিশ্রদ্ধাই না করত! আমার ছেলে হঠাৎ ডুবে-ডুবে জল খাচ্ছিল তা জানব কী করে!

নিশীথ দাশগুপ্ত বললেন, বিয়েটা হলে কিন্তু রাজযোটক হতো। কিন্তু ছেলে যখন প্রেম করে ফেলেছে তখন কী আর করা! যাই হোক, হালদারের হবু-জামাই তো আর ফেলনা নয়। বোট্যানিতে পি. এইচ. ডি। টি-গার্ডেনের ডেপুটি ম্যানেজার। ব্রাইট প্রসপেক্ট। শুধু একটু দূর হয়ে গেল এই যা।

ক্ষৌণীশ হালদার বললেন, আমার গিন্নি তো আসাম শুনে প্রথমে হৈ-চৈ করছিল। পরে শুনল বছরে দু' বার প্লেনে যাতায়াত করার ফেয়ার পাবে, তাছাড়া বছর সাত-আটের মধ্যে কলকাতায় নিশ্চিত পোস্টিং। তখনই একটু নিশ্চিন্ত হয়েছে—

বলতে বলতে হঠাৎ চোখ পড়ল সামনে দিকে, অবাক হয়ে বললেন, আরে, গুড্ মর্নিং বোস মাঠে এসেছেন যে—

তাঁদের কথার মধ্যেই টুকটুক করে হাঁটতে হাঁটতে এসে পৌঁছেছেন অনুতোষ বোস। থাকেন বেহালা ট্রাম ডিপোর কাছে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে জেম্‌স্ লঙ্ বরাবর হেঁটে চলে আসেন শখের বাজার। সেখান থেকে ম্যাক সাহেবের মাঠ। আসার পথে যার সঙ্গেই দেখা হয়, চেনা-অচেনায় কোনও ভেদাভেদ নেই, সবাইকে 'গুড মর্নিং, কেমন আছেন,' বলতে বলতে আসবেন। হঠাৎ দেখলে মনে হবে, তাবৎ মানুষজনের সঙ্গেই ওঁর চেনাজানা। অথচ আসলে তা নয়। প্রাতঃভ্রমণকারীরা তাই ওঁর নামকরণ করেছেন গুড্‌মর্নিং বোস।

গুডমর্নিং বোসের বয়স সত্তরের ওপারে, অথচ যাকে বলে এখনও স্টাউট চেহারা। ঋজু শিরদাঁড়া, শক্তসমর্থ শরীর, তাঁকে মাঠে ঢুকতে দেখে নিশীথ দাশগুপ্ত

আশ্চর্য হয়ে বললেন, কী ব[illegible]. মিঃ বোস, আপনার পাহাড়ে যাওয়ার কথা ছিল না!

গুডমর্নিং বোস মাথা ঝাঁকালেন, যাব বলেই তো আপনাদের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে গিয়েছিলাম সেদিন। সব ঠিকঠাক, দু' মাস আগেই টিকিট কাটা, এবার গন্তব্য ছিল হিমালয়ের ভ্যালি অব্ ফ্লাওয়ার্স, কিন্তু হিমালয়দেবতা এবার আমার উপর বোধহয় রাগ করেছেন। যাওয়া হল না—

—কেন, কী হল? বাধা পড়ে গেল?

—আর বলবেন না। ছেলেরা হাঁ হাঁ করে এসে ফরমান জারী করল, এবার নর্থ ইন্ডিয়ায় ভীষণ গোলমাল। ইস্কুলের ছেলেমেয়েরা, কলেজের ছেলেমেয়েরা সব প্রচণ্ড আন্দোলন শুরু করেছে। দিল্লিতে, হরিয়ানায় ইয়াং ছেলেমেয়েরা মণ্ডল-কমিশনের প্রতিবাদে হাসতে হাসতে গায়ে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে। গোটা নর্থ ইন্ডিয়ায় প্রবল টেনশন। এরপর জাতপাত নিয়ে ভীষণ একটা লড়াইও শুরু হয়ে যেতে পারে। সবাই ট্রেনের টিকিট ক্যানসেল করছে। এখন কোনওমতেই যাওয়া চলবে না। বললাম, আরে, আমি তো যাব হিমালয়। সেখানে কোনও জাতপাতের ব্যাপার নেই। সেখানে একমাত্র ঈশ্বরই থাকেন। দিব্যি নিশ্চিন্তে এক-দেড় মাস কাটিয়ে দেব। পাহাড়ে-পাহাড়ে ঘুরে বেড়ানোর কী যে মজা তা তো সবাই ফিল করতে পারে না। কিন্তু ছেলেরা একেবারে নাছোড়।

—তাহলে এই তিনদিন মাঠে এলেন না কেন?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে গুড মর্নিং বোস বললেন, দুঃখে। লাস্ট থার্টি ইয়ার্স ধরে হিমালয়ে কাটিয়েছি পুজোর মরসুমটা। আর এবারই যাওয়া হল না। কলকাতায় মাইকের অত্যাচারে জেরবার হতে হবে এ ক'দিন! ছেলেরা বুঝল না যে, পাহাড়ে হাঁটাচলা করে আমি দু-এক বছর করে আয়ু বাড়িয়ে নিয়ে আসি প্রতিবছর। রোজ ভোরে পাহাড়ে আট-দশ কিলোমিটার মর্নিং-ওয়াক করলে মানুষ অমরত্ব অর্জন করে।

ক্ষৌণীশ হালদার বললেন, না গিয়ে ভালোই করেছেন মিঃ বোস। সবসময় সেফ্ গেম খেলাই বাঞ্ছনীয়।

হঠাৎ মাঠের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি দেখে সবার নজর গেল সেদিকে। কয়েকজন যুবতী-বৌ হঠাৎ গায়ের মেদ ঝরাতে খুব দৌড়চ্ছে ক'দিন। আরতি, শ্যামলী, রচনা খুব বন্ধু হয়ে গেছে মাঠে বেড়াতে এসে। বয়স তিরিশের মধ্যেই সব, অথচ এমন মেদ অর্জন করেছে, হঠাৎ দেখলে মনে হবে চল্লিশের ওপারে। সেদিন রচনা হাসতে হাসতে বলেছিল শ্যামলীকে, জানো, আমার কর্তা বলেছে, এমন ঢেপ্‌সি বৌ নিয়ে ঘর করব না। পাশে নিয়ে হাঁটলে মনে হয় দিদিমার সঙ্গে হেঁটে যাচ্ছি।

শ্যামলী বা আরতির অবস্থাও তদ্রূপ। মিসেস সিন্‌হা সেদিন ওদের দেখে অ্যাড্‌ভাইজ করেছেন, ওরকম গল্প করতে করতে হাঁটলে কোনও লাভ হবে না ভাই। আমাকে দেখে শেখো। চল্লিশ পেরিয়েছি তবু অনায়াসে বত্রিশ বলে চালিয়ে দিতে পারি। কারণ কী জানো! গায়ের ঘাম ঝরিয়ে হাঁটতে হবে। তোমরা যে শুধু ডায়েট কন্ট্রোল করো আর আস্তে আস্তে হাঁটো, ওতে কোনও উপকার হবে না। দৌড়োও। ক'দিন দৌড়ে আগে কিছু ওজন কমিয়ে নাও, তারপর জগিং, তারপর—

তিনজনে খানিকক্ষণ দৌড়ে এসে প্রবলভাবে হাঁপাতে হাঁপাতে বসে পড়ল কংক্রিটের বেঞ্চে। রচনা তার থলথলে শরীর নিয়ে হাপরের মতো শ্বাস টানছে। শ্যামলীকে বলল, না ভাই। কর্তা আমাকে ডিভোর্স করে দেয় দিক। আমি আর ছুটতে পারব না। উফ্ বাবা—

এর মধ্যে হঠাৎ ঢং ঢং করে গির্জার ঘণ্টা বেজে উঠতেই সব্বাই চুপ। সেই মুহূর্তে নজরে পড়ল ফাদার উইলিয়াম তাঁর সাদা পোশাকের উপর নীল কোমরবন্ধনী সামলাতে সামলাতে দ্রুত পায়ে হেঁটে যাচ্ছেন প্রার্থনাগৃহের দিকে। আজ বোধহয় একটু দেরিই হয়ে গেছে ফাদারের। একটু পরে পিলপিল করে ছেলেরাও বেরিয়ে এল অর্ফানেজের গেট খুলে। আজ সবারই চোখমুখ শান্ত, উচ্ছল। প্রত্যেকের ভেতরে একটা আলাদা উল্লাস। আজ ওদের সবাইকে পুজোর নতুন জামাপ্যান্ট দেওয়া হবে। তাই শরতের রোদও বোধহয় ঝকমক করছে চারদিকে।

এখনও মাঝেমধ্যে এক-আধ পশলা বৃষ্টি হলেও চারদিকেই একটা পুজো পুজো ভাব। নীল আকাশে দু-একটুকরো সাদা মেঘ। শরতের তুলো-পেঁজা মেঘ ছবি এঁকে রেখেছে আকাশের এখানে-ওখানে। ভোরের কুয়াশারং কেটে প্রথম যে রোদ সবুজ ঘাসের উপর এসে পড়ছে, তার রঙও এখন কেমন সোনা-সোনা। রেন-ট্রি গাছের পাতার ফাঁকফোকর পেরিয়ে সেই সোনারঙের রোদ এই মুহূর্তে নিশীথবাবুর গায়েও দু-এক চিলতে। আর দু-তিনদিন পরেই পুজোর ছুটি। শুক্লা এ-বছরও খুব ধরেছিল, রেলের পাশ নিয়ে বাইরে কোথাও ঘুরতে যেতে। টাকাপয়সা নিয়ে কখনও তেমন করে মাথা ঘামাননি নিশীথবাবু। রেলদপ্তরের পাশের কল্যাণে সারা ভারতের অনেকগুলো ট্যুরিস্ট-স্পটই ঘুরে এসেছেন সপরিবারে। এবারই প্রথম বললেন, থাক। কারণ ওই রিটায়ারমেন্ট। আর তো মাঝে মাত্র ক'মাস।

এখন বুঝতে পারেন নিশীথ দাশগুপ্ত, .·রি করে বিয়ে করাটা বড্ড বোকামি হয়ে গেছে।

আসলে বিয়েই করবেন না এমন ভেবেছিলেন একসময়। বছর চল্লিশেক বয়স হতে যখন তাঁর আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধব সবাই ধরে নিয়েছেন তিনি একজন

কন্‌ফার্মড্ ব্যাচেলর, সেসময় হাজারীবাগে পোস্টিং হওয়াটাই তাঁর জীবনের টার্নিং পয়েন্ট। ওখানকার বেঙ্গলী ক্লাবের নাটকে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছিল শুক্লা সেনগুপ্ত নামের একটি মেয়ে। মেয়েটার অভিনয় দেখে মনে এত্ব ধরে গেল যে, তাঁকে বিয়ে করার জন্য প্রায় ক্ষেপে উঠেছিলেন তখন। এর-ওর মাধ্যমে প্রস্তাবটা মেয়েটার বাড়ি পৌঁছে দিতেই তারা লুফে নিল সঙ্গে সঙ্গে। রেলের অফিসার, ভালো মাইনে পান, অতএব চল্লিশ পার হওয়া নিশীথবাবুর সঙ্গে বাইশ বছরের শুক্লার বিয়ে হতে একমাস সময়ও লাগেনি। এখনও মজা করে এর-ওর কাছে তাঁর বিয়ের এহেন গল্পটা বলে থাকেন নিশীথবাবু।

তিন অতি-স্বাস্থ্যবতী যুবতী তখনও নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করছে। হঠাৎ শ্যামলী আঙুল তুলে আরতিকে দেখায় মাঠের ট্র্যাক ধরে দৌড়ুতে থাকা এক বয়স্ক ভদ্রলোককে। ফিসফিস করে বলে, জানিস, ওই ভদ্রলোক না মাত্র ছ'মাস আগে বিয়ে করেছেন।

আরতি একটু জোরেই ব্যক্ত করে ফেলল তার বিস্ময়, বলিস কি তুই? ওই বুড়ো!

—সেইজন্যেই তো রোজ ভোরে যুবক হওয়ার জন্য এত পরিশ্রম, ছোটাছুটি। মাথার চুল আসলে কিন্তু সাদা। কলপ করে কালো কুচকুচে করে ফেলেছেন। আমাদের বাড়ির পাশেই থাকেন—

তিনজনেই একসঙ্গে হেসে উঠল।

নিশীথ দাশগুপ্তও মনে মনে হাসলেন। তাঁর বিয়ের বয়স অবশ্য আরও বেশি, আঠারো বছর। তবু তাঁকেও তো মাথার চুলে কলপ লাগাতে হয়েছে। ভাগ্যিশ ওই মহিলারা জানেন না, তাঁর মেয়ে ক্লাস টেনে পড়ে, ছেলে এইটে—

বেশ একটু জোরেই হাঁটছে সুরঞ্জন। দু-রাউন্ড শেষ করে তৃতীয় রাউন্ড শুরু করার সময়ই তার মনে হল, বেশ হাঁপিয়ে পড়েছে। শরীরটা দুর্বল-দুর্বল লাগছে। সে তার গতি সামান্য কমিয়ে দিতেই দেখল, তাকে ক্রশ করে যাচ্ছেন দেবাশিস দত্ত। চলে যাওয়ার মুহূর্তে মৃদুকণ্ঠে বললেন, গুড মর্নিং, মুখার্জি। সুরঞ্জন হেসে বলল, মর্নিং। দেবাশিস দত্ত তার থেকে একটু বড়ই। কোন এক প্রাইভেট ফার্মের চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট, চল্লিশ পেরিয়ে গেছেন, কিন্তু সুঠাম চেহারা। ভরাট মুখে ফ্রেঞ্চকাট্ দাড়ি থাকায় দিব্যি ইয়ং, হ্যান্ডসাম দেখতে লাগে। হাঁটেনও বেশ স্পিডে। অন্তত পাঁচরাউন্ডের আগে রেস্ট নিতে দাঁড়ান না।

অথচ মাত্র দু-রাউন্ডেই আজ হাঁপিয়ে পড়ল সুরঞ্জন। ঝিমঝিম করছে মাথা, বুকেও শ্বাসকষ্ট। অযত্নে আর অবহেলায় শরীরটাকে একেবারে শেষ করে ফেলেছে

সে। সাঁইত্রিশ বছরেই সে যে প্রৌঢ় হয়ে গেল।

মাত্র মাসদুয়েক হল, সে এই ম্যাকডোনাল্ড'স গ্রাউন্ডে মর্নিং-ওয়াক করতে আসছে। তার আগে প্রাতঃভ্রমণের কথা কখনও ভাবেইনি সে। কিন্তু তা বলে লেট-রাইজার কখনও ছিল না। আসলে অল্প বয়স থেকে সে গ্রন্থকীট। একটু কবিতা লেখালিখিরও অব্যেস হয়েছে ক-বছর হল। বিভিন্ন খবরের কাগজে ফিচার লিখে একটু-আধটু নামও করে ফেলেছে। পড়াশুনো, লেখালিখি নিয়েই তার সকাল-সন্ধে কেটে যায়। এর মধ্যে টুকটাক শারীরিক বৈকল্যে অসুস্থ হয়ে পড়তে লাগল মাঝেমধ্যে। ডাক্তার-টাক্তারও দেখাচ্ছিল। হঠাৎ মাসতিনেক আগে একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘটে গেল তার শরীরের উপর দিয়ে।

সেদিন একটু বেশি রাত করেই তার লেখার টেবিল ছেড়েছিল। কেমন যেন ঝিমঝিম করছিল মাথাটা। নিশ্চয় পেটে গ্যাস ফর্ম করেছে। তাতে ঘুম আসতেও খানিকটা দেরি। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল জানে না। হঠাৎ মাঝরাতে ঘুম ভাঙতেই মনে হল, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে তার। বুকের ওপর কী এক পাষাণভার চেপে বসেছে। বুঝতে পেরেই ঝটকা মেরে উঠে বসতে চাইল, কিন্তু পারল না। তার সারা শরীর যেন অবশ, বিশেষ করে ডানহাতটা।

ভয় পেয়ে সে চেঁচিয়ে ডাকতে চাইল বিশাখাকে, বিশাখা, শিগগির ওঠ, আমি বোধহয় মরে যাচ্ছি—

ডাকতে চাইল, কিন্তু গলা দিয়ে কোনও স্বরই বেরুল না। তার গলা শুকিয়ে ততক্ষণে কাঠ। ঢোক গিলতে গিয়েও মনে হল, ঢোক গিলতে পারছে না। তাতে আরও ভয় পেয়ে গেল আবার চেঁচিয়ে ডাকতে চাইল, বিশাখা, বিশাখা—। এবারও স্বর বেরুল না গলা দিয়ে। শুধু বুঝতে পারল, তার মুখ দিয়ে একধরনের গোঁ গোঁ শব্দ বেরুচ্ছে। বারকয়েক এ রকম গোঁ গোঁ শব্দ বেরুতে পাশে নিঃসাড়ে ঘুমিয়ে থাকা বিশাখার ঘুম ভেঙে যায়। সে ধড়মড় করে উঠে বসল অন্ধকারে, সুরঞ্জনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল, কী হয়েছে?

কী হয়েছে, সুরঞ্জন বলতে পারছে না। তার জিবদুটোও যেন অবশ, অসাড়। বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডে শুধু ধক্‌ধক্‌ শব্দ। হঠাৎ তার মনে হল, এরই নাম বোধহয় স্ট্রোক।

ততক্ষণে হাতড়ে হাতড়ে বেড্‌সুইচ জ্বালিয়ে ফেলেছে বিশাখা। সুরঞ্জনের চোখমুখের অবস্থা, অবশ শরীর দেখে হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠল, এ তোমার কী হয়েছে? তুমি অমন করছ কেন?

সুরঞ্জন নিজেও বুঝতে পারছে না, তার কী হয়েছে। আলো জ্বালার পর

খানিকক্ষণ ধাতস্থ হতে সে কোনওক্রমে বোঝাতে পারল, তার ডানহাত পুরোপুরি প্যারালাইজ্‌ড্‌। বুকে পাষাণভার, বেশ শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। ভাল করে কথাও বলতে পারছে না।

তাদের হাউস-ফিজিসিয়ান ডাঃ মুখার্জি এই পাড়াতেই থাকেন। তৎক্ষণাৎ বিশাখা ডাক্তারকে একটা কল দিল জরুরীভাবে। রাত তখন বোধহয় তিনটে হবে। চারদিক ঘুটঘুট করছে অন্ধকার। মিনিট কুড়ির মধ্যেই হাতে ব্রিফ-কেস নিয়ে তাদের বাড়ির কলিংবেল টিপলেন ডাঃ মুখার্জি।

বিশাখা দরজা খুলে দিতেই ডাক্তার তার পাল্‌স দেখে প্রেসার মাপার যন্ত্র বার করলেন। পরীক্ষা করে বললেন, স্ট্রোক তো মনে হচ্ছে না।

সুরঞ্জনের প্রেসার বরাবর একটু লো-র দিকে। আজ আরও একটু নেমে গেছে রক্তচাপ। পঁচানব্বই বাই ষাট। সুরঞ্জনের জিব পেট পরীক্ষা করে বললেন, স্ট্রোক নয়, গ্যাসের জন্যই মনে হচ্ছে এ রকম হয়েছে। কিন্তু ডানহাতে সাড় নেই কেন বুঝতে পারছি না। যাই হোক, আপাতত হাতে ম্যাসেজ করে সাড়টা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে হবে। তারপর কাল ঘাড়ে একটা এক্স-রে। আর এই প্রেসক্রিপশন—

প্রায় ঘণ্টাখানেক ম্যাসেজ করার পর সুরঞ্জনের হাতে খানিক সাড় ফিরে আসে। সে রাতটা খুব দীর্ঘ রাত। অমন একটা অসহনীয় পরিস্থিতির ভেতর সুরঞ্জনের সেদিন মনে হয়েছিল, সে মৃত্যুর খুব কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল নিশ্চিত। এমন সংকটময় মুহূর্ত তার জীবনে আর কখনও আসেনি।

দিনদুয়েক পর তার ঘাড়ের এক্স-রে থেকে জানা গেল, তার ঘাড়ের ঠিক নীচে মেরুদণ্ডের তৃতীয় ও চতুর্থ হাড়ের সংযোগস্থলে কিছু বৈকল্য উপস্থিত হয়েছে। ডাক্তারি পরিভাষায় স্পন্ডিলিসিস। ঘাড়ের ফোটো দেখার পর তার শরীরের উপর নানারকম বিধিনিষেধ আরোপিত হল। ডাক্তার বললেন, ভোরে উঠে খানিক হাঁটাহাটি করুন। হাঁটার সময় ঘাড় সিধে রাখবেন। পড়ার টেবিলে বসে ঘাড় বেশি হেঁট করে পড়া-লেখা করবেন না।

সুরঞ্জন কয়েকদিন বাড়ির সামনের পথে হাঁটাহাটি করেছিল ভোরে। তার মধ্যে একদিন দেখা হয়ে গেল পরোপকারী মনোজিৎ রায়ের সঙ্গে। তিনিই বললেন, ম্যাকসাহেবের মাঠে চলে আসুন, দেখবেন, ওখানকার বাতাস অনেক ফ্রেশ। বড় করে নিশ্বাস নিলে বেশ তাজা হয়ে উঠবে শরীরটা।

গত মাসদুয়েকের মধ্যে সুরঞ্জনের শরীর আগের চেয়ে খানিকটা সেরে উঠেছে। তবু এখনও বেশ দুর্বল। তৃতীয় রাউন্ড হাঁটতে গিয়েই মনে হচ্ছে, কংক্রিটের বেঞ্চে খানিক জিরিয়ে নিতে পারলে ভাল হত। ততক্ষণে বেঞ্চের উপর থ্রি মাস্কেটিয়ার্স

বসে উত্তেজিত হয়ে কী যেন আলোচনা করছেন। বেঞ্চের কাছে এসে তার একবার মনেও হল, খানিকক্ষণ বসে নেয়, কিন্তু বসা হল না। বোধহয় তার দিকে নজর রেখেছিলেন কর্নেল রায়চৌধুরী। তাকে থামতে দেখে বলে উঠলেন, কী হল, ইয়ং ম্যান, এর মধ্যেই হয়ে গেল! অন্তত পাঁচ রাউন্ডের আগে বসা চলবে না। ক্যারি অন—

সুরঞ্জন লজ্জা পেয়ে আবার হাঁটতে থাকে। মাঠের চারদিকে প্রাতঃভ্রমণকারীদের পায়ের চাপে চাপে যে চলার পথ তৈরি হয়েছে, সেই ট্র্যাক বরাবর হাঁটতে থাকে। সে বুঝতে পারেনি, কর্নেল ওখানে বসে আছেন। বুঝতে পারলে সে দাঁড়াত না। কর্নেলের চোখকে ফাঁকি দেওয়া কঠিন। মাঠের প্রায় সবাইকার উপর কর্নেলের চোখ থাকে। তাঁর নিজের দীর্ঘ ঋজু শরীরটি যেমন স্বাস্থ্যে অটুট, তিনি চান সব মানুষেরই শরীর হয়ে উঠুক সুঠাম, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল। শিশু-কিশোর-যুবা-বৃদ্ধ কাউকেই তাঁর দীর্ঘ নজর এড়িয়ে চলে যেতে দেবেন না। সেই কোন ভোরে মাঠে এসেছেন, হয়তো সবাইকার আগে, মাঠ ছাড়বেনও বোধহয় সবার পরে। এই দীর্ঘক্ষণ তিনি প্রত্যেকের সঙ্গে সুপ্রভাত বিনিময় করবেন, খবরাখবর নেবেন, দরকার হলে উপদেশ, পরামর্শও।

তৃতীয় রাউন্ডের শেষে সুরঞ্জনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল বিদ্যুৎ চ্যাটার্জির। বিদ্যুৎবাবু ব্যাঙ্কে চাকরি করেন, চুটিয়ে ইউনিয়ন করেন অফিসে। প্রায় সুরঞ্জনেরই সমবয়সী। গোলপোস্টের পাশে দাঁড়িয়ে একমনে বৈঠক দিয়ে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ সুরঞ্জনকে দেখে বললেন, পুজোর পর মাঠের সদস্যদের নিয়ে একটা বিজয়া সম্মেলনী করব ভাবছি। আপনার কী মত?

সুরঞ্জন দাঁড়িয়ে পড়ে, বাহ, এ তো চমৎকার প্রস্তাব।

—মনোজিৎদা এলেই ডেটটা ফিক্স করে ফেলব। উনত্রিশে সেপ্টেম্বর দশমী। তারপর যে-কোনও একদিন—

—হ্যাঁ, তবে তিরিশে রবিবার। রবিবারে না করলেই ভাল। রবিবারে অনেকেই মাঠে আসেন না।

—ঠিক বলেছেন। সোমবার বা মঙ্গলবার। আপনাকে কিন্তু কিছু বলতে হবে ওদিন। আপনি তো ফিচার লেখেন। মর্নিং-ওয়াকারদের নিয়ে কিছু একটা মজা করে লিখুন না। সবাই খুব উপভোগ করবে।

সুরঞ্জন হাসল, দেখা যাক। না-হয় একটা কবিতাই লিখে ফেলব আপনাদের নিয়ে।

—বাহ্, তাহলে তো খুবই ভাল হয়। জানেন, মিসেস সিন্‌হা রাজি হয়েছেন উদ্বোধন সংগীত গাইতে। দারুণ রবীন্দ্রসংগীত জানেন উনি—

—তাই নাকি? বাহ্, বেশ তো। আমি রবীন্দ্রসংগীতের দারুণ অনুরাগী।

কথা বলতে বলতে হঠাৎ সেখানে এসে হাজির হল বিশ্বজিৎ আর কাবেরী। দুজনে রোজই এই সময়টাতে মাঠের চারদিকে বারদুয়েক চক্কর দেয়। বিশ্বজিৎ বেশ ভোরে মাঠে আসে। অন্তত সুরঞ্জন আসার ঢের আগে। বিশ্বজিতের চেহারা দেখে মনে মনে তারিফ করে সুরঞ্জন। অন্তত আধঘণ্টা-পঁয়তাল্লিশ মিনিট কঠিন পরিশ্রমে সে তার শরীর ঠিকঠাক করে নেয়। তারপর কিছুক্ষণ রিল্যাক্স। তারপর কিছুক্ষণ প্রেম। কাবেরীকে রোজই একঝলক তাকিয়ে দেখে সুরঞ্জন। বেশ আলগা শ্রী আছে মেয়েটার। শ্যামলা রং, সামনের দাঁত সামান্য একটু উঁচু। তাতে অবশ্য তাকে চমৎকার দেখায়। বিশ্বজিৎ এসে দাঁড়াল বিদ্যুৎ চ্যাটার্জির সামনে, মাঠে নাকি ফাংশন করছেন, বিদ্যুৎদা?

—হ্যাঁ। তোমরা সবাই প্রেজেন্ট থাকবে। যার সঙ্গে দেখা হবে তাকেই খবরটা দিয়ো। পয়লা কিংবা দোসরা অক্টোবর। ঠিক সকাল সাড়ে ছটা। সবার রাউন্ড শেষ হলে—

বিশ্বজিৎ হঠাৎ মুখটা হাসি-হাসি করে বলে উঠল, তা ফাংশনে আমাদের একটু চান্স দেবেন না, বিদ্যুৎদা।

বিদ্যুৎ চ্যাটার্জি হেসে বললেন, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। আমাদের মনোজিৎদার কাছে নাম দিতে হবে। উনি এক্ষুনি এসে পড়বেন। কেন যে এত দেরি করছেন আজ! সাড়ে ছটা বাজতে চলল। অন্যদিন তো ছটার মধ্যে এসে যান। তা, তুমি কি গান করবে, বিশ্বজিৎ, না আবৃত্তি?

বিশ্বজিৎ লাজুক-লাজুক মুখ করে বলল, আমি না, কাবেরী। ও দারুণ গান জানে—

—তা বেশ তো।

কাবেরী বিস্মিত হয়ে বলে উঠল, এ মা, আমি কেন! আমি গান জানিই না। ও আপনার সঙ্গে ঠাট্টা করছে। বলে কৃত্রিম ভর্ৎসনার চোখে তাকাল বিশ্বজিতের দিকে।

বিদ্যুৎ চ্যাটার্জি বললেন, মেয়েরা প্রায় সবাই একটু-আধটু গান জানে। অন্তত বাথরুম সং তো জানেই।

কাবেরী সজোরে মাথা ঝাঁকাল, এ মা, না না, একদম জানি না। একলাইনও না।

—ঠিক আছে, তোমাকে গাইতে হবে না। অন্তত সভাপতি, প্রধান অতিথিকে বরণ করতে পারবে তো? তা হলেই হবে।

মনোজিৎ রায় ততক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছেন তাদের পিছনে, বললেন, কী ব্যাপার, কাবেরী এত মাথা ঝাঁকাচ্ছে কেন। বিশ্বজিৎ কি ওকে দিনে-দুপুরে ইলোপ করে নিয়ে

যেতে চাইছে?

বিদ্যুৎ চ্যাটার্জি বললেন, এই যে, মনোজিৎদা, আপনার জন্যে বিজয়া সম্মেলনীর ডেট ঠিক করতে পারছি না। সুরঞ্জন মুখার্জি পয়লা অথবা দোসরা করতে বলছেন।

—তাহলে পয়লাই হোক। শুভস্য শীঘ্রম।

—আজ আপনার এত দেরি হল যে, মনোজিৎদা। সাড়ে ছটা বাজতে যায়।

—আর বোলো না। আমার যে কত ঝকমারি। কাল বোস-মাসিমার বাড়ি গিয়ে দেখি, কন্ডিশন ভীষণ সিরিয়াস। প্রায় এখন-তখন অবস্থা। এক্ষুনি অক্সিজেন না হলেই নয়।

সুরঞ্জন অবাক হয়ে বলল, বোস-মাসিমা আবার কে?

—ওই যে, বেশ মোটাসোটা এক বয়স্কা মহিলা রোজ মাঠে আসতেন। কারও সঙ্গে অবশ্য কথাটথা বলতেন না। ঠিক নিয়মিত আসতেন তাও নয়। তবু আমাদের মাঠের সদস্যা তো বটে।

সুরঞ্জন ঠিক মনে করতে পারল না কোনজন। বয়স্কা মহিলা অনেকেই আসেন হাঁটতে। যে কয়েকজন খুব নিয়মিত, তাদের কারোও কারোও মুখ মনে আছে তার। বোস-মাসিমা রেগুলার আসেন না বলেই তাঁকে তার চেনার কথা নয়। তা ছাড়া সে তো মাত্র মাসদুয়েক আসছে ম্যাকসাহেবের মাঠে।

—কী হয়েছে বোস-মাসিমার?

—অ্যাজ্‌মার পেসেন্ট। হঠাৎ গত দিনপনেরো খুব বাড়াবাড়ি হয়েছে। একেবারে বেড্‌-রিড্‌ন্‌। অথচ ওঁকে দেখবার কেউ নেই।

—কেউ নেই?

—না। ছেলেপুলে হয়নি তো। মিঃ বোসও মারা গেছেন প্রায় বছরদশেক। খুব পণ্ডিত মানুষ ছিলেন মিঃ বোস। রুরকি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রফেসর ছিলেন। বছরপনেরো আগে রিটায়ার করে দত্তর মাঠের কাছে বাড়ি করেছিলেন। লাখখানেক টাকা আছে, অথচ তাঁকে কেউ দেখার নেই।

—অদ্ভুত তো। আত্মীয়স্বজন কেউ নেই?

—আছে। তাদের খবর দিয়েছিলাম ফোনে। মিঃ বোসের এক ভাইপো আছেন, তিনি ডাক্তার। রোরিং পশার। ফোন তুলে বললেন, অ্যায়াম টু-উ-উ বিজি। যাওয়ার সময় নেই।

—আশ্চর্য! এ রকম বলতে পারলেন ভদ্রলোক?

—আরও আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, মিঃ বোস মারা যাওয়ার আগে দলিল করে গেছেন, মিসেস বোস যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন তিনি এই বাড়ির মালিক,

মিসেস বোসের অবর্তমানে সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবে ওই ডাক্তার-ভাইপো।

বিশ্বজিৎ অবাক হয়ে বলল, আর সেই ডাক্তার-ভাইপো কিনা বললেন তাঁর আসার সময় নেই?

মনোজিৎ রায় হাসলেন, আমি বোস-মাসিমাকে দেখতে গিয়েই বিপদে পড়ে গেছি। একজন মৃত্যুপথযাত্রী বিধবা মহিলা, তাঁকে ওভাবে ফেলে রাখিই বা কী করে!

—আপনি রোজ যাচ্ছেন?

—যাচ্ছি তো দু-বেলাই। বাড়িতে অক্সিজেনের ব্যবস্থা করেছি। দুটো নার্সের ব্যবস্থা করেছি। তারা পালা করে ডে-নাইটে থাকছেন।

সুরঞ্জন বলল, সত্যি, আপনি পারেনও বেশ।

মনোজিৎ বললেন, আপনিও আসুন না আজ বিকেলে। একা আর পেরে উঠছি না। দত্তর মাঠের পশ্চিমদিকে যে লালরঙের দোতলা বাড়িটা আছে, তার ঠিক পিছনেই—

সুরঞ্জন এর পর আর না করতে পারল না, বলল, ঠিক আছে, যাব। সন্ধে সাড়ে সাতটা নাগাদ।

তাদের কথার মাঝখানে সেখানে এসে দাঁড়ালেন কর্নেল রায়চৌধুরী। কর্নেলের হাতে আজ একটা নতুন ছড়ি। বোধহয় রূপো দিয়ে বাঁধানো। কিন্তু চমক সেজন্য নয়। চমক হল তাঁর পাশে শার্ট-প্যান্ট পরনে যে কিশোরীটি দাঁড়িয়ে, সে-ই। কর্নেল বললেন, মনোজিৎ, এ হল তিতির। আমার ছোটগিন্নি—

তিতির চোদ্দো-পনেরো বছরের এক সুদর্শনা কিশোরী। তার চাউনি, চুলের কারুকাজ বলে দিচ্ছে সে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়া এক তুখোড় ছাত্রী।

কর্নেলের শেষ কথাটি শুনে সে আরক্ত হয়ে বলল, আহ্, দাদু। তুমি একটা যা-তা—

কর্নেল অবশ্য তিতিরের পরিচয়পর্ব তখনও শেষ করেননি। বললেন, ও কিন্তু এবার ওদের স্কুলকে রিপ্রেজেন্ট করেছিল স্টেট-লেভেল কুইজ-কনটেস্টে। তাতে ওদের গ্রুপ ফার্স্ট হয়েছে। সারা মধ্যপ্রদেশের স্কুল পার্টিসিপেট করেছিল। যে মেডেলটা ও পেয়েছে, তাতে লেখা আছে, 'এম পি কুইজ কুইন'—

তিতির আরও আরক্ত হয়ে ওর দাদুর পিঠে গুমগুম করে কিল মারতে লাগল, আহ্, দাদু। তুমি সত্যিই ইন্‌করিজিব্‌ল্। নিজের নাতনির ঢাক এভাবে পেটাতে নেই—

সুরঞ্জন চোখ কপালে তুলল, তাহলে শুধু ছোটগিন্নিই নয়, রানিও বলা যায়।

কর্নেল এবার বিশ্বজিতের দিকে তাকালেন, তোমার এক সাগরেদ, ওই যে কী

যেন নাম, হুঁ, মনে পড়েছে, সৌপ্তিক, যে সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়ে, সেও তো কুইজ-মাস্টার, তাই না? তার সঙ্গে তিতিরের একটা কম্‌পিটিশন লাগিয়ে দিলে হয়, কী বল—

মনোজিৎ রায় সঙ্গে সঙ্গে সায় দিলেন, তা বেশ তো? ওয়েস্টবেঙ্গল ভার্সাস মধ্যপ্রদেশ। দেখা যাক্, কে জেতে—

তিতির সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় ঝাঁকাতে লাগল, না, না, সেন্ট জেভিয়ার্সের ছেলেদের সঙ্গে কি পারা যায়? উঁহু, আমি এ প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে রিজেক্ট করছি।

সুরঞ্জন হো হো করে হেসে উঠল, যাহ্ বাব্বা, লড়াইয়ে নামার আগেই হেরে যাচ্ছ! ওটা কোনও কাজের কথা নয়। লেট আস অ্যারেঞ্জ—

কর্নেল আবারও বললেন, তিতির ব্যাড্‌মিন্টনেও চাম্পিয়ান হয়েছে—

তিতির সঙ্গে সঙ্গে কর্নেলকে টানতে টানতে নিয়ে চলে গেল অন্যদিকে। তার মুখ দেখে বোঝা গেল, সে খুশিও হয়েছে, লজ্জাও পাচ্ছে খুব। এই বয়সের কিশোরীরা বোধহয় এ রকমই হয়।

মনোজিৎ রায় মুচকি হাসতে হাসতে বললেন, যাক, কর্নেলের তবু একজন কথা বলার সঙ্গী হয়েছে বাড়িতে। অত বড় বাড়িতে একা থাকেন—

সুরঞ্জন বলল, কিন্তু এই বয়সে কী লাইভ্‌লি আছেন বলুন। আটাত্তর পার হয়েছেন, অথচ এখনও চলায়-ফেরায়, কথায়-হাসিতে যেন আঠাশ বছরের তরুণ। ওঁকে দেখলে আমার ঈর্ষা হয়। আমি তো সাঁইত্রিশ বছরেই সাতাশির মতো বুড়ো হয়ে গেছি—

মনোজিৎ রায় বললেন, ছোটবেলা থেকে গ্রন্থকীট হলে এ রকমই হয়। এইজন্যেই তো আমি ইয়ং ছেলেমেয়েদের সবসময় উৎসাহ দিই, সময় থাকতে স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হও। রোজ কুড়ি মিনিট কী আধঘণ্টা এক্সারসাইজ করবে। আমাদের পাড়ার ক্লাবে প্রচুর ইনস্টুমেন্ট কিনে দিয়েছি ছেলেদের। রোজ বিকেলে দুঘণ্টা খোলা থাকে আমাদের জিমন্যাসিয়াম। ভাবছি, ম্যাকডোনাল্ডসাহেবের এত বড় পুকুরটা পড়ে আছে। এখানে একটা সুইমিং ক্লাবও খুলতে পারি আমরা। সাঁতারে শরীর খুব ফিট থাকে।

বিশ্বজিৎ আর কাবেরী ততক্ষণে হাঁটা দিয়েছে ফ্লাওয়ার-গার্ডেনের দিকে। ওখানে ঠায় বসে আছে চামেলি। চামেলিকে নিয়ে ওরা দুজন হাঁটতে হাঁটতে চলে যাবে জেম্‌স্ লং সরণির দিকে। কাবেরীদের বাড়ি ওদিকটাতেই।

সেদিকে তাকাতে তাকাতে সুরঞ্জন হঠাৎ দেখতে পেল, ডায়মণ্ডহারবার রোডের ওপারে মেয়েদের অর্ফানেজ থেকে বেরিয়ে এদিকে আসছেন একজন মেমসাহেব।

সামান্য স্থূলকায়া, ছোট্টখাটো চেহারা, পরনে সাদা স্কার্টব্লাউজ। তাঁর দু-পাশে অর্ফানেজের দুটি মেয়ে। দুজনে তাঁর দু-হাত ধরে আনছে এদিকে। দুটি মেয়েই মোটামুটি সুরঞ্জনদের পরিচিত। একজন কমলা, অন্যজন চাঁপা। দুজনে অর্ফানেজে আছে প্রায় শৈশব থেকে। দুজনেই কুড়ি পেরিয়েছে। ফাদার উইলিয়াম ভারী ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, এদের দুজনকে নিয়ে কী করা যায় তাই ভেবে। বাকি মেয়েরা নয়-দশ থেকে তেরো-চোদ্দোর ঘরে। তাদের নিয়ে আপাতত তেমন ভাবনা নেই। ভাল পাত্র পেলে চাঁপা আর কমলাকে বিয়ে দেবেন এমন ভাবছেন ফাদার। সুরঞ্জন বলল, মেমসাহেব কে, মনোজিৎবাবু?

মনেজিৎবাবু বললেন, উনি ক্যাথারিন। ওঁকে আপনি কোনওদিন দেখেননি?

—না তো।

—ক্যাথারিন হলেন ম্যাকডোনাল্ড সাহেবের ছোটবোন। ম্যাক্‌ডোনাল্ডসাহেব যখন অস্ট্রেলিয়া ছেড়ে কলকাতায় পাড়ি দেন, তখন ক্যাথারিন খুব ছোট ছিল। বড় হয়ে দাদার খোঁজে বেরিয়ে এসে পৌঁছেছিলেন কলকাতায়। ভেবেছিলেন, দাদাকে বুঝিয়ে-টুঝিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন দেশে। কিন্তু ম্যাকডোনাল্ড তাঁর সংকল্প থেকে নড়েননি একবিন্দু। ততদিনে এখানে জমিজমা কিনেছেন। ছোট্ট একটা টালির বাংলোও বানিয়ে ফেলেছেন এই জায়গাতে। অনাথআশ্রমদুটিও শুরু করে দিয়েছেন। ছোটবোনকে বলেছিলেন, এখন আর ফিরতে পারেন না। শিশুদের সেবায় কাটিয়ে দিতে চান বাকি জীবন। দাদার কথায় খুব শক পেয়েছিলেন ক্যাথারিন। বাড়িতে বলে এসেছিলেন, দাদাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি দেশে ফিরবেনই। না ফেরাতে পারলে তিনিও আর কখনও বাড়ি ফিরবেন না। শেষ কথাটা হয়তো তখন বলে ফেলেছিলেন ঝোঁকের মাথায়, জেদের বশে। কিন্তু এখানে আসার পর দাদার সংকল্পের কথা শুনে, এই পরিবেশ, অনাথ আশ্রম, বাংলো, মাঠ, ফুলের বাগান, পুকুর সব দেখে ক্যাথারিনও ঠিক করেছিলেন, তিনিও আর দেশে ফিরবেন না, দাদার কাজে সাহায্য করবেন। ব্যস্, তারপর থেকে তিনিও দাদার মতো সারাজীবন বিয়ে না করে নান্ হয়ে কাটিয়ে দিলেন এখানে। দাদা মারা গেছেন কতকাল হল। ক্যাথারিন রয়ে গেছেন, নিজে এখন ভাল করে হাঁটাচলাও করতে পারেন না, তবু রোজ একটু বেলা হলে চলে আসেন দাদার সমাধির কাছে। চাঁপা আর কমলা বাগান থেকে ফুল তুলে নিয়ে এলে সেই ফুলের রাশ সমাধির উপর সযত্নে সাজান। বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকেন সমাধির সামনে। তারপর আবার চাঁপাদের হাত ধরে ফিরে যান নিজের ছোট্ট কুটিরে। মেয়েদের অনাথ আশ্রমের পাশেই ওঁর ছোট্ট ঘর। একদিন রাস্তার ওদিকে গিয়ে দেখে আসবেন।

মনোজিৎ রায়ের দীর্ঘ বর্ণনা খুব মন দিয়ে শুনছিল সুরঞ্জন। শুনতে শুনতে মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছিল। তার বুকের গোড়ায় একটা চিনচিন ব্যথাও করছিল যেন। এক কিশোরীর প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হয়ে দেশ ছেড়ে চলে এসেছিল এক অভিমানী তরুণ। তারপর প্রেম নয়, সেবাই হয়ে উঠল তাঁর জীবনদর্শনের মূলসূত্র। ম্যাকডোনাল্ড সাহেবের তবু একটা কারণ ছিল এদেশে আসার। কিন্তু ক্যাথারিন যেরকম নিঃস্বার্থভাবে কাটিয়ে দিলেন তাঁর জীবনটা, তা সত্যিই অদ্ভুত।

ততক্ষণে ক্যাথারিন তাঁর অশক্ত শরীরে দুই তরুণীর কাঁধে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে এসে পৌঁছেছেন কংক্রিটের বেঞ্চের কাছে। খানিক বিশ্রাম নেওয়ার জন্য বসলেন একটা বেঞ্চের উপর। মাঠ তখন ফাঁকা হয়ে গেছে। রোদ্দুর ছড়িয়ে পড়েছে সারা মাঠে। প্রাতঃভ্রমণকারীরা একে একে ফিরে গিয়েছেন যার যার ডেরায়।

ক্যাথারিনের মুখের দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়েছিল সুরঞ্জন। বোধহয় সত্তর পার হয়েছেন লাল-টকটকে মুখের এই বৃদ্ধা। তবু কী সুন্দরী মনে হচ্ছে তাঁকে। সাদা ধবধবে স্কার্ট-ব্লাউজে মানিয়েওছে কী চমৎকার। তাঁকে বেঞ্চের উপর বসিয়ে রেখে চাঁপা আর কমলা গিয়েছিল ফুল তুলতে। খুব দ্রুত তুলে নিয়ে এল কয়েকটি গোলাপ। ক্যাথারিনের মুখের মতোই দেখতে লাল-টকটকে গোলাপগুলো।

এত বেলায় কখনও ম্যাকসাহেবের মাঠে থাকেনি সুরঞ্জন। তাই এই সুন্দর দৃশ্যটাও কখনও দেখতে পায়নি। হঠাৎ ঘড়ির দিকে চোখ পড়তে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে। সাড়ে সাতটা বাজে। নিশ্চয় বিশাখা এতক্ষণে ভাবছে, মর্নিং-ওয়াক করতে গিয়ে মাঠে ঘুমিয়ে পড়ল নাকি সুরঞ্জন!

মনোজিৎ রায়কে ব্যস্ত হয়ে বলল, চলুন, চলুন, মনোজিৎবাবু। আজ ভীষণ লেট হয়ে গেল—

*

পয়লা সেপ্টেম্বর ঠিক সকাল সাড়ে ছ'টায় ম্যাকসাহেবের মাঠে বিজয়া-সম্মেলনী। ভোরের শরীরচর্চা সেরে সবাই গুটিগুটি গিয়ে হাজির হয়েছেন মাঠের ওইদিকে, পরপর তিনটে রেন-ট্রি গাছ যেখানে মস্ত ছায়া ফেলে নাতিশীতোষ্ণ করে রেখেছে আবহাওয়া।

মিঃ গুহমজুমদার এ-মাঠের একজন বর্ষীয়ান সদস্য। তিনিই পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন আজ। তাঁর এ-পাশে ও-পাশে ভিড় করে আছেন আরও কয়েকজন বর্ষীয়ান মানুষ। রিটায়ার্ড পুলিশ-অফিসার মিঃ বিষ্ণু তাঁর ভরাট, গম্ভীর কণ্ঠস্বরে হাঁকডাক করছিলেন, কী হল, এত দেরি হচ্ছে কেন সব। সবাই চলে আসুন—

মিঃ কাঞ্জিলাল সস্ত্রীক আগেই উপস্থিত। এর মধ্যে বিজয়ার নমস্কার জানানো হয়ে গেছে সবাইকে। একটু দূরেই রায়সাহেব কথা বলছিলেন মিঃ ঘোষের সঙ্গে। তাঁর আশেপাশে মিঃ সরকার, মিঃ ব্যানার্জি আর মিঃ বোস। এঁরা বারো চোদ্দজন মিলে সন্ধের পর আবার সমবেত হন তাসের এক জমজমাটি আসরে। সেই আসরের কোনও নামকরণ না হলেও বলা যায় 'অ্যারাউন্ড সেভেন্টি কার্ডস্ ক্লাব'। তাঁরা সেখানে নিয়মিত যান, তাঁরা অনেকেই সত্তর পেরিয়েছেন, কেউ কেউ আবার সত্তর ছুঁতে চলেছেন নিঃশব্দে। দল বেঁধে পিকনিকেও যান কয়েকমাস পর পর। ছ'পিস আটপিস ইলিশও নাকি উড়িয়ে দিতে পারেন এই বয়সে! তাঁরা সবাই দূরে গল্প করছেন দেখে কাঞ্জিলালবাবু তাঁদের ডেকে আনলেন, নিন, এবার আরম্ভ করে দিন—

তবু আরম্ভ হতে কেন যেন দেরি করছেন গুহমজুমদার। আসলে মনোজিৎ রায় তখনও এসে পৌঁছননি বলেই ইতস্তত করছিলেন একটু। মনোজিৎই তো চাঁদাপত্তর তুলেছেন যাতে অনুষ্ঠানের শেষে সবাইকে এক-একটা করে মিষ্টির প্যাকেট ধরিয়ে দেওয়া যায়।

একটু পরেই অবশ্য ছুটতে ছুটতে এসে পৌঁছলেন মনোজিৎ রায়। সামনেই কালীদাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললেন, স্যরি, আমার একটু দেরি হয়ে গেল।

কর্নেল তাঁর গলায় সামান্য রসিকতা মিলিয়ে বললেন, আজ একটু বেশিই ঘুমিয়ে ফেলেছ মনে হচ্ছে!

এ-মাঠের 'ফাস্টেস্ট ওয়াকার' নামে খ্যাত লাচ্চুদা বললেন, সত্যিই অবাক করলেন, মনোজিৎবাবু।

মনোজিৎ রায় হাতের ঘড়ি দেখলেন, ছ'টা চল্লিশ। তাঁর মোটর-বাইকটিও আজ সচল নেই যে, এই দশমিনিট লেট মেক-আপ করবেন। হেসে বললেন, দেরির জন্য সবার কাছে ক্ষমা চাইছি, রাত তিনটেয় শুয়েছিলাম কাল। ঘড়িতে অবশ্য অ্যালার্ম দিয়েছিলাম সাড়ে পাঁচটায় উঠব বলে। কিন্তু কখন অ্যালার্ম বেজেছে বালিশের পাশে, কখন ঘুমের ঘোরে সে অ্যালার্ম নিজেই বন্ধ করেছি, তার কিছুই মনে নেই। যখন ঘুম ভাঙল, ছ'টা বেজে দশ। তারপর ড্রেস চেঞ্জ করে হাঁপাতে হাঁপাতে এই এতক্ষণে আসতে পারলাম—

অধ্যাপক খাসনবীশ বললেন, হুঁ, চোখ্ এখনো লাল রয়েছে দেখছি, তা এই মাঝবয়সে রাত্রি জাগরণ কেন, বৎস?

—সে কথা পরেই না হয়ে শুনলেন। আগে আমাদের অনুষ্ঠান শুরু হোক।

পুজোর চারদিন অনেকেই মাঠে আসার সময় পাননি। কেউ-কেউ টুকটাক আউটিং করে এসেছেন কাছেপিঠে। আবার কেউ কলকাতাতেই কাটিয়েছেন পুজো।

অনেকেই স্রেফ ঘরে বসে। অনেকে মণ্ডপের কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। কেউ অনেকরাত পর্যন্ত ঠাকুর দেখে বেড়িয়েছেন বলে ভোরে ঘুম ভেঙে উঠতে পারেননি। ফলে ভ্রমণকারীদের সংখ্যা বেশ কমই ছিল এ ক'দিন। আজ সবাই সমবেত হতেই পারস্পরিক শুভ-বিজয়া পর্ব শেষ করছিলেন একে-একে। বিদ্যুৎ চ্যাটার্জি এসেছেন বেশ ভোরেই। তাঁর হাতে আজকের বিজয়া-সম্মেলনীর প্রোগ্রাম লেখা। সবচেয়ে মুশকিল হয়েছে উদ্বোধন-সঙ্গীত নিয়ে। প্রোগ্রামে মিসেস সিন্‌হার নাম লেখা আছে, কিন্তু মিসেস সিন্‌হা গত তিন-চারদিন ধরেই মাঠে আসছেন না, আজও আসেননি। হঠাৎ নাকি রাঁচী না রাজগীর কোথায় বেড়াতে চলে গেছেন সপ্তমীর দিন।

খবরটা পরিবেশন করে বিদ্যুৎ চ্যাটার্জি যখন কাঁচুমাচু মুখে তাকিয়ে আছেন মিঃ গুহমজুমদারের দিকে, তখন পরিত্রাতা হিসেবে এগিয়ে এলেন কর্নেল। স্মিতমুখে বললেন, ডোন্ট ওরি, মাই বয়েজ। বরং তোমাদের কাছে একটা সারপ্রাইজ দেব। ম্যাকডোনাল্ডসাহেবের স্কুলের নতুন টিচার বন্দনা রায় আজ আমাদের অনুষ্ঠানে এসেছে। খুব ভালো গান জানে। তুমি ওর নামটাই উদ্বোধন সঙ্গীত গাইবার জন্য অ্যানাউন্স করে দাও।

বিজয়া-সম্মেলনীর অনুষ্ঠানে প্রায় জনা পঞ্চাশ প্রাতঃভ্রমণকারীর মাঝখানে একটুখানি ফাঁকা জায়গা। সেটাই আজকের মঞ্চ। ভিড়ের মধ্যে সামনের সারিতেই বসেছেন কর্নেল রায়চৌধুরী। তাঁর ঠিক পাশেই অধ্যাপক খাসনবীশ। পাশাপাশি বসে আছেন নিশীথ দাশগুপ্ত, ক্ষৌণীশ হালদার আর অনিমেষ ঘোষদস্তিদার। ওপাশে গুডমর্নিং বোস। বিশ্বজিতের সঙ্গে কাবেরী আর চামেলি। তাদের পাশে অনিরুদ্ধ শাসমল। বেশ কয়েকটি নতুন মুখও দেখা যাচ্ছে। সুরঞ্জন মুখার্জি আর দেবাশিস দত্ত আছে একটু পেছনে। তাদের আগের সারিতে জ্যোতিপ্রকাশ, নাথদা কালীদা, লাল্টুদা অমৃতাভ, সুকান্ত দাস। অনাথ-আশ্রম থেকেও এসেছে অনেক ছেলেমেয়ে। ডালিমের সঙ্গে এসেছে তার দুই বন্ধু, টৌটন আর রতন। চাঁপা-কমলার সঙ্গে রমা আর যোগমায়া। তাদেরই পাশে বসে আছে একটি নতুন মুখ—বন্দনা রায়। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ রং, কিন্তু মুখখানা এতই মিষ্টি যে, দেখলেই চট করে নজরে পড়ে যায়। তার পাশে শ্যামলী, আরতি ও আরও কয়েকজন মহিলা, দু-তিনজন বৃদ্ধাও আছেন। এঁরা ছাড়া এসেছেন কয়েকজন প্রাতঃভ্রমণকারী যাঁরা সাধারণত মেলামেশা করেন না কারো সঙ্গে, মাঠে এসে ভ্রমণান্তে চটপট বাড়ি ফিরে যান, তাঁরাও আজ কৌতূহলী হয়ে ভিড় করেছেন অনুষ্ঠানে।

বন্দনা রায় এতক্ষণ সামান্য আড়ষ্ট হয়ে বসে ছিল অন্যদের পাশে। আড়ষ্টতা স্বাভাবিক, কারণ কাউকেই সে ভালো করে চেনে না। তাকে ধরে নিয়ে এসেছেন

তাঁদেরই স্কুলের আর এক সহকর্মী রমলা সান্যাল। আসব-না আসব-না করেও শেষপর্যন্ত কৌতূহলী হয়ে এসে পড়েছে বন্দনা। হঠাৎ তার নাম ঘোষণা হতে ভীষণ হকচকিয়ে গেল সে। কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু কর্নেল প্রায় অভিভাবকের মতো যখন বললেন, 'যাও বন্দনা', তখন বন্দনা এগিয়ে গিয়ে বসল সামনে। তার দুই চোখে তখন একটা অদ্ভুত লজ্জায়। বোধহয় এত জন অচেনা মানুষের সামনে হঠাৎ তাকে গাইতে বলায় সে খুবই অস্বস্তিতে। তবু সমস্ত জড়তা কাটিয়ে সে গাইতে শুরু করে দিল, জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রন/ধন্য হল, ধন্য হল মানবজীবন।

বন্দনা রায়ের গানের গলা যে এত সুন্দর তা একটু আগেও অনুমান করতে পারেনি কেউ। একটা একটা করে সুন্দর মুহূর্ত কীভাবে যে পার হয়ে গেল তা কেউ বুঝতে পারল না। এক অব্যক্ত ভালোলাগা ছড়িয়ে যখন সে শেষ পঙ্‌ক্তিতে পৌঁছল 'জয়ধ্বনি শুনিয়ে যাব এ মোর নিবেদন', তখন হাততালিতে ফেটে পড়ল সবাই। কর্নেল বললেন, 'বন্দনা আজ আমাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার।' বন্দনা রায় তখন আরও নতমুখ হয়ে নিজেকে লুকোতে চাইছে। কোনওক্রমে উঠে গিয়ে বসে পড়ল নিজের জায়গায়।

পরমুহূর্তে গুহ মজুমদার বললেন, এই বিজয়া-সম্মেলনী উপলক্ষ্যে আমরা আজ দু' চার কথা শুনতে চাই আমাদের আসরের আরো এক নতুন অতিথি তথাগত গুহর কাছ থেকে। তথাগত ইজ ভেরি ইয়াং, কিন্তু সে ইতিমধ্যেই কলকাতা শহরের অন্যতম বিজনেস ম্যাগনেট। আশ্চর্যের কথা এই যে, সে ব্যবসায়ী হওয়া সত্ত্বেও একজন সাহিত্যরসিক। কলকাতার একটি ফিল্‌ম্‌-সোসাইটির সঙ্গেও জড়িত।

ভিড়ের মধ্যে অনধিক চল্লিশ বছরের এক সুদর্শন যুবক বসে ছিলেন অন্যমনস্ক হয়ে। হঠাৎ পরিচালক তাঁর নাম ঘোষণা করতে তিনি বেশ হতচকিত। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আজকের এই আসরে এসে আমি রীতিমত বিস্মিত, অভিভূত। প্রাতঃভ্রমণকারীদের নিয়ে যে এমন চমৎকার অনুষ্ঠান করা যায় তা এর আগে আমার ধারণায় ছিল না। মাত্র কয়েকদিন হল এই ম্যাকসাহেবের মাঠে আমি আসা-যাওয়া শুরু করেছি। কয়েকদিনেই মনে হচ্ছে, আমি এক নতুন মানুষ। নতুন-নতুন মানুষের সঙ্গে আলাপ হচ্ছে। বন্ধুর সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। আরও অবাক হয়েছি কর্নেল রায়চৌধুরীর সংস্পর্শে এসে। উনি এই মাঠে এক যৌবনের প্রতীক।

কর্নেল বাধা দিয়ে বললেন, ব্যস, আমার প্রসঙ্গ ওইটুকুই থাক।

তথাগত গুহর পরেই ডুয়েট রবীন্দ্রসংগীত গাইলেন ভট্টাচার্য-দম্পতি। অসিত ভট্টাচার্য মধ্যবয়সে পৌঁছনোর আগেই শরীরের মধ্যপ্রদেশ এতটাই স্ফীত করে ফেলেছেন যে, তাঁর ভুড়ির স্ট্যাটিসটিক্‌স্‌ নিয়ে প্রায়শ জোক করে থাকেন তাঁর

বন্ধুবান্ধব। তাঁর মিসেস কিন্তু ভারী ছিপছিপে, সুন্দরী। দুজনেই ভোরে উঠে মাঠে চলে আসেন স্কুটারে চড়ে। ডুয়েট গাওয়ার রকম দেখেই বোঝা গেল, এই বয়সেও দুজনে এখনও দুজনের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন।

ভাল বক্তৃতা দিলেন ষাট-উত্তীর্ণ এক যুবক সুকান্ত দাস। পেশায় ইঞ্জিনীয়ার, নেশায় রোটারিয়ান। সারাক্ষণ নিজের ব্যবসা বাড়িয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোন গাঁয়ে হোমিওপ্যাথি ক্লিনিক খুলবেন, কোথায় টিউবওয়েল পুতবেন, কোথায় পোলিও-ক্যাম্প বসাবেন, কোথায় আই-অপারেশন ক্যাম্প, তারই পুঙ্খানুপুঙ্খ ছক কষে চলেছেন কমপিউটারের মতো মাথাটার ভেতর। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, এতদিন চাকরি আর ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। বাইরের পৃথিবীটার দিকে ভাল করে তাকানোর সময় পাইনি। ম্যাকসাহেবের মাঠে এসে আমাদের মনের একটা জানলা যেন খুলে গেছে হঠাৎ। রবীন্দ্রনাথের সেই লাইনটি মনে পড়ছে, হঠাৎ আলার ঝলকানি লেগে ঝলমল করে চিত্ত।

অনিরুদ্ধ শাসমলের নাম ঘোষণা হতেই কিছুক্ষণ একরাশ বিষণ্ণ স্তব্ধতা। অনিরুদ্ধ যে ভীষণ অসুস্থ তা প্রায় সবাই জানেন। অনিরুদ্ধ কিন্তু মুখে নির্মল হাসি উপছে দিয়ে বলল, মাত্র কয়েকবছর আগেও জানতাম না, ভোরবেলাকার রূপ এত শান্ত, সুন্দর, সৌম্য। ভোরের এই মুহূর্তগুলো উপভোগ করতে করতে মনে হয়, জীবনটা কত সুন্দর, বেঁচে থাকাটা কী আরামের। শুধু প্রকৃতির আলো-হাওয়া থেকেই তো মানুষ সংগ্রহ করে নিতে পারে তার বেঁচে থাকার অনেক রসদ।

অতঃপর সুরঞ্জন মুখার্জির পালা। গুহমজুমদার তার পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে বললেন, এবার আপনাদের সামনে স্বরচিত কবিতা পড়তে আসছেন একালের একজন আধুনিক কবি।

সুরঞ্জনের কবিতাটির নাম 'সুপ্রভাত'। সে গম্ভীর গলায় পজ্ দিয়ে পড়তে লাগল:

ভোর না হতেই ম্যাকসাহেবের মাঠে আসি রোজ বেড়াতে
এখানে বাতাস ভিটামিন ভরা, এখানে সবুজ উৎসাহ,
ভোরবেলা জুড়ে ফিসফিস করে অতিবিশুদ্ধ হাওয়া
সবুজ ঘাসের নরম আবেগে হয়ে উঠি পরিশুদ্ধ—

একই বৃত্তের চারপাশে ঘুরি, কেউ চেনা, কেউ চেনা নয়,
'গুড মর্নিং' 'সুপ্রভাতে'র ছড়াছড়ি শুধু চারপাশে,
ঘুরতে ঘুরতে যেন প্রত্যেকে চেনাজানা এক পরিবার,
কুশল জিজ্ঞাসায় জেনে নিই সব একে অপরের খুঁটিনাটি।

এখানে রেনট্রি ছাতা হয়ে থাকে প্রাতঃভ্রমণকারীদের
নাগকেশরের হাওয়ায় ভরবে জং-পড়া খুঁতো ফুসফুস
চারপাঁচ পাক ঘুরে যান শুধু, একটু ফ্রিহ্যান্ড, দৌড়ুনো,
আধ-ঘণ্টায় আয়ু বেড়ে যাবে নিশ্চিত আট দশদিন—

একদিন যদি মিস্ হয়ে যায় এখানে আসতে তাহলে
পরদিন ঠিক সব্বার কাছে দিতে হবে শুধু কৈফিয়ৎ।
'শরীর খারাপ? সুগার বাড়ল। না হাই প্রেসার, কোনটা?
তাও নয়, শুধু আলস্যে কামাই, উঁহুহু মোটেই ভাল নয় সেটা।'

কয়েক রাউন্ড শেষ হলে ফের বসি কংক্রিট বেঞ্চিতে
কখনও ক্রিকেট, রাজনীতি আর বাজারদরের আলোচনা,
কখনও ডাক্তার, ওষুধবিষুধ, অধুনা শেয়ারবাজারও,
তারপর উঠি, 'আজ চলি ভাই, কাল ভোরে ফের দেখা হবে।'

সুরঞ্জনের পর কোরাসে রবীন্দ্রসংগীত গাইলেন শান্তা, দেবযানী শিপ্রা, জয়শ্রী, স্বাতী, মীনা, সোমা, দেবিকা, আরও কয়েকজন যুবতী। 'আলো আমার আলো ওগো' ভারী ক্ল্যাপ পেল সবার কাছ থেকে। কর্নেল বলে উঠলেন, সুন্দর।

এরপর শ্রোতাদের কাছে আরও এক সারপ্রাইজ দিলেন কর্নেল। কয়েকজন প্রৌঢ়া-বৃদ্ধা বসেছিলেন সামনের সারিতে। তাদের ভেতর থেকে ডাকলেন তরুলতা সেনকে। বললেন, আমরা পুরনোদিনের এক সুগায়িকার কাছ থেকে একটি নজরুলগীতি শুনতে চাই।

তিয়াত্তর বছরের তরুলতা সেন বিব্রত হয়ে বললেন, কতকাল গান করিনি। এখন কি আর গলায় সুর বেরুবে?

বললেন বটে, কিন্তু তাঁর ঈষৎ ভাঙা কণ্ঠস্বরে বহুবার শোনা গান 'বাগিচায় বুলবুলি তুই—' এমন দুর্দান্ত সুরেলা গলায় গাইলেন যে, তাঁকে স্ট্যান্ডিং ওভেশন দেওয়া হল প্রবল হাততালির সঙ্গে। তরুলতা সেনকে এখনকার প্রজন্ম কেউ চেনে না, কিন্তু তাঁর গানে বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন, এককালে বহু শ্রোতাকে খুশি করেছিলেন তাঁর নজরুলগীতিতে।

কর্নেলের এরপর চোখ পড়ল ডালিমের দিকে, তুমি কিছু বলবে মনে হচ্ছে, ডালিম। অনেকক্ষণ থেকেই উসখুস্ করছ।

ডালিম তক্ষুনি লাফ দিয়ে উঠল, আমি না। আমার বন্ধু টোটন একটা কবিতা আবৃত্তি করবে। ওর ভালো নাম প্রবাল।

টোটনের চেহারা মিষ্টি, একটু লাজুক ধরনের। গায়ের রঙ শ্যামবর্ণ। পুজোয় পাওয়া নতুন জামা-প্যান্ট পরে এসেছে, ডালিমের কথা শেষ হতেই সে তৎক্ষণাৎ পুজো নিয়ে লেখা রবীন্দ্রনাথের কবিতা বলতে শুরু করল, আশ্বিনের মাঝামাঝি/উঠিল বাজনা বাজি—

টোটনের গলায় বেশ দরদ-মাখানো। আবৃত্তি শেষ করে সে বলল, এই কবিতার ছোট্ট ছেলেটি তার পুজোর উপহার পেয়ে খুশি হয়নি। আমরা কিন্তু ফাদারের কাছ থেকে যে জামা-প্যান্ট পুজোর উপহার হিসেবে পেয়েছি, তা খুবই ভাল লেগেছে আমাদের।

সবাই খুব হাততালি দিল টোটনকে।

গুহমজুমদার এতক্ষণে ঘোষণা করেছেন অনুতোষ বোসের নাম। অনুতোষ বোসের হাতে একটা লাঠি। সবাইকে তাঁর গুড মর্নিং জানিয়ে বললেন, আমি হিমালয়ে যেতে পারিনি বলে খুব কষ্ট হচ্ছিল। তাই যে লাঠিটা নিয়ে প্রতিবছর হিমালয়ে যাই, সেটা নিয়েই এখন হাঁটছি কলকাতার পথে। পুজোর চারদিনও আমি লাঠি হাতে নিয়ে ঘুরেছি এক প্যান্ডেল থেকে আর এক প্যান্ডেলে। কিন্তু আজ এই অনুষ্ঠানটিতে যোগ দিতে পেরে এত ভালো লাগছে! মনে হচ্ছে, হিমালয়ে গেলে আজকের এই আনন্দ থেকে বঞ্চিত হতাম।

অধ্যাপক খাসনবীশ ইতিহাসের মানুষ। তিনি দুর্গাপুজোর ইতিহাস, কী পরিপ্রেক্ষিতে রামচন্দ্র অকালবোধন করেছিলেন, যে পুজো বসন্তকালে হত, তা কেন আশ্বিনে করা হল, পুরাণ-রামায়ণ-মহাভারত উদ্ধৃত করে বেশ বুঝিয়ে বললেন সবাইকে।

আরও একজন বাকি ছিলেন তখনও। তিনি রায়সাহেব। বললেন ভাগবতের গল্প। বেশ প্রাঞ্জল ভাষায়, বিশদ করে। ভারী উপভোগ্য বক্তৃতা।

কর্নেল সবশেষে উঠে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে বললেন, এই ছোট্ট অনুষ্ঠানটি আমাদের সবাইকে আরও কাছে এনে দিল, পরস্পরকে জানার সুযোগ করে দিল। আগামীকাল থেকে পরস্পরের মধ্যে আরও নিবিড় বন্ধুত্ব গড়ে উঠবে আশা করছি। মানুষের বন্ধুত্বই হল জীবনের এক পরম পাওয়া।

কর্নেলের কথা শেষ হতে এই অনুষ্ঠানের শেষ গান বা সমাপ্তি সঙ্গীত গাইতে অনুরোধ জানানো হল কাবেরী দে সরকারকে। কর্নেল বললেন, কাবেরীকে আপনারা সবাই চেনেন। রোজ দুধের ক্যান বয়ে নিয়ে আসে বলে আমি ওর নাম দিয়েছি

দুধওয়ালি।

কাবেরী কর্নেলের দিকে একরাশ কটাক্ষ ছুড়ে দিয়ে এসে বসল ঘাসের মঞ্চের ওপর। তারপর মিষ্টি সুরে গাইল, আজ আলোকের এই ঝর্ণাধারায় ধুইয়ে দাও। আপনাকে মোর লুকিয়ে রাখা ধুলার ঢাকা ধুইয়ে দাও।

সবাশেষে বেশ সাহিত্যটাহিত্য করে সবাইকে ধন্যবাদ জানাল বিদ্যুৎ চ্যাটার্জি। অনুষ্ঠান শেষ হতে সবারই চোখমুখে এক আশ্চর্য আবেশ। ঘড়িতে চোখ পড়তে লাফিয়ে উঠলেন কেউ-কেউ, সাড়ে সাতটা বাজতে চলেছে! যাদের অফিস যাওয়ার তাড়া, তারা ভেতরে ভেতরে উসখুস করলেও অনুষ্ঠান ছেড়ে চলে যেতে পারেনি। কোথায় যেন একটা টান অনুভব করেছে সবাই। একটু স্বাস্থ্যের কারণে সবাই এসে জড়ো হয় এই ম্যাক্‌সাহেবের মাঠে। বাতাসে একটু 'ওজন' খুঁজতে, বিশুদ্ধ অক্সিজেন খুঁজতে। এই সমবেত প্রয়াসটিতেও কোথাও যেন সেই বিশুদ্ধ বাতাসের রেণু ছড়িয়ে ছিল আজ। মানুষের সঙ্গে মানুষের খোলামেলা মেলামেশাও একধরনের অক্সিজেন। মনের ভিতর জমে থাকা ক্লেদটুকু এক দমকায় উড়ে গেল কোথায়।

তাছাড়া অন্যদিনের সঙ্গে আজকের একটা তফাৎও আছে। রোজ আলোচনা হয় রাজনীতি, কিংবা ক্রিকেট অথবা মূল্যবৃদ্ধি। আজ শুধুই মানুষের ভালবাসা, শুভেচ্ছা আর হার্দ্য সম্পর্ক।

মনোজিৎ রায় এবার এগিয়ে এসে বললেন, আমাদের সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেলেও আর একটি বিশেষ অনুষ্ঠান এখনও বাকি। বিজয়ার অনুষ্ঠানে একটু মিষ্টিমুখ না করে যেতে নেই। আমরা সামান্য মিষ্টান্নের ব্যবস্থা করেছি আজ।

বলেই এদিক-ওদিকে খুঁজলেন বিশ্বজিৎকে, কই, তোমার মিষ্টির ঝুড়ি নিয়ে এসো—

বিশ্বজিৎ ততক্ষণে কংক্রিটের বেঞ্চের নীচে রাখা মাঝারি সাইজের একটা ঝুড়ি বার করে নিয়ে এসেছে। তাতে ভর্তি ছোট-ছোট প্যাকেট। এ ক'দিন মনোজিৎবাবু পাঁচ-দশ টাকা করে চাঁদা তুলেছিলেন, তার সঙ্গে নিজেও কিছু দিয়ে আয়োজন করেছেন এই মিষ্টিমুখের।

প্যাকেট ছোট্ট, কিন্তু তার আবেদন অনেকখানি। সবারই মুখ তখন খুশিতে ভরপুর।

অধ্যাপক খাসনবীশ প্যাকেট খুলে মিষ্টি হাতে নিতেই কর্নেল গম্ভীরস্বরে বলে উঠলেন, এটা কি ঠিক হচ্ছে, প্রফেসর? আপনার রক্তে চিনির পরিমাণ কিন্তু ডেঞ্জার-লিমিটের অনেক ওপরে।

অধ্যাপক খাসনবীশ বেশ প্রশান্তমুখে সন্দেশ চিবোতে চিবোতে বললেন,

সেভেনটি ফোর শেষ হতে চলল. কর্নেল। এতবছর যখন ব্যাটিং করেছি নির্বিঘ্নে, জীবনের বাকি ক'বছর আর নাইবা ডাক্তারদের বাধানিষেধ মানলাম।

কর্নেল ঘাড় ঝাঁকালেন, ওটা কোনও কাজের কথা নয়, প্রফেসর। ব্রহ্মচারীকে বহুবার বারণ করা সত্ত্বেও সে এখনও মাঝেমধ্যে ড্রিঙ্কস নেয়। লোভ সামলাতে পারে না। তার ফল তো দেখতেই পারছেন।

তখন দ্রুত খালি হয়ে যাচ্ছে মাঠ। কর্নেল তাঁর মুখে এক অদ্ভুত মুগ্ধতা মাখিয়ে দেখছেন মানুষের চলে যাওয়া। কাকভোরের এই মুহূর্তগুলি যেন জীবনের এক-একটি হীরকখণ্ড বিশেষ। তাকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে জীবনের উপর নানারঙের আলো ফেলা যায়।

মনোজিৎ রায় এতক্ষণে বললেন, কেন যে আমার কালরাতে শুতে দেরি হয়েছিল, দেরি হল ঘুম ভাঙতে, তা এবার আপনাদের কাছে বলি, কর্নেলদা।

কর্নেল তাঁর চোখমুখের আচ্ছন্নতা কাটিয়ে জেগে উঠলেন যেন, কী হয়েছিল মনোজিৎ?

মনোজিৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, জানেনই তো, আমাদের বোসমাসিমার অবস্থা খুব বাড়াবাড়ি হয়েছিল। কাল অফিস থেকে বাড়ি ফিরেই একবার অভ্যেস মতো খোঁজ নিতে গেলাম ওঁর। রাত দশটা থেকেই লোড্‌শেডিং চলছিল আমাদের পাড়ায়। তার ওপর বেশ গরমও ছিল রাতে। গিয়ে দেখি, বোসমাসিমার প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট। তার ওপর গরমে ঘামছেন ভীষণ। সত্যি, যা লোডশেডিং হচ্ছে রোজ, প্রাণ ওষ্ঠাগত।

কর্নেল ব্যস্ত হয়ে বললেন, তারপর?

—পাড়ার ডাক্তারকে কল্‌ দিলাম। তিনি দেখে বললেন, হসপিট্যালাইজ্‌ করতে পারলে ভালো হত, অন্যথায় বাড়িতেই অক্সিজেন দিতে হবে এক্ষুনি। সঙ্গে সঙ্গে বাইক নিয়ে সারা বেহালা চুঁড়ে ফেলে অবশেষে এক নার্সিংহোমে সিলিন্ডারটা পেয়ে গেলাম ভাগ্যক্রমে। ডাক্তার মুখার্জি খুব হেল্প করেছেন কাল। অক্সিজেন ফিট করে দিতেই কিছুটা স্বস্তি পেলেন বোসমাসিমা। কিন্তু অক্সিজেনের সমস্যা মিটলেও লোড্‌শেডিঙের জন্যে খুব কষ্ট পেয়েছেন। কারেন্ট এল রাত তিনটের পর। ওঁকে ঘুম পাড়িয়ে তারপর আমি শুতে যাই।

সুরঞ্জন অবাক হয়ে তাকাল মনোজিৎ রায়ের দিকে, সত্যি, আপনি ছিলেন বলে ভদ্রমহিলার আয়ু একটু করে বেড়ে যাচ্ছে।

—তাও তো পাড়ার লোকে বলছে, নিশ্চয় আমার কোনও ধান্দা আছে। তাই রাত জেগে অত পরিশ্রম করে সেবাযত্ন করছি মহিলাকে।

কর্নেল হো হো করে হাসলেন, আধুনিকযুগের শাস্ত্র বোধহয় তাইই বলে, কদাচ পরের উপকার করিবে না।

মনোজিৎবাবু বললেন, কিন্তু আরও একটা প্রবল দুশ্চিন্তার খবর আছে, কর্নেলদা। আমি মাঠে এসেই খবরগুলো বলিনি, কারণ তাহলে আজ এত কষ্ট করে আয়োজন করা অনুষ্ঠানটি হয়তো নষ্ট হয়ে যেত।

—কী খবর, মনোজিৎ?

—কাল বোসমাসিমার বাড়ি যাওয়ার আগে খবর নিতে গিয়েছিলাম ব্রহ্মচারীদার। আপনি পরশু গিয়েছিলেন শুনলাম। তখনও পর্যন্ত বেশ ভালই ছিলেন। বিছানায় বসে গল্পগুজবও করেছিলেন আপনার সঙ্গে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, বেশ খোসমেজাজেই ছিলেন তখন। বললেন, দু-তিনদিনের মধ্যেই মাঠে যাব। মাঠে না যেতে পারলে পুরোপুরি সুস্থ হতে পারছি না।

—কিন্তু কাল সকালে ঘুম ভেঙে উঠেই জানিয়েছিলেন, ভীষণ ব্যথা করছে বুকটা। বলতে বলতেই হঠাৎ জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। ডাক্তার এসে বলেছেন, অ্যানাদার অ্যাটাক। সঙ্গে সঙ্গে পি. জিতে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছে। ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে।

কর্নেল দম বন্ধ করে শুনছিলেন কথাগুলো। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, কী আশ্চর্য। প্রায় সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন তো। আবার—

—হ্যাঁ। বোধহয় একটু হাঁটাচলাও করেছিলেন আগেরদিন বিকেলে। ডাক্তারের নিষেধ থাকা সত্ত্বেও—

কর্নেল অনেকক্ষণ গুম্ হয়ে বসে রইলেন বেঞ্চের উপর। চারপাশের বাতাস হঠাৎ ভারী হয়ে এল যেন। নীলেশ ব্রহ্মচারীর সঙ্গে কর্নেলের এতকালের চেনাশুনা। বোধহয় তিরিশবছর। একসঙ্গে মর্নিং-ওয়াকও করছেন আজ বছর পনের। ক'দিন আসছেন না বলে এমনিই কেমন ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকছে তাঁর। এখন হঠাৎ যদি ফ্যাটাল্ কিছু ঘটে যায়—

আর কিছু ভাবতে পারলেন না কর্নেল।

আশ্বিন পেরিয়ে একসময় কার্তিকমাসে পা রাখে সুরঞ্জনদের পৃথিবী। ভোরের দিকে দিব্যি হিম পড়ছে আজকাল। পড়বেই তো, হেমন্তকাল এসে গেল যে। হেমন্তকাল জীবনানন্দ দাশের প্রিয় ঋতু। হয়তো তাইই সুরঞ্জনের মনে হয় হেমন্তই ঋতুরাজ। এখন সকালের দিকে সামান্য শিরশির করে শরীর। তবু বেশ প্লেজান্টও মনে হয় হেমন্তের হিম।

রাউন্ড দিতে দিতেই সুরঞ্জনের চোখে পড়ে, সেদিন বিজয়া-সম্মেলনীতে চমৎকার বক্তৃতা করেছিলেন যে সুকান্ত দাস, তাঁকে ঘিরে বেশ কয়েকজন মহিলার ভিড়। কাছে যেতেই শুনল, দাসদার বাইপাস সার্জারির আজ নাকি তৃতীয় বর্ষপূর্তি উৎসব। সেখানে হু-হু করে আত্মদান করছে একরাশ সিঙ্গাড়া-জিলিপি। ষাট পেরিয়েও এখনও বেশ ইয়ং দেখায় সুকান্ত দাসকে। কিন্তু তাঁর হৃৎপিণ্ডে তিনবছর আগে দামামা বেজে উঠেছিল তা সুরঞ্জন জানত না। এখন দেখল, কীভাবে তাঁর পায়ের শিরা কেটে বার করে নিয়ে বিশেষজ্ঞ-ডাক্তাররা তা বসিয়ে দিয়েছেন বুকের এদিকে-ওদিকে। যে-পথে যাওয়া-আসা করার কথা রক্তের, এখন তা বয়ে চলেছে ভিন্ন পথে। সেই দাসদা রোজ ভোরে অন্তত পাঁচ কিলোমিটার হেঁটে অটুট রাখছেন শরীর-স্বাস্থ্য।

সুরঞ্জনকে একসময় ফিসফিস করে বললেন, হাঁটিহাঁটি না করলে সপ্তাহে একদিন স্বাস্থ্যপান করা কি সম্ভব হত!

সুরঞ্জন অবাক হয়ে গেল খুব, বাইপাস সার্জারির পরও আপনি—!

—ওটা কিছু নয়, দাসদা হো হো করে হেসে উড়িয়ে দিলেন সুরঞ্জনকে, পাঁচ-ছ পেগ পর্যন্ত এখনও ব্যাটিং করতে পারি। জিজ্ঞাসা করে দেখবেন অসিতকে।

কয়েকদিন আগে মনোজিৎ রায়ই আলাপ করিয়ে দিয়েছেন অসিত ভট্টাচার্যের সঙ্গে। ওঁরা প্রায় সতের আঠার জনে মিলে তৈরি করেছেন 'সুপ্রভাত' নামে একটি অলিখিত ক্লাব। সবার সঙ্গে এখনও আলাপ হয়নি সুরঞ্জনের, তবু চাকুরিজীবিও যেমন আছেন ক্লাবে, তেমনই কয়েকজন সফল বিজনেস্‌ম্যান। আই. টি. সি-র কালীদা, 'সেল' এর লাচ্ছুদা, ব্যাঙ্ককর্মী জ্যোতিদা আর লাল্টুদা, ইন্ডিয়ান অয়েলের অসিত ভট্টাচার্য, কাস্টম্‌সের অমৃতা ভর সঙ্গে নাথদা, পুততুণ্ডবাবু, প্রেস মালিক বাচ্চাদা, হোটেল মালিক অখিলদার মতো বিজনেসম্যানরাও দিব্যি মিলমিশ হয়ে আছেন একটা টিম হয়ে।

মাঠে একদিন কেউ না এলেই হই হই করে তাঁর ফাইন নিয়ে সেই টাকায় অখিলদার হোটেল থেকে সিঙ্গাড়া জিলিপি কিংবা কাটলেট আনিয়ে নেন প্রায়ই। দাসদা এঁদের প্রায় অলিখিত গার্জেন। মিস্টার এবং মিসেসদের ওপর নজরদারি রেখে দেন রাউন্ডের পর রাউন্ড দিতে দিতে।

ম্যাকসাহেবের মাঠে দাসদা যে বেশ জনপ্রিয়, মহিলা-পরিবৃত অবস্থায় তাঁকে দেখে নিমেষে বুঝে ফেলল সুরঞ্জন। তাঁর সঙ্গেও সুরঞ্জনের আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন মনোজিৎ রায়ই। বলেছিলেন, ভেরি সাকসেসফুল বিজনেসম্যান। ঠাণ্ডা বিক্রি করেন—

—ঠাণ্ডা! সুরঞ্জন বোকার মতো জিজ্ঞাসা করেছিল, কীসের বিজনেস। আইসক্রিমের?

দাসদা হেসে উঠে বলেছিলেন, প্রায় ওরকমই। তবে আর একটু বড় সাইজের। এয়ারকণ্ডিশন মেসিন।

তো দাসদা যখন মহিলাদের সিঙ্গাড়া-জিলিপি খাওয়াতে ব্যস্ত, তখন মহিলাদের কাউন্টারপার্ট, অর্থাৎ মিস্টাররা ব্যস্ত রকমারি পানীয়ের আলোচনায়। আজকাল সন্ধ্যের দিকে টুকটাক ছোট-ছোট পানীয়ের আসর বসছে এর-ওর বাড়িতে।

শুনে সুরঞ্জন চোখ ছানাবড়া করেছিল, বলেন কী! এদিকে ভোরে উঠে স্বাস্থ্য-উদ্ধারের সাধনা চলছে, ওদিকে সন্ধ্যেয় স্বাস্থ্যহানি!

কাছাকাছি ছিলেন আই. টি. সি-র কালীদা, মুচকি হেসে বললেন, আপনি ওসব বুঝবেন না। এর নাম ব্যালান্স অব নেচার। স্বাস্থ্যহানি না ভেবে স্বাস্থ্যপান ভাববেন, দেখবেন শরীরে এক্সট্রা এনার্জি চলে আসবে ফুরফুর করে।

তো দাসদার আঙুল অনুসরণ করে সুরঞ্জন তাকিয়ে দেখল, কী যেন একটা গভীর আলোচনায় ভারী ব্যস্তসমস্ত অসিত ভট্টাচার্য।

কাছে গিয়ে দেখল, ইন্ডিয়ান অয়েলের মিঃ ভটচায তখন আরও কয়েকজনকে নিয়ে আগামী ডিসেম্বরে আউটিঙে যাওয়ার প্ল্যান ভাঁজছেন ভারী নিবিষ্ট হয়ে। সেইসঙ্গে কী কী পানীয় সঙ্গে নেওয়া দরকার, তার তালিকা করছেন বেশ গম্ভীর মুখে। মাঠে তাঁদের গ্রুপটা বেশ বড়ই। প্রতিবছরই তিনচারদিনের জন্য তাঁরা হৈ-হুল্লোড় করতে বেরোন দল বেঁধে। এবার গন্তব্য শিমুলতলা। মাঠের আলাপ কতটা সুদূরপ্রসারী করা যায় সেটা প্রমাণ করতেই ক্রমশ দূরবর্তী স্থান নির্বাচন করে চলেছেন আউটিঙের স্পট হিসেবে। গতবার গিয়েছিলেন শংকরপুর, তার আগেরবার হলদিয়া। পরের বছর চিল্কা যাবেন এমন আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে সাবস্ক্রিপশন আদায় করছেন তাঁদেরই ম্যানেজার সাহাদা আর অ্যাসিস্ট করছেন শ্যামলবাবু আর মিঃ ভদ্র।

আউটিঙে যাওয়ার দলটি বছরের পর বছর বেশ ভারী হয়ে চলেছে বলে কপালে ভাঁজ পড়ছে ম্যানেজারের। এত বড় টিম নিয়ে সামলাতে পারবেন কি না ভাবতে ভাবতে বললেন, কি বাচ্চাদা, আপনি এবার যেতে পারবেন তো!

বাচ্চাদা ঘাড় নেড়ে না বলতেই অসিতবাবু বললেন, বাচ্চাদা কেন যায় না বলুন তো? আমরা যে একটু-আধটু ড্রিঙ্ক করি তা ওনার মিসেস একেবারেই পছন্দ করেন না। বাচ্চাদা আমাদের সঙ্গে গেলে পাছে ওঁর চরিত্র খারাপ করে দি, তাই বোধ হয় হোমডিপার্টমেন্টের এহেন কড়া নিষেধাজ্ঞা।

বাচ্চাদা নামের মধ্যবয়সী মানুষটি ব্যবসায়ে সফল, কিন্তু ব্যবহারে সরল। প্রবলভাবে ঘাড় নেড়ে প্রতিবাদ করলেন, উঁ হু, মোটেই সে-কারণে নয়। শীত ছাড়া আপনারা বেরোবেন না। আবার এসময়েই আমাদের বিজনেসের চাপ বেশি।

প্রতিবছর আউটিঙে যায় যে টিমটা, বাচ্চাদা তার নাম দিয়েছে আর. এম. এস, অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় মাতাল সমিতি। নামকরণটির প্রতিবাদে সরব হয়েছেন অনেকে। নাথদা বললেন, কেন, কেন, মনোজিৎবাবুও তো পানীয় স্পর্শ করেন না। তবু তিনিও তো প্রতিবছর সঙ্গ দেন আমাদের। চলুন বাচ্চাদা, আপনাকে আমরা জোরাজুরি করব না।

ওপাশে দাঁড়ানো মাঝারি ধরনের লম্বা, ছিপছিপে, চশমা-চোখে ব্যাঙ্ক-অফিসার জ্যোতিদা বললেন, আপনি তো গেলাস হাতে নিয়ে অমৃতাভ-র ড্যান্স দেখেননি। সে এক অপরূপ দৃশ্য। সে দৃশ্য না দেখলে জীবনটাই বৃথা।

বাচ্চাদা তবুও অনড় দেখে পুরুষ্ট গোঁফঅলা হোটেল-মালিক অখিলদা বললেন, তাহলে আপনি বরং মিসেসদের 'খাই-খাই' পার্টিতে যোগ দিন।

পুরুষদের 'আর. এম. এস.' পার্টি বেশ জোরদার চলছে দেখে মহিলারাও একটা ক্লাবের পত্তন করেছেন কিছুদিন আগে। মাঠে হাঁটতে হাঁটতে হাজারো গল্পগুজবের ফুরসতে তাঁরাও ঠিক করেছেন মাসে অন্তত একদিন প্রত্যেকই কোনও না কোনও একটা মেনু তৈরি করে হাজির হবেন কোনও একজনের বাড়িতে। সেখানে ভাতটা রান্না করে নিয়ে জোরদার ফিস্ট করবেন সারাদিন।

গতমাসে আঠারোজন মেম্বার আঠারো রকমের মেনু নিয়ে আসায় কে কোনটা খাবে কোনটা খাবে না এই নিয়ে দারুণ মুশকিলে পড়ে গিয়েছিলেন সবাই। এবার ঠিক করেছেন, এতরকম আইটেম আর রান্না করা হবে না। ছ'টা আইটেমই যথেষ্ট, প্রথম মাসে যে কোনও ছ' জন আনবেন, পরের মাসে অন্য ছ' জন—এভাবে পালা করে রান্না করলে হ্যাঁপাও একটু কম হয়। খাওয়ার সময়ও মেনু পছন্দ করার ঝামেলা থাকে না।

'খাই-খাই' ক্লাবের এহেন লালাহর্ষক গল্প পরদিন মাঠে বেশ ফলাও করে পরিবেশিত হয় তাঁদের মিস্টারদের জমায়েতে। মিস্টাররা এখন ভাবতে বসেছেন, তাঁরাও এই খাই-খাই পার্টিতে যোগ দেবেন কি না। কিন্তু মিসেসরা নাকি একটা অদৃশ্য বোর্ড ঝুলিয়ে রেখেছেন 'ফর লেডিজ ওনলি' বলে। তাতে পুরুষরা একে-অপরের দিকে তাকিয়ে কেবলই আঙুল চুষছেন।

রাউন্ড দিতে দিতে এরকম আরও বহু চরিত্রের সঙ্গে দেখা হয় সুরঞ্জনের, আলাপও হয় একসময়, আলাপ থেকে ঘনিষ্ঠতা। সেভাবেই আলাপ হয়ে গেল একদিন রায়সাহেব আর মিঃ কাঞ্জিলালের সঙ্গে, দু'জনেই সস্ত্রীক মাঠে আসেন, মাঠে

আসার পরই অবশ্য বিচ্ছিন্ন হয়ে যার-যার জুড়ি খুঁজে নেন। রায়সাহেব ইংরেজিতে মহাভারত অনুবাদ করে ইতিমধ্যে খ্যাতিমান, এখন চলছে ভাগবত লেখার কাজ। তাঁর স্ত্রীও সাহিত্যরসিক, পুত্র রোরিং পশারঅলা ডাক্তার। আর মিঃ কাঞ্জিলাল চাকরিজীবনে সারা ভারতবর্ষ ঘোরার পর আপাতত জেমস লঙে বাড়ি করে সেট্‌লড্‌। এ-রাজ্যে ও-রাজ্যে ঘুরতে ঘুরতেই একদিন বিয়ে করে ফেলেছিলেন একজন সুন্দরী বিমানসেবিকাকে। পঁয়ষট্টি পেরিয়েও সেই মিসেস কাঞ্জিলাল এখনও সুন্দরী প্রতিযোগিতায় নাম দিতে পারেন।

আরও আলাপ হল বিমানবাহিনীর রিটায়ার্ড অফিসার আর এক দাসদার সঙ্গে। দেখা হলেই হাত দুটো জোড় করে, স্মিতহাসি উপচে বলেন, 'গুড মর্নিং'। একই সঙ্গে বাঙালিপ্রথা আর ইংরেজিপ্রথার এহেন সমন্বয় ভারী পুলকিত করে সুরঞ্জনকে।

কার্তিক মাসের এই হিম্-হিম সকালে তখন একটাই আলোচনা মুখে-মুখে ঘুরছে সবার। এতকাল সবাই পঞ্জাব নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল, এখন হঠাৎই আধিষ্কৃত হয়েছে, কাশ্মীরের অবস্থা আরও অগ্নিগর্ভ। গোটা কাশ্মীর নাকি অ্যান্টি-ইন্ডিয়ান হয়ে গেছে এরকম একটা ভয়ঙ্কর বোমা সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় ফাটতেই প্রধানমন্ত্রী বিশ্বানাথ প্রতাপ সিং একেবারে ল্যাজে-গোবরে। প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে দেশের গোয়েন্দাবাহিনী কি চোখ বুজে ঘুমিয়ে ছিল এতকাল!

শোনা যাচ্ছে, কাশ্মীরে এখন সাধারণ নাগরিকদের চেয়ে সৈন্যবাহিনীর সংখ্যাই বেশি। বাইশ হাজার সি. আর. পি., আট হাজার বি. এস. এফ টহল দিচ্ছে শহর থেকে গ্রামে। তা ছাড়াও খোদ আর্মির লোক প্রচুর। মিলিট্যান্টদের সঙ্গে প্রতিনিয়তই লড়াই চলছে আর্মির। দু'পক্ষই হতাহত হচ্ছে রোজ। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাপার হল ওখানকার সমস্ত সরকারি কর্মচারি পর্যন্ত গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে।

সুরঞ্জনকে দেখে দেবাশিস দত্ত উত্তেজিত হয়ে বললেন, জানেন, সেদিন আমাদের অফিসে কলকাতার কাশ্মীর এম্পোরিয়ামের ম্যানেজার এসেছিল। তার কথাবার্তা শুনলে রাগে গা জ্বলবে আপনার। বলে কিনা, 'আপনারা, ইন্ডিয়ানরাই এর জন্য দায়ি।' নিজেকে ইন্ডিয়ান বলে স্বীকার করতেই চায় না। বলে, 'আমরা ইন্ডিয়ান হতে যাব কেন। আমরা কাশ্মীরি।' বুঝুন অবস্থা। এদেশে থাকবে, খাবে, সংবিধান অনুযায়ি বিশেষ সুযোগসুবিধা নেবে, আর বলার সময় বলবে, আমরা ইন্ডিয়ান নই।

নিশীথ দাশগুপ্ত বললেন, রাজনীতির আলোচনা বরং থাক। আমাদের রাজনীতিবিদদের তোষণনীতির জন্যই বিচ্ছিন্নতাবাদ আরো মাথাচাড়া দিচ্ছে সর্বত্র। রাজনীতির কথা ভাবলেই ভোরের এই সুন্দর বাতাসটুকু কলুষিত হয়ে যায়। বরং

লেট আস্ টক অ্যাবাউট দ্য ওয়েদার। ব্রিটিশরা যেমন দেখা হলেই আবহাওয়ার কথা আলোচনা করে। শীত আসি আসি করেও যেন আসছে না। কী বলো?

বিদ্যুৎ চ্যাটার্জি এসে পড়েছিলেন, হেসে বললেন, কথাটা বেশ ঘুরিয়ে দিলেন তো।

—হ্যাঁ, দেখুন না, রেন-ট্রি গাছগুলো পাতা ঝরানোর জন্য কীরকম প্রস্তুতি নিচ্ছে। প্রতিবার শীতেই তো গাছগুলো নিজেদের সাজ বদলে নেয়।

—বাহ্, শীতকালের একটা নতুন ডেফিনিশন দিলেন তো!

—নতুন নয়, আমি শীতকালকে তিনটে বিষয়ের জন্য গুরুত্ব দিই। শীতের দিনে সাপেরা ঘুমোতে যায়। গাছেরা তাদের সাজবদল করে। আর হাটেবাজারে ফসলের শরীরে যৌবন আসে।

বিদ্যুৎ চ্যাটার্জি অবাক হয়ে বললেন, নিশীথদা আপনি এমন প্রকৃতি-প্রেমিক তা তো জানতাম না।

তিনজনে হাসতে হাসতে এগিয়ে চললেন সামনের দিকে।

নিশীথ দাশগুপ্তের কথা শুনে সুরঞ্জন তাকিয়ে দেখতে থাকে, মাঠের চারপাশে বিশাল ছাতার মতো রেন-ট্রি গাছগুলো ঘিরে আছে। গাছগুলো আছে বলেই ভোরের রোদ মাঠে প্রবেশ করতে আরও একটু দেরি হয়। আরও কিছুক্ষণ ভোরবেলার সুন্দর মুহূর্তগুলো ধরে রাখতে পারে ম্যাকসাহেবের মাঠ। যতক্ষণ ভোরবেলা ততক্ষণই তো আরাম। ততক্ষণই পৃথিবীর যা কিছু রহস্য। এই কুয়াশারঙের ভোরের টানেটানেই তো তাঁরা সবাই এসে হাজির হন মাঠে। রোদ উঠলেই পৃথিবীর রহস্য ছিঁড়েখুঁড়ে খানখান হয়ে যায়।

সত্যিই, কী আশ্চর্য শৌখিনতা ছিল ম্যাকডোনাল্ডসাহেবের। তিনি হয়তো কখনও ভাবতেই পারেননি, তাঁরই গড়ে তোলা প্রতিষ্ঠানে প্রতিদিন এত এত মানুষ এসে ভিড় করবে। একটু বাতাসের জন্য খুঁতো ফুসফুস বাড়িয়ে দেবে লোভীর মতো। একটু সবুজের ছোঁয়া মেখে আরও সবুজ হয়ে উঠতে চাইবে দিনদিন।

চলতে চলতে দেখা হয়ে গেল কর্নেল আর অধ্যাপকের সঙ্গে। তাঁদের সঙ্গে জিন্স্-পরিহিতা তিতির। থ্রি ম্যাস্কেটিয়ার্স কাছেই ছিলেন, তাঁদের দেখে কর্নেল সহাস্যে বললেন, শুনেছেন তো, কাল ব্রহ্মচারী হসপিট্যাল থেকে রিলিজ নিয়ে বাড়ি ফিরেছে।

থ্রি মাস্কেটিয়ার্স ঘাড় নাড়লেন, শুনেছি, কর্নেলদা। ক'দিন খুব ধকল গেল ওঁর শরীরের ওপর দিয়ে। ডাক্তার করও নাকি শেষপর্যন্ত আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। বাট্ হি ওয়াজ মিরাকুলাস্লি সেভ্ড্।

এবার অনিমেষ ঘোষদস্তিদার বললেন, খুব ভাল খবর। তাইই বোধহয় আপনাকে আরও ইয়াং লাগছে, কর্নেলদা। মনে হচ্ছে, আগের চেয়ে বয়স কমে গেছে কয়েক বছর।

কর্নেল খুশি হয়ে বললেন, ইজ ইট?

অধ্যাপক খাসনবীশ হাসতে হাসতে মুখ খুললেন, আসল কারণ অন্য। অমন একটা কচি গিন্নি পেলে আমার বয়সও কুড়ি বছর কমে যেত। আমার বুড়িগিন্নি বাতের ব্যথায় যত কাত্‌রায়, আমার বয়স ততই বেড়ে যায় গ্যালপিং স্পিডে। সেই গ্যালপিং হেপাটাইটিসের মতো।

তিতির মুখে রাগ-রাগ ভাব ফুটিয়ে বলল, উহ্, দাদু, তোমরা সবাই মিলে এমন পেছনে লেগেছ আমার—

কর্নেল হো হো করে হেসে বললেন, একটা কথাও ওরা মিথ্যে বলেনি, দিদিভাই, অতবড় বাড়িতে একলা থাকতাম, তাতে মাঝেমধ্যে বড় একা লাগত। তুই এসে ইস্তক সারাক্ষণ বকবক করছিস, কোথা দিয়ে সময় কেটে যাচ্ছে বুঝতেই পারছি নে। সবসময় মনে হচ্ছে, আমি একা নই। মনে সাহস আসছে, শরীরে বল বাড়ছে। তুই এসে এমন একটা খারাপ অব্যেস করে দিয়ে গেলি—

—আমি তাহলে বরং এখানে পাকাপাকিভাবে চলে আসি, দাদু। এখানে এসে কলেজে ভর্তি হব। বাবার তো আর কলকাতায় কখনও ট্রান্সফার হবে না—

কর্নেলের চোখের কোণদুটো হঠাৎ যেন চিকচিক করে উঠল। সারাজীবন চাকরির ভেতর বুঁদ হয়েই কাটিয়েছেন। কখনও তেমন করে নিজের সংসারের দিকে মাথা ঘামানোর সময় পাননি। হয়তো তাই সংসারও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তাঁর দিক থেকে। যে-সংসার ভরভরন্ত হওয়ার কথা ছিল, সেখানে এখন তিনি একা, পরিপূর্ণভাবে একা। তবু এই ছোট্ট মেয়েটা যে তাঁর একাকীত্বের কথা ভেবেছে, তা ভেবেই হঠাৎ চোখের কোণদুটো যেন জ্বালা করে উঠল। তবু মুখে হাসি এনে বললেন, তুই চলে এলে তোর মা-বাবা থাকবে কী করে। তুই তো তাদের একটা মোটে মেয়ে।

তিতির হয়তো সেটা ভাবেনি। তার দাদু একা থাকে বলেই বোধহয় কথাটা ঝোঁকের মাথায় বলে ফেলেছে। তার মা-বাবাও তো তাকে ছাড়া একমুহূর্ত থাকতে পারে না। এবার নেহাৎ স্কুলে একটা গণ্ডগোল চলছে বলেই তাকে পাঠিয়ে দিয়েছে কলকাতা। ইস্, তার যদি আর একটা ভাই বা বোন থাকত!

কর্নেল বললেন, তবে যাই বলুন না কেন, তিতির আমাকে মাঝেমধ্যে বেশ বিপাকে ফেলছে। হঠাৎ-হঠাৎ নানারকম কুইজ ছুড়ে দিচ্ছে আমার দিকে, বলো তো

দাদু, কে বলেছে, 'আমাদের দেশে জাতীয় খেলা বলতে একটাই, ক্রিকেট বা ফুটবল নয়। রাজনীতি'? ভাবতে ভাবতে আমি যখন ঘেমেনেয়ে অস্থির, তখন হাসতে হাসতে বলবে, 'বলতে পারলে না! পতৌদির নবাব।'

তিতির চোখ পাকিয়ে বলল, তোমাকে বলেছি না দাদু, বাড়ির কথা একদম মাঠে বলবে না! তবু তুমি—

কর্নেল থামলেন না, আবার বললেন, এই যেমন আজ আসতে আসতে বলল, বলো তো দাদু, এই শহরে মিসেস মঙ্কের বোর্ডিংহাউসটা কোথায় ছিল?

তিতির তার পায়ের বুড়ো আঙুলের ওপর ভর দিয়ে ডিঙি মারল, কর্নেলের মুখে তার হাত চাপা দিল, আহ্, দাদু—

কর্নেল তার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে বললেন, ঠিক আছে, ঠিক আছে, আর বলব না।

বলে তিতিরের হাত ধরে ওঁরা এগোতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ নিশীথ দাশগুপ্ত ব্যস্ত হয়ে বললেন, কিন্তু প্রশ্নটার উত্তর না শুনলে আমার তো রাতে ঘুম হবে না, তিতির।

তিতির হাঁটতে হাঁটতে পেছন ফিরে বলল, গ্র্যান্ড হোটেল।

তিতিরদের ঠিক পেছনেই ছিলেন অনিরুদ্ধ শাসমল। আজ তিনি একা নন, সস্ত্রীক এসেছেন মাঠে। তাদের দেখে গুড মর্নিং বলতে যাচ্ছিলেন নিশীথ দাশগুপ্ত, কিন্তু হঠাৎ চমকে উঠে বললেন, কী ব্যাপার, মিসেস শাসমলের শরীরটা কি ভাল নেই নাকি? অনেকদিন পরে মাঠে এলেন কিন্তু।

কাকলি অবশ্য বছরখানেক আগে পর-পর কয়েকদিন মাঠে এসেছিল, তারপর মেয়ের সকালে স্কুল বলে আসা বন্ধ করেছিল। সেই যে বন্ধ হল, দেখতে দেখতে একবছর পার। অনিরুদ্ধ অনেকদিন ধরেই বলছিলেন, মাত্র তো আধঘণ্টা-পঁয়তাল্লিশ মিনিটের ব্যাপার। ভোরের হাওয়া ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমার পক্ষে খুব উপকারী। কিন্তু কাকলি বলে, 'তাহলে আর মেয়েকে স্কুলে পাঠানো যাবে না।' কিন্তু হঠাৎ এ বছর তার শরীরটা ভাল যাচ্ছে না কিছুতেই। তাই অনিরুদ্ধ আজ জোর করে ধরে এনেছেন তাকে। কাকলির পরিবর্তে উত্তর দিলেন অনিরুদ্ধই, আর দেখুন না, বুকে কফ জমিয়ে বসে আছে। বিছানা থেকে উঠতে পারেনি দু-তিনদিন। শেষপর্যন্ত স্টেরয়েড দিতে তবে সুস্থ হয়েছে।

—একদিন এলে হবে না। রোজ আসতে হবে। তিনশো পঁয়ষট্টি দিন।

—আপনি ভালো করে বলুন তো ওকে, দাশগুপ্তদা। আমার কথা একদম শোনে না। একে তো আমার শরীরের এই অবস্থা, তার উপর ও-ও যদি বিছানায় শুয়ে পড়ে, তাহলে মেয়েটার কী হবে?

নিশীথ দাশগুপ্ত মাথা নাড়লেন, উঁহু, মিসেস শাসমল। টেক কেয়ার অব ইয়োর হেল্‌থ্‌। এইটুকু বয়স, এর মধ্যে কাহিল হয়ে পড়লে চলবে কেন? ভোর-ভোর উঠে অন্তত আধঘণ্টাও—

শীত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে একেবারে বদলে যায় ম্যাকসাহেবের মাঠের চেহারা। ভোর পৌনে পাঁচটা বলতে রাতই থাকে তখন। সেই অন্ধকারেই কর্নেল চলে আসেন বরাবর। এখন তিতির থাকায় আর অত ভোরে আসতে পারছেন না। অন্তত বারতিনেক না ঠেললে ঘুম ভাঙে না তিতিরের। কাল শোবার আগে তার কানের কাছে অ্যালার্ম-দেয়া ঘড়িটা রেখেছিলেন কর্নেল, সোয়া পাঁচটায় যাতে বেরুনো যায়। তবু এপাশ-ওপাশ করতে থাকা তিতির শেষ পর্যন্ত রেডি হয়ে সাড়ে পাঁচটার আগে বেরুতে পারল না। ততক্ষণে বেশ ফর্সা হয়ে এসেছে পৃথিবী। পুবের আকাশের দিকে তাকালে দেখা যাবে আকাশের গালে কে যেন গোলাপি রুজ মাখিয়ে দিয়েছে আচমকা।

নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই এবার ভোরের দিকে ফুলস্লিভ সোয়েটার লাগছে। তিতির অবশ্য ফুলস্লিভ পরতে কোনওক্রমে রাজি নয়। দাদুকে চোখ পাকিয়ে বলেছে, তোমার না-হয় বয়স বেড়েছে, শীতের অনুভূতিও তাই একটু বেশি। কিন্তু আমারও সেই একইরকম শীত লাগবে তা ভাবলে কী করে। আমার এই হাত-কাটা সোয়েটারটাই যথেষ্ট।

অধ্যাপক খাসনবীশের হয়েছে মহা মুশকিল। ভোর পাঁচটা থেকে অন্ধকারে একা-একা মাঠের চারদিকে ঘুরে বেড়ান ভূতের মতো। শীত পড়তে থাকায় সবাই একটু দেরিতে আসছেন মাঠে। আরও শীত পড়লে আরও একটু দেরি করবে সবাই। কিন্তু কর্নেল কিংবা নীলেশ ব্রহ্মচারী কারোও তো দেরি হয় না কখনও। শীতে-গ্রীষ্মে-বর্ষায় তাঁদের তিনজনের বাঁধা টাইম। দু-চার মিনিট এদিক-ওদিক হয় বড়জোর। এবার হঠাৎ তাল কেটে গেছে।

আজও অধ্যাপক খাসনবীশ চাররাউন্ড শেষ করে তাকাচ্ছেন ইতি-উতি, দেখছেন একে-একে অনেকেই এসে পৌঁছেছে মাঠে, তবু কর্নেলের দেখা নেই।

পাঁচটা চল্লিশ নাগাদ কর্নেল মাঠে পৌঁছতেই তাই আরও একবার তিতিরকে নিয়ে পুরনো রসিকতাটা করতে ছাড়লেন না। শুনে তিতির বলল, আপনাকে আর বেশিদিন কষ্ট করতে হবে না, প্রফেসরদাদু। আর এক সপ্তাহ পরেই আমি কলকাতা ছাড়ছি। তখন আবার আপনি বন্ধুকে ঠিক টাইমে পাবেন।

অধ্যাপক খাসনবীশ ব্যস্ত হয়ে বললেন, তাই নাকি, দিদিভাই? তোমার কল এসে

গেছে তাহলে? এ হে—

তিতির বলে উঠল, বাহ্, আমার স্কুল লেগে গেছে না? কতদিন আর ঝুটমুট স্কুল অফ্ করে থাকব।

—তোমাদের ওখানকার সব ঝামেলা মিটে গেছে?

কর্নেল জবাব দিলেন, মালবিকা তো চিঠিতে তাই লিখেছে। আপাতত ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে সেল্ফ্-ইমোলেশনের হুজুগ। ওদের স্কুলও খুলে গেছে। ওদের অফিসের এক ভদ্রলোক ছুটিতে কলকাতা এসেছেন। তিনি ফোর্টিন্থ্ ফিরবেন জব্বলপুর। তাঁর সঙ্গে যেন পাঠিয়ে দিই তিতিরকে।

অধ্যাপক খাসনবীশ আফসোস করে বললেন, মনটা খারাপ করে দিলে, দিদিভাই। বেশ কদিন তোমার সঙ্গে গল্প করছিলাম। তোমার হাতের চা খাচ্ছিলাম। খুব আনন্দে কাটছিল দিনগুলো—

তিতিরও মুখ ম্লান করে বলল, সামনের সামার ভেকেশনে আবার আসব, দাদু।

বলতে বলতে তার হঠাৎ নজরে পড়ে গেল মাঠের এক কোণে এক্সারসাইজ করতে থাকা বিশ্বজিতের দিকে। বিশ্বজিতের পাশেই বুকডন দিচ্ছে সৌপ্তিক আর নিলয়। তাতে তিতিরকে একটু চঞ্চল দেখাল যেন। বলল, দাদু, তোমরা ততক্ষণে আর একটা রাউণ্ড দিতে থাক। আমি এক্ষুনি আসছি—

কর্নেল অবাক হয়ে বললেন, কেন, তোদের কুইজ-কনটেস্ট এখনও চলছে নাকি?

—কাল সৌপ্তিকদাকে পাঁচটা কোয়েশ্চেন দিয়ে গিয়েছিলাম। আজ তার উত্তর দেওয়ার কথা।

তিতির বড়বড় স্টেপ ফেলে এগিয়ে গেল বিশ্বজিতের ব্যায়ামের আখড়ার দিকে। তাকে দেখে বুকডন ছেড়ে দাঁড়িয়েছে সৌপ্তিক। তার বুক পরিশ্রমের ফলে ওঠানামা করছে। এই ঠাণ্ডার দিনেও অল্প-অল্প ঘাম জমেছে তার কপালে। ফর্সা মুখে কচি-কচি দাড়ি-গোঁফে আজ বেশ চমৎকার দেখাচ্ছে সৌপ্তিককে। তিতির ওদের দলের সঙ্গে মিশে যেতেই কর্নেল আর অধ্যাপক আবার হাঁটতে থাকেন ট্র্যাক বরাবর।

ম্যাকডোনাল্ডসাহেবের দোতলা বাংলোর কাছে পৌঁছতে দুজনে দেখলেন, ফ্লাওয়ার গার্ডেনের ভেতর চাঁপা নামের মেয়েটি ফুল তুলছে একমনে। কর্নেল হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন একমুহূর্ত, আরে চাঁপা, তুমি একা ফুল তুলছ? আজ তোমাদের নান্ আসেননি এদিকে?

চাঁপা বেশ শান্তস্বভাবের মেয়ে। তার চাউনি দেখলেই বোঝা যায় সে ভারী বুদ্ধিমতী। তার হাতে কয়েকটা গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকার থোকা। ফুল তোলা থামিয়ে বলল, নানের শরীরটা আজ ভাল নেই।

—সে কি, কী হয়েছে ওঁর?

—কাল হঠাৎ বাথরুম থেকে বেরুবার সময় পা পিছলে পড়ে গিয়েছেন। ডাক্তার বিছানা ছেড়ে উঠতে মানা করেছেন।

—খুব চোট পেয়েছেন বুঝি?

—একটু পেয়েছেন। তবে তেমন নয়। আমাকে ডেকে বললেন, ফাদারের সমাধিতে ফুল দিয়ে আসতে।

—ও, কর্নেল একমুহূর্ত ভেবে হঠাৎ তাকালেন অধ্যাপকের দিকে, তাহলে ফেরার পথে একবার দেখে যাবেন নাকি নান্ ক্যাথারিনকে?

—হ্যাঁ, নিশ্চয়। আমরা দেখতে গেলে খুবই খুশি হবেন উনি।

ততক্ষণে অনেকটা সকাল হয়ে এসেছে। একটু বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গোটা মাঠ ভরে যায় নারী-পুরুষের ভিড়ে। আজ একদঙ্গল বাচ্চাও এসেছে হঠাৎ। তারা কলকল করতে করতে ছোটাছুটি করছে গোটা মাঠ। লাল-নীল-সবুজ সোয়েটারে ভারী চমৎকার দেখাচ্ছে তাদের। শীতকাল হল সাজের সময়। রঙিন সোয়াটারে-কার্ডিগানে-চাদরে সমস্ত মানুষই এই সময়ে বড় সুন্দর হয়ে ওঠে। সে দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে থাকলেও যেন চোখের আরাম।

এ সময় হঠাৎ কর্নেল দেখতে পেলেন সুরঞ্জনকে। তৎক্ষণাৎ হাত নেড়ে ডাকলেন, এই যে সুরঞ্জন, হাউ ডু ইউ ফিল নাউ?

সুরঞ্জন সামান্য হাঁপাচ্ছিল, আগের চেয়ে অনেক বেটার।

—দ্যাট'স রাইট, তোমার মুখচোখ আগের চেয়ে বেশ ফ্রেশ দেখাচ্ছে। তুমি হাঁটার সঙ্গে সঙ্গে একটু প্রাণায়াম অভ্যাস কর। ব্রিদিং এক্সারসাইজ।

সুরঞ্জন দাঁড়িয়ে পড়ল, সেটা কী রকম।

—হাঁটতে হাঁটতে বেশিক্ষণ ধরে শ্বাস নেওয়া অভ্যাস করতে হবে। ছাড়তেও হবে দেরি করে। ধর, প্রথমে তিন স্টেপে শ্বাস টানবে, কিন্তু ছাড়বে চার স্টেপে।

সুরঞ্জন থতমত খেল, অতক্ষণ কি দম রাখতে পারব?

—প্রথম প্রথম পারবে না। একবার-দুবার করেই হাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু অভ্যাসটা রোজ চালিয়ে যেতে হবে, পনেরো দিন কি এক মাস পরে দেখবে, আস্তে আস্তে পারছ। শ্বাস নেবে এক, দুই তিন। ছাড়বে, এক, দুই, তিন, চার। এতে অভ্যস্ত হয়ে গেল সময় বাড়াতে হবে ক্রমে। চার স্টেপে শ্বাস নেবে, ছাড়বে ছয় স্টেপে—

—দাঁড়ান দাঁড়ান। আগে প্রথমটা পারি কিনা দেখি।

—নিশ্চয়ই পারবে। মানুষের মনের জোর হল আসল জোর, মনের জোর থেকে শরীরের জোর আসে। মনই কন্ট্রোল করছে আমাদের সমস্ত চেতনা, শরীর, সাহস,

বুদ্ধি সব। মনের জোরেই মানুষ ইংলিশ চ্যানেল পেরোতে পারে। জয় করতে পারে এভারেস্টশৃঙ্গ। সফল হতে পারে জীবনে।

সুরঞ্জন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে কর্নেলের মুখের দিকে। এমন চমৎকার ভঙ্গিতে কথাগুলো বলেন কর্নেল, এত কনফিডেন্টলি যে, সত্যিই মনের জোর যেন বেড়ে যাচ্ছে তার। জোর বাড়ে শরীরেও।

—বুঝলে সুরঞ্জন, বত্রিশ-তেত্রিশ বছর বয়সে হঠাৎ একটা ভীষণ শক পেয়ে আমার নার্ভাস-ব্রেকডাউন হয়। মনে হয়েছিল, আর কোনও দিন সুস্থ হয়ে আর্মির চাকরিতে ফিরে যেতে পারব না। সারাক্ষণ বিছানায় শুয়ে থাকতাম। আর ডাক্তারের প্রেসক্রাইব্ করা মুঠো মুঠো ট্যাবলেট আর বোতল বোতল টনিক খেতাম। কিন্তু দু-তিন মাসের মধ্যেও কোনও ইমপ্রুভমেন্ট হল না। বিছানা থেকে নামতে গেলেই মনে হত মাথা ঘুরে যাবে। পা থরথর করে কাঁপত। ডাক্তার যতই বলেন, চেষ্টা করুন, নিশ্চয় পারবেন। আমি পারতাম না। তারপর একদিন এক ব্রিগেডিয়ার দেখতে এলেন আমাকে। পঞ্জাবি ভদ্রলোক, খুব স্ট্রং অ্যান্ড স্টাউট ফিগার। গলার স্বরটাই এমন চমৎকার যে, মনে হয় ঈশ্বর-প্রেরিত কোনও দেবদূত এসে আমার বিছানায় বসলেন। বললেন, কী হয়েছে তোমার? সব বললাম তাঁকে। শুনেটুনে তিনি বললেন, তোমার কোনও অসুখ নেই। দিস্ ইজ কল্ড্ নার্ভাস-ব্রেকডাউন। তোমার এখন দরকার অটো-সাজেশন।

সুরঞ্জন শুনতে শুনতে অবাক হল, অটো-সাজেশন!

—হ্যাঁ। পঞ্জাবি ভদ্রলোক বললেন, রোজ রাতের বেলা ঠিক ঘুমোবার আগে ভাল-ভাল চিন্তা করবে। মনে জোর আনার কথা ভাববে। ভাববে, তুমি ক্রিকেট মাঠে নেমেছ। তোমার সামনে বল করতে আসছে আলেক বেড্সার, রে লিন্ডওয়াল, কিথ মিলার। আর তুমি পরের পর বাউন্ডারি মারছ। ওভার বাউন্ডারি মারছ। সেঞ্চুরির পর সেঞ্চুরি করে যাচ্ছ। কিংবা ভাববে, ফুটবলের মাঠে একের পর এক ডিফেন্স ভেদ করে বিপক্ষের জালে বল ঢোকাচ্ছ। সবাই তোমাকে হাততালি দিচ্ছে, চিয়ার আপ করছে। বড়বড় ট্রফি তুলে দেওয়া হচ্ছে তোমার হাতে। কিংবা ভাবো, আর্মিতে দারুণ কৃতিত্ব দেখানোর জন্য তোমার হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে রাষ্ট্রপতির পদক। দেখবে, রাতে ঘুমের ঘোরেও এমন চমৎকার সব স্বপ্ন দেখছ। তাতে ভিতরে ভিতরে বেড়ে যাচ্ছে মনের জোর। ভোরে উঠে ঘুম ভেঙে দেখবে, আগের দিনের চেয়ে শরীরের জোরও বেড়ে গেছে কিছুটা—

—বাহ্, সুরঞ্জনের চোখেমুখে যেন এক অন্য উত্তেজনা, তা এতে ফল পেলেন?

—খুব দ্রুত। মাসখানেকের মধ্যেই মনে হল আমি এক অন্য মানুষ। আমি তখন

ইচ্ছে করলে বিপক্ষ দেশের শিবিরে গিয়ে বোম্বিং করে চলে আসতে পারি। তারপর তো আরও পঁয়তাল্লিশ বছর পার করে দিলাম। স্টিল আয়্যাম ইয়াং।

সুরঞ্জন কর্নেলের প্রায় ছ-ফুট দীর্ঘ চেহারাটার দিকে তাকিয়ে মনে মনে ঘাড় নাড়ল। হ্যাঁ, কর্নেল তা বলতে পারেন বটে। এখনও যে রকম ঋজু শরীর নিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটেন—

কর্নেল অতঃপর বললেন, কই, মনোজিৎ তো এখনও এল না—

সুরঞ্জনের খুব কাছেই মনোজিৎ রায়ের বাড়ি। বলল, মনোজিৎবাবু ব্যস্ত আছেন বোস-মাসিমাকে নিয়ে। কালও আবার খুব বাড়াবাড়ি হয়েছে। আসলে শীত পড়েছে তো। শীতে এ সব পেশেন্টের ভারী অসুবিধে হয়। আমি পরশু গিয়েছিলাম। তখনও অক্সিজেন লাগানো রয়েছে দেখে এসেছি। ডাক্তার এখন আঠারো ঘণ্টা অক্সিজেন লাগানোর কথা বলছেন। আসলে পেশেন্টের ফুসফুস নাকি এমন শ্রিঙ্ক করেছে যে, এখন সকালের দিকে ছাড়া বাকি সময়ই অক্সিজেন লাগছে। পেশেন্টও অক্সিজেন খুলতে ভয় পাচ্ছে।

—তাই নাকি! কর্নেল জিবে চুকচুক শব্দ করলেন, বেচারা।

—কিন্তু ওঁদের সেই ভাইপোর ব্যবহারে মনোজিৎবাবু খুব আপসেট। আমাদের পাড়া থেকে দুই ভদ্রলোককে পাঠানো হয়েছিল সেই ডাক্তার ভদ্রলোককে সব জানাতে। ইদানীং নাকি টেলিফোনও আর ধরছিলেন না। কী বিরাট বাড়ি ডাক্তারের। পয়সার কোনও অভাব নেই। অথচ এই দুই ভদ্রলোকের সঙ্গে কী খারাপ ব্যবহার করলেন ডাক্তার, তা ভাবতে পারবেন না।

—কী হয়েছিল?

—দুই ভদ্রলোক কলিংবেল টিপতেই ডাক্তার নীচে এসে বলেছেন, আমার কাকিমা মারা যাচ্ছে, তাতে আপনাদের এত মাথাব্যথা কেন? অনেকদিন তো ভদ্রমহিলা বাঁচলেন, নাউ লেট হার ডাই পিসফুলি।

—এ রকম বললেন ভদ্রলোক, নিজে ডাক্তার হয়ে?

অধ্যাপক খাসনবীশ সব শুনছিলেন একমনে। এতক্ষণে মন্তব্য করলেন, জীবনটা এই রকমই কর্নেল। নিজের ছেলেরাই মা-বাবাকে দেখতে চায় না। এ তো ভাইপো।

কর্নেল হঠাৎ কেমন উদাস হয়ে গেলেন। তাঁর বড়ছেলে অমলেশ প্রায় মাসতিনেক পরে তাঁকে চিঠি দিয়েছে আমেরিকা থেকে, লিখেছে, তুমি একা একা কলকাতায় পড়ে আছ কেন? বাড়িটা ভাড়া দিয়ে অথবা কারও জিম্মায় রেখে পাততাড়ি গুটিয়ে এখানে চলে এস। এত বয়সে একা থাকা ঠিক নয়। আমার ছেলেমেয়েরা তার দাদুকে কাছ পেতে চাইছে। আপনার বউমাও বলেছে, বাবা কেন

একা থাকবেন। ওঁর কত কষ্ট হচ্ছে ওখানে।

চিঠিটা পড়েছেন কর্নেল, আর মনে মনে হেসেছেন। যতদিন দূরে-দূরে থাকা যায়, ততদিনই সম্পর্ক ভাল থাকে। কাছে গেলেই তখন মনে হবে, ঠিকমতো দেখভাল করছে না ওরা। হয়তো খুঁটিনাটি ক্ষোভ জমে উঠবে দু-তরফেই। ওরা মুখে বলতে পারবে না, মনে মনে ভাববে, বৃদ্ধবয়সের বাবা নয় তো একটা বোঝা। তার চেয়ে এই দূরে থাকাই ভাল। মাঝেমধ্যে দু-একটা চিঠি লিখবে, বারবার করে যেতে বলবে, উনি তার উত্তরে লিখবেন, ভালমত কাউকে পেলে তার জিম্মায় বাড়িটা রেখে তারপর যাবেন। এরকমই চলুক বাকি জীবনটা।

তা ছাড়া এতকাল কলকাতা থাকতে থাকতে এই শতচ্ছিন্ন পুরনো শহরটার উপর কেমন একটা মায়া পড়ে গেছে। এত লোডশেডিং, এত ট্রাফিক জ্যাম, এত পলিউশন, তবু কলকাতার পথঘাট, ঘরবাড়ি, কোলাহল ছেড়ে আমেরিকার একটা অচেনা শহরে গিয়ে থাকলে হাঁপিয়ে উঠবেন না! তা ছাড়া ভোরবেলা এই ম্যাকসাহেবের মাঠের টানই বা কম কী। তাঁর এখানে অনেক শুভার্থী, বন্ধু, অনেক ছেলেমেয়ে, নাতি-নাতনি। সবাই তাঁর খোঁজখবর নেয়, ভালবাসে, পৃথিবীকে ভালবাসতে জানলে গোটা পৃথিবীই একদিন আপন হয়ে যায়।

অধ্যাপক খাসনবীশের পাশাপাশি হাঁটছিলেন কর্নেল, হঠাৎ নজর পড়ল চাঁপার দিকে। চাঁপা এতক্ষণে ফাদার ম্যাকডোনাল্ডের সমাধিতে ফুল দিয়ে ফিরে যাচ্ছে ডায়মণ্ডহারবার রোডের দিকে। রাস্তা পার হয়ে চলে যাবে তাদের অর্ফানেজে। নান্ ক্যাথারিনকে গিয়ে বলবে, ফুল দিয়ে এসেছি। শুনতে শুনতে নানের অসুস্থ মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে একটু। হয়তো চোখের কোণে একফোঁটা জলও। চাঁপা তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দেবে একটু-একটু।

আজ উজ্জ্বল হলুদরঙের একটা শাড়ি পরেছে চাঁপা। উইলিয়াম ভারী ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন ওর বিয়ের জন্য। সেই কবে ওকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এই অর্ফানেজে এনেছিলেন ফাদার ম্যাকডোনাল্ড। সে অনেকদিন আগের কথা। সেদিন ফাদার গিয়েছিলেন আমতলার দিকে। ওখানকার নার্সারি থেকে ফুলের গাছ, পাতাবাহারের গাছ, ক্যাকটাস আনতেন প্রায়ই। সেদিনও গাড়িতে টব বোঝাই করে ফিরছিলেন নিজেই ড্রাইভ করে। সে এমনই একটা শীতকালের দিন ছিল। গাড়ি চালাতে চালাতে হঠাৎ কেন যেন ব্রেক কষলেন রাস্তার মাঝখানে। একটি শিশুর কান্না কানে গিয়েছিল তাঁর। নেমে দেখলেন, একটা চাঁপাফুলের গাছের গোড়ায় পড়ে আছে ছ-আট মাসের একটি শিশুকন্যা। একেবারে খালি গায়। হি হি করে কাঁপছে শীতে। এমন নির্জীব, এতই রুগ্ণ যে, কান্নার শব্দও তেমন জোরে বেরুচ্ছে না। সেই ছোট্ট শিশুটিকে

তোয়ালে দিয়ে জড়িয়ে তুলে নিয়ে এসেছিলেন তাঁর বাংলোয়। নিজের হাতে সেবা-শুশ্রূষা করে বাঁচিয়ে তুলেছিলেন ক'দিনেই। তারপর থেকেই রয়ে গেছে অনাথ আশ্রমে। ম্যাকডোনাল্ড সাহেব আর নেই। কিন্তু তাঁর পালিত সন্তানটি বেড়ে উঠেছে এতখানি।

ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন কর্নেল। হঠাৎ সম্বিত ফিরল অধ্যাপক খাসনবীশের কথায়। খাসনবীশ বললেন, ফাদার উইলিয়াম বলছিলেন, এবার বড়দিনে খুব ঘটা করে ক্রিসমাস ডে পালন করবেন। আমাদের সবাইকে আসতে হবে।

কর্নেল খুশি হলেন, ও সিওর। অনেকদিন আগে আরও একবার আমরা অনেকে দল বেঁধে সন্ধের সময় ক্রিসমাসে এসেছিলাম। আপনার মনে নেই?

—হ্যাঁ। তখন তো ফাদার ম্যাকডোনাল্ড বেঁচেছিলেন। উনি মারা যাওয়ার পর আর কখনও জাঁকজমক করে বড়দিন হয়নি এখানে।

রাউন্ড দিতে দিতে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল দেবাশিস দত্ত আর বিদ্যুৎ চ্যাটার্জির সঙ্গে। যথারীতি দুজনে রাজনীতির আলোচনায় মত্ত হয়ে উত্তেজিত, ক্রুদ্ধ। আলোচনার মধ্যে ঘুরেফিরে আসছে প্রধানমন্ত্রী ভি পি সিং আর উপ-প্রধানমন্ত্রী দেবীলালের নাম। বিশাল কৃষক সম্মেলন করে দেবীলাল প্রধানমন্ত্রীকে দেখিয়ে দিতে চেয়েছেন তাঁর ক্ষমতা। আলোচনার মধ্যে কখনও ঢুকে পড়েছে বি জে পি-র নাম। হিন্দু-তাস খেলতে শুরু করেছেন আডবাণী, তাই নিয়ে গরমাগরম তর্ক। কর্নেল আর প্রফেসর হাঁ করে শুনলেন কিছুক্ষণ। তারপরে দুজনে হাসতে হাসতে এগুলেন কংক্রিটের বেঞ্চের দিকে। আজ অনেকগুলো রাউন্ড দিয়ে ফেলেছেন গল্প করতে করতে। তিতির তখনও বিশ্বজিতদের আখড়া থেকে ফেরেনি। হয়তো আরও নতুন নতুন কুইজ নিয়ে লড়াই হচ্ছে সৌপ্তিকের সঙ্গে। সেন্ট জেভিয়ার্সের তরুণ তুর্কীর সঙ্গে লড়ে যাচ্ছে জব্বলপুরের এক কিশোরী—এম পি কুইজ কুইন। কুইজের লড়াই উপভোগ করতে ভারী ভালবাসেন কর্নেলও।

ততক্ষণে কংক্রিটের বেঞ্চি ভরে উঠেছে প্রাতঃভ্রমণকারীদের ভিড়ে। কেউ চার, কেউ পাঁচ, কেউ ছ-রাউন্ড শেষ করে কয়েক মুহূর্ত বিশ্রাম নিচ্ছেন। ইয়ংম্যানরা এসে বসেছে তাদের এক্সারসাইজ সেরে। তিন-চার জন কিশোরী অনেকক্ষণ থেকে স্কিপিং করছিল, তারাও এখন বেঞ্চিতে বসে স্কুলের কথা আলোচনা করছে।

ঠিক এমনই মুহূর্তে হঠাৎ দূর থেকে রাস্তার দিকে কী যেন দেখে উঠে দাঁড়ালেন কর্নেল। এক দীর্ঘদেহী ভদ্রলোক লাঠিতে ভর করে খুব ধীরে এগিয়ে আসছেন মাঠের দিকে। সেদিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে হঠাৎ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন তিনি। এ কে!

এ তো নীলেশ ব্রহ্মচারী!

কিন্তু এ কোন নীলেশ ব্রহ্মচারী! তাঁকে দেখে উঠে দাঁড়িয়েছেন অধ্যাপক খাসনবীশও। তিনিও ব্রহ্মচারীসাহেবকে দেখে রুদ্ধশ্বাস, বিস্মিত, উৎকণ্ঠিত।

মাঝে-মাঝেই তাঁরা দেখতে যেতেন ব্রহ্মচারীসাহেবকে। কিন্তু এতদিন নীলেশ ব্রহ্মচারী বিছানায় শুয়ে থাকতেন বলে ঠিক বোঝা যেত না। ডানহাতখানা অবশ লাগে বলতেন। এখন কর্নেল অবাক হয়ে দেখলেন, শুধু যে ডানহাতখানা অবশভাবে ঝুলছে তা নয়, ডানপা-টাও প্রায় প্যারালাইজ্‌ড্‌। কোনওক্রমে টুকটুক করে হেঁটে আসছেন লাঠিতে ভর করে। কংক্রিটের বেঞ্চের কাছে এগিয়ে এসে ম্লানভাবে হাসার চেষ্টা করলেন এককালের দোর্দণ্ডপ্রতাপ ব্যারিস্টার। মাসখানেক আগে হঠাৎ ম্যাসিভ্‌ অ্যাটাকে—

কর্নেল ব্যস্ত হয়ে তাঁকে হাত ধরে টেনে এনে বসালেন পাশে, আরে, ব্যারিস্টার, আপনি হঠাৎ এই অবস্থায় মাঠে আসতে গেলেন কেন?

ব্রহ্মচারীসাহেব হাসলেন, আর ঘরের মধ্যে বন্দি হয়ে থাকতে পারছি নে। কতদিন হয়ে গেল এখানে আসিনি।

—কিন্তু ডাক্তারের সঙ্গে কনসাল্ট করেছেন?

—হ্যাঁ। ডাক্তার অবশ্য বলেছেন, বাড়ির সামনে হাঁটাচলা করতে, একটু-একটু হাঁটলে তবেই হাত-পায়ের অবশ ভাবটা কেটে যাবে আস্তে আস্তে।

কর্নেল তখনও তাঁর বিস্ময় কাটাতে পারছেন না। ম্যাসিভ্‌ অ্যাটাক থেকে এ যাত্রা জোর বেঁচে গেছেন নীলেশ ব্রহ্মচারী। কিন্তু তাঁর শরীরের সর্বত্র রেখে গেছে অসুখের ক্ষতচিহ্ন। এমনকী কথা বলার সময়ও বোঝা যাচ্ছে, তাঁর মুখের ডানদিকের কিছু অংশ প্যারালাইজ্‌ড্‌। আড়িয়ে যাচ্ছে কথা।

মনে মনে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন কর্নেল। কদিন আগেও ব্রহ্মচারীসাহেব দীর্ঘ ঋজু শরীর নিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে তাঁর পাশে-পাশে হেঁটেছেন, গল্প করেছেন, ছোট ছোট রসিকতা করে অট্টহাস্য করেছেন অনায়াসে। হঠাৎ ব্যাধির প্রকোপে সেই বিশাল শরীর এখন একটা ধ্বংসস্তূপ।

ব্রহ্মচারীসাহেব বললেন, আর কতদিনকার অব্যেস! ভোর হলেই শরীরটা কেমন আনচান করতে থাকে। মর্নিং-ওয়াকও এক ধরনের নেশা, কর্নেল। বিছানায় শুয়ে আছি, আর শুধুই মনে হচ্ছে ম্যাকসাহেবের মাঠে না গেলে আমি আর সুস্থ হব না।

কর্নেল খুশি হয়ে বললেন, তাহলে ঠিকই করেছেন, ব্যারিস্টার। রোজ একটু-একটু করে আপনাকে সুস্থ করে তুলব আমরা। মনের আরাম হলেই শরীরের আরাম হবে। অসুখ নিয়ে বেশি ভাববেন না। সেভেনটি সেভেন তো ক্রশ করেছেন। মানুষের

জীবনে মৃত্যু যখন ইনএভিটেব্ল্, তখন ও নিয়ে বেশি না ভাবাই ভাল। রেসট্রিক্টেড ডায়েট খাবেন, সারাদিন খুশিমনে থাকবেন, ভোরে বেড়াতে বোরোবেন, দেখবেন কদিনেই চাঙ্গা হয়ে উঠবেন।

অধ্যাপক খাসনবীশ বললেন, আপনি নেই বলে ভীষণ ফাঁকা লাগত আমাদের। আজ আমাদেরও একটু খুশির দিন।

অনেকদিন পরে তিন বন্ধু আবার পাশাপাশি বসে বহুদিনের জমানো গল্প প্রাণ খুলে বলাবলি করতে লাগলেন। মাঠের অনেকেই ব্রহ্মচারীসাহেবকে শুভকামনা জানিয়ে গেলেন। যেন তাঁদের একজন হারানো বন্ধু আবার ফিরে এসেছেন তাঁদের মধ্যে।

আস্তে আস্তে ভোরের সাদা চাদর ফুঁড়ে একটু একটু রোদের কণা ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। দু-একজন করে প্রাতঃভ্রমণকারীরা ফিরতে থাকেন বাড়ির দিকে। কর্নেলরাও উঠব-উঠব করছেন, হঠাৎ হন্তদন্ত হয়ে হাজির হলেন মনোজিৎ রায়। এসে আর একটা দুঃসংবাদ দিলেন তাঁদের, কাল সন্ধেবেলা মারা গিয়েছেন বোস-মাসিমা। প্রচুর চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু বাঁচানো গেল না। পাড়ার ছেলেদের নিয়ে গিয়েছিলেন শ্মশানে। দাহ করে ফিরেছেন রাত একটা নাগাদ। তারপর খানিকক্ষণ থম্ হয়ে থেকে বললেন, আসুন, আমরা সবাই তাঁর মৃত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আজ দু-মিনিট নীরবতা পালন করি!

ঠিক কুড়িটা নাগাদ বোম্বে মেল ভায়া এলাহাবাদ ছাড়ে। রেলওয়ের কুড়িটা মানে রাত আটটা। তাই ভোরে আপাতত শেষবারের মতো তিতির কর্নেলের হাত ধরে ম্যাকসাহেবের মাঠে বেড়াতে এল। গত কয়েকদিন সৌপ্তিকের সঙ্গে কুইজ খেলে সেও আপাতত এক নেশার আবর্তে। একটা সমুদ্র-নীল রঙের চুড়িদার পরেছে সে। তার উপর ডিপ-ব্লু রঙের কার্ডিগান। তার সঙ্গে হালকা নীল রঙের ওড়না বেঁধেছে মাথায়, অনেকটা ঘোমটার ধরনে। তাতে একটু অবাঙালি দেখাচ্ছে তাকে। জন্মাবধি জব্বলপুরে থেকে এখন তো সে অনেকটা অবাঙালিই। বাংলা পড়তে শেখেনি, লিখতেও নয়।

কাল সৌপ্তিক তাকে একটা সোজা প্রশ্ন করে বেশ ঘাবড়ে দিয়েছে। মাঠে তো বলতে পারেইনি, বিকেলে দাদুর লাইব্রেরিতে বসে এনসাইক্লোপিডিয়া ঘাঁটতে হয়েছে তাকে। প্রশ্নটা ছিল, ফোটোগ্রাফি শব্দটা কোন ভাষা থেকে নেওয়া হয়েছে, সেই ভাষায় ফোটোগ্রাফি শব্দের আদত মানে কী।

খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে গেল হঠাৎ। এটা যে আসলে গ্রিকভাষা তা সে জানতই

না। গ্রিকভাষায় ফোটোগ্রাফি শব্দের মানে 'আলো দিয়ে লেখা'।

'আলো দিয়ে লেখা' ব্যাপারটা কাল থেকে অনেকবার ভাবিয়েছে তাকে। সত্যিই, আইডিয়াটা কী চমৎকার। সৌপ্তিক হঠাৎ কাল বলেছিল, তোমার একটা ফোটো আমাকে দিয়ে যাবে তিতির?

তিতির হকচকিয়ে গিয়েছিল হঠাৎ, কেন?

—না, মানে প্রিয়জনের ছবি জমানো আমার অনেকদিনের অভ্যেস। তিতির হেসে বলেছিল, আমি কি তোমার প্রিয়জন?

—কেন, তোমার কি কোনও আপত্তি আছে তাতে?

তিতির গম্ভীর হয়ে বলেছিল, আমি তো মৌসুমি পাখি, কদিনের জন্যে এসেছি, আবার সময় ফুরোলে উড়ে চলে যাব একসময়। ফোটো রাখলে তাতে শুধু মায়াই বাড়বে। বরং বল তো, 'আর্চি' কমিক স্ট্রিপ কে লিখেছে?

এমন হাজারো প্রশ্ন গত কয়েকদিন ধরে তিতির সমানে করেছে সৌপ্তিককে। সেন্টজেভিয়ার্সে পড়া এই থার্ড ইয়ারের ছাত্রটির সঙ্গে ক্লাস নাইনের তিতিরের তুল্যমূল্য লড়াই হয়েছে এ কদিন। ক্লাসের ব্যবধান যাই হোক, উনিশবছরের সৌপ্তিককে প্রায়শ রেইন করেছে পনেরোবছরের তিতির। মেয়েরা যেমন করে থাকে আর কী। সৌপ্তিক দেখতে সুন্দর, কচি-কচি গোঁফ-দাড়িতে ভরা সরল, সাদাসিধে মুখখানা অনেকটা যিশুর মতো দেখায়। সরল, কিন্তু ব্রিলিয়ান্ট। মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক দুটোতেই স্টার পেয়েছিল। অনার্সেও ফার্স্টক্লাস পাবে নিশ্চিত। কিন্তু সৌপ্তিকের পরনে সাধারণ জামা-প্যান্ট। জামার উপর সামান্য ছেঁড়া হাফ-সোয়েটারটি দেখেই বোঝা যায়, তার মুখে রূপোর চামচ নেই। সে গ্রামের ছেলে, কলেজে পড়তে শহরে এসেছে, থাকে তার এক সম্পর্কিত জ্যাঠামশায়ের বাড়িতে। আর পরের বাড়িতে থেকে লেখাপড়া করলে যা হয়, সৌপ্তিকের ভেতরে কোথাও একটু সঙ্কোচ, একটু আড়ষ্টতাও। তিতিরের সঙ্গে কথা বলতেও বোধহয় তাই-ই।

তবু কুইজের খেলাটা তিতিরের ভারি প্রিয়। কুইজের দোসর পেলে সে তৎক্ষণাৎ তার সঙ্গে প্রশ্নের কাটাকুটি খেলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। জব্বলপুরে তার কুইজের দোসর হল, শোভা দীক্ষিত নামের এক কিশোরী। সারাক্ষণ কিছু-না-কিছু প্রশ্ন তারা করেই চলেছে। যত প্রশ্নোত্তরপর্ব চালানো যাবে, ততই মাথার ঘিলু আরও পরিষ্কার হবে। আরও একটু স্পষ্ট দেখাবে চোখমুখ।

কলকাতায় এসেও তাই সৌপ্তিকের সঙ্গে তার এই কুইজ-কুইজ খেলা। বল তো সৌপ্তিকদা, শেক্সপীয়ারের কোন নাটকে একটা কুকুরের আবির্ভাব ঘটেছে? অমনি সৌপ্তিক হাসি-হাসি মুখে উত্তর দিয়েছে, কে না জানে এটা—টু জেন্টলমেন অব্

ভেরোনা। বল তো সৌপ্তিকদা, কে বলেছিলেন বেটার টু রেইন ইন হেল দ্যান সার্ভ ইন হেভেন? সৌপ্তিক বলেছে, এটা তো আরও সোজা—মিলটনের প্যারাডাইস লস্টে শয়তান বলেছিল। বল তো সৌপ্তিকদা, লর্ড বিষ্ণুর মায়ের নাম কী? সৌপ্তিকের তাৎক্ষণিক উত্তর, অদিতি। তাহলে এবার বল তো, দেবনাগরী স্ক্রিপ্ট ভারতের কোন তিনটি ভাষায় ব্যবহৃত হয়।—এও তো খুব সোজা, সংস্কৃত, হিন্দি আর মারাঠি।

তাহলে এবার বল, 'অ্যাটমিক বম্ব' শব্দটা প্রথম কে ব্যবহার করেছিলেন।

—এইচ জি ওয়েল্‌স্‌, তাঁর লেখা সায়েন্স ফিকশন—দ্য লিবারেটেড ওয়ার্ল্ড-এ, সৌপ্তিকের জবাব।

তিতির এবার আরও কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, বল তো, কোন পাখির ঠোঁট নাগারা তাদের হেলমেটে ব্যবহার করে?

সৌপ্তিক হঠাৎ সামান্য বিব্রত বোধ করে, দাঁড়াও, দাঁড়াও, ভুলে যাচ্ছি। এই সেদিন পড়লাম, কী যেন, কী যেন, হ্যাঁ মনে পড়েছে, হর্নবিল।

—গুড্‌। তিতির যেন সৌপ্তিকের পরীক্ষার খাতায় ফুল মার্কস্‌ দেয়, ঠিক আছে, ভারতের কোন নোবেলপুরস্কারপ্রাপক পুরস্কার নিতে গিয়ে বলেছিলেন, আমি পুরস্কার নিচ্ছি নিজের জন্য নয়, আমার দেশের জন্য, আর আমার যে সহকর্মীরা জেলে রয়েছে তাদের জন্য।

—এটা তো আরও সোজা, সি ভি রমন।

এই প্রশ্নোত্তরপর্বের সময় তাদের দুজনের চারপাশে ঘিরে থাকে সৌপ্তিকের অন্য বন্ধুবান্ধবরা। রীতেশ, নিলয়, প্রদীপ, দেবাঞ্জন। থাকে এদের ব্যায়ামগুরু বিশ্বজিৎ। ভোর-ভোর এসে কেউ ব্যায়াম সেরে নেয়। কেউ দু-তিন রাউণ্ড দৌড়ে এসে সতেজ করে তোলে শরীর। কেউ পনেরো-কুড়ি মিনিট শীর্ষাসন করে মগজটা সাফসুফ করে নেয়। তারপর তিতির মাঠে এসে পৌঁছতেই শুরু হয় এক রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনা। একজন কুইজ-মাস্টার, অন্যজন কুইজ-কুইন। একজন এ রাজ্যের প্রতিনিধি, অন্যজন ভিনরাজ্য থেকে এসেছে। এ লড়াইয়ে কে জেতে, তার উপর যেন নির্ভর করছে সম্মানের প্রশ্ন। তখন উনিশের সঙ্গে পনেরোর লড়াই নয়, বেঙ্গল ভার্সাস এম পি। সৌপ্তিক জবাবগুলো দিতে পারলে মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে রীতেশ, নিলয়, প্রদীপ, দেবাঞ্জনের। বিশ্বজিৎ বলে ওঠে, দারুণ দিয়েছিস সৌপ্তিক, এবার তোর পালা। এম পি-র কুইজ-কুইনকে আউট করে দেয়া চাই-ই।

তিতিরের বুকের ভেতর তখন একটা রেলগাড়ি চলতে থাকে। সেন্ট জেভিয়ার্সের ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র কী প্রশ্ন করবে তা বুঝে উঠতে পারে না। তার সব

প্রশ্নেরই উত্তর দিয়েছে সৌপ্তিক, একটাও ফেল করেনি। পঁচিশে পঁচিশ পেয়েছে, ফুল মার্কস, যেভাবে সে তার পরীক্ষায় পায়। ইস্, কেন যে আরও কঠিন-কঠিন প্রশ্ন করল না তিতির! অন্তত একটা-দুটোও যদি বেধে যেত! তাহলে অন্তত কিছুটা মুখরক্ষা হত। এখন সে যদি সৌপ্তিকের প্রশ্নের জবাব দিতে না পারে! যদি একটাও না পারে! তাহলে কী হবে?

সৌপ্তিক তখন তার নিজের গভীরে প্রবেশ করছে। সবকটা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারার আনন্দে ঝলমল করছে তার উনিশবছরের শরীর। এতক্ষণে ভাল করে তাকাতে পারছে তিতিরের দিকে। ক্লাস নাইনের কিশোরীটির উজ্জ্বল চোখমুখের দিকে তাকালে আজকাল তার মনটা কেমন ভাল হয়ে যায়। সে কখনও কো-এডুকেশন স্কুলে পড়েনি। কলেজেও কো-এডুকেশন নয়। তার বন্ধুরা যখন প্রেসিডেন্সিতে অ্যাড্‌মিশন নিয়ে মেয়েদের সঙ্গে একসঙ্গে পড়তে পারবে বলে আনন্দে ডগমগ করছে, তখন সে ভর্তি হয়েছে সেন্ট জেভিয়ার্সে। সেখানে ফাদাররা পড়ান। মেয়েরা ত্রিসীমানায় ঢুকতে পারে না সে কলেজে। ঠিক এমনই সময় হঠাৎ তিতিরের সঙ্গে আলাপ হওয়াতে তার মনে হল, মেয়েরা একজন পুরুষের জীবনে অনেককিছু। এনে দিতে পারে প্রেরণা, বুদ্ধি, সাহস। যখন সে কেবল পড়েই যাচ্ছিল তার বইয়ের পড়া, কুইজ-কনটেস্টের বই, সে সময় হঠাৎ জীবনের অন্য এক দ্বীপে এসে পৌঁছল যেন। তার চেয়ে বয়সে একটু ছোট এক কিশোরীর সঙ্গে কদিন ধরে তার লড়াই চলছে—মগজের লড়াই। কদিন চেষ্টা করে কিছুতেই হারাতে পারছে না মেয়েটাকে। আজও সে কিছুক্ষণ ভাবল চোখ বুজে। কুইজ-কনটেস্টের বইয়ের পাতাগুলো স্মরণে আনার চেষ্টা করল। কিন্তু কোন প্রশ্নে হারানো যায় তিতিরকে! এম পি স্টেটের কুইজ-কুইনকে হতবাক করে দেওয়া যাবে এক গভীরতর কূটপ্রশ্নে সামিল করে!

—বল তো তিতির, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আইনস্টাইন একবার একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন : অভিনন্দন, মানবজাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। পরে আরও জানাচ্ছি। আপনার একান্ত অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। কাকে পাঠানো হয়েছিল টেলিগ্রামটি।

তিতিরের তৎক্ষণাৎ উত্তর, কাকে আবার। অক্টোবর বিপ্লবের সাফল্যে লেনিনকে পাঠিয়েছিলেন টেলিগ্রামটা।

—বল তো তিতির, 'হ্যামলেট' শেক্সপীয়ারের লেখা একটি বিখ্যাত নাটক। কিন্তু ইংল্যান্ডের চলতি ভাষায় হ্যামলেট শব্দটির আরও একটি মানে আছে। কী সেই মানে?

—যে গ্রামে কোনও গির্জা নেই, তাকেই হ্যামলেট বলে।

—এবার বল তো, জেরুজালেম পোস্ট অফিসে প্রতিদিন কয়েক হাজার চিঠি পৌঁছয়, যেগুলো কখনও বিলি হয় না। কেন?

—কারণ ওগুলোর সবকটিই প্রভু যিশুর উদ্দেশে লেখা বলে।

—এবার বল তো, 'হনিমুন' শব্দটি কীভাবে উদ্ভূত হয়েছিল।

তিতির একটু হাসল এবার। সৌপ্তিক এর আগেও এমন কতকগুলো রোমান্টিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছে তাকে। সেদিনও বলেছিল, বল তো তিতির, কে বলেছিলেন, জার আলেকজান্ডার যদি মহিলা হতেন আমি তাকে বিয়ে করতাম। তিতির অবশ্য জবাব দিয়েছিল, নেপোলিয়ান বোনাপার্ট। আজও তেমনই উত্তর দিল, ইউরোপের প্রধান রীতিনীতি অনুযায়ী, যে-কোনও নব-বিবাহিত দম্পতিকে বিয়ের পর টানা তিরিশ দিন ধরে মধু পান করতে হত। তার থেকেই হনিমুন শব্দটা এসেছে।

—বল তো তিতির, কে বলেছিলেন, 'একমাত্র তিনিই কবি, বাকি সব বর্বর।' কার সম্পর্কেই বা বলা হয়েছিল?

তিতির একটুও না ঘাবড়ে বলল, কবি বায়রন এই প্রশংসাসূচক বাক্যটি ব্যবহার করেছিলেন স্যার আলেকজান্ডার পোপ সম্পর্কে।

সৌপ্তিক হেসে তিতিরকে পঁচিশে পঁচিশে দিল। ফুল মার্কস্। কিশোরীটিকে আজও হারাতে পারল না সে। শুধু বলল, ইউ হ্যাভ্ অ্যা ফোটোগ্রাফিক মেমারি। তুমি অসাধারণ—

তিতিরও কমপ্লিমেন্ট দিল তৎক্ষমাৎ, দাউ টু-উ-উ-উ

সৌপ্তিক হেসে ফেলল, কী? ব্রুটাস?

—নো, সৌপ্তিক। সৌপ্তিক স্যান্যাল।

সৌপ্তিকের সঙ্গে তিতিরের যখন কুইজ-যুদ্ধ চলে, তখন চারপাশে আরও কয়েকটি রুদ্ধশ্বাস মুখ। সৌপ্তিকের মতো তারাও এই সদ্যচেনা কিশোরীটিকে সম্ভ্রমের চোখে দেখে। তিতির ওদের সবারই কাছে এক অন্যরকম বিস্ময়। তার চাউনি, কথা-বলার রকম, সবই যেন অন্য এক বৃত্তের। তাতে কলকাতার কিশোরীদের সেই অহঙ্কার, দেমাক বা তুচ্ছ করে দেখার চাউনি নেই। তিতিরের চোখে আছে এক অন্য জগৎ, যা কলকাতার ছেলেদের কাছে অজানা। তার হিন্দি-বাংলায় মেশা এক অদ্ভুত বাক্‌ভঙ্গি, যেমন সে 'স্কুলে ছুটি শুরু হয়েছে' না বলে, বলে 'স্কুলে ছুটি লেগে গেছে'। কিংবা 'মফস্বলের বাস' না বলে, বলে 'গাঁও-এর বাস'। 'তাই না?' না বলে, বলে 'হ্যায় না?' তার সঙ্গে হিন্দি টোনটাই তাদের কাছে এক অদ্ভুত ভাল-লাগা।

আজ তিতির দেখল, মাঠ কিছুটা হালকা। বিশ্বজিৎ একটু আগেই কাবেরী আর চামেলিকে নিয়ে বেরিয়ে গেছে মাঠের বাইরে। নিলয়, প্রদীপ, ওরাও কেউ নেই। শুধু সৌপ্তিক একা অপেক্ষা করছে তার জন্যে। তিতির বলে উঠল, বাহ্, ওরা সবাই চলে গেল? আজ আমার এখানে শেষ দিন।

সৌপ্তিকের মুখ 'শেষ দিন' শুনে একটু অন্ধকার হল যেন। বলল, ভালই হয়েছে, তোমার সঙ্গে একটু বেশি কথা বলার সুযোগ পাব।

তিতিরও মনে মনে খুশি হল। সৌপ্তিকদার সঙ্গে তার কথাবার্তা হয় কেবলমাত্র কুইজের প্রশ্নে। তার বাইরে কথা বলার সুযোগই পায় না। আজ বলল, তুমি তাহলে আমার সঙ্গে কথা বলতে পারলে খুশি হও?

—কেন নয়? কুইজ-কুইনের সঙ্গে কথা বলার একটা আলাদা মজা আছে।

—কী রকম মজা। তিতির কৌতূহলী হয়।

সৌপ্তিক উদাস হয়ে বলে, তা জানি না। তবু এতদিন একরকম ছিল। আজ মনে হচ্ছে, বেশ তো ছিলাম একা-একা। হঠাৎ কেন যে তুমি কলকাতা বেড়াতে এলে!

—বাহ্, আমি কি নিজে থেকে এলাম! আসতে বাধ্য হলাম যে। নইলে সেল্‌ফ্-ইমোলেশনে সামিল হতে হত যে। আমাদের ক্লাসের রাপ্তী নামের একটা মেয়ে, থার্ড গার্ল, তার আগের দিনও আমার সঙ্গে ম্যাথ্‌স্ নিয়ে কতক্ষণ ডিসকাস করল, হঠাৎ দেখি গায়ে পেট্রল ছিটিয়ে—

সৌপ্তিক চোখে ভয় ঘনিয়ে বলল, পেট্রল কোথায় পেল?

—ওর ড্যাডির বাইক থেকে আগের রাতে চুরি করেছিল। কেউ একটুও বুঝতে পারেনি, হঠাৎ গায়ে এমন ফায়ার লাগিয়ে দেবে! ইট ওয়াজ অ্যা ডেঞ্জারাস সিন—

সৌপ্তিক তৎক্ষণাৎ প্রসঙ্গ বদলে ফেলল, তোমাকে কাল যে বলেছিলাম, তোমার একটা ফোটো আনতে। এনেছ?

তিতির হাসল, কেন, তোমারও তো ফোটাগ্রাফিক মেমারি। আমার মুখটা মনে থাকবে না?

সৌপ্তিক হঠাৎ ফিসফিস করে বলল, থাকবে। থাকবে। এ মুখ কি ভোলা যায়?

তিতির একটু গম্ভীর হল। তার বুকের ভেতর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসছিল, সেটা চেপে গিয়ে বলল, ইউ আর লায়িং। আমার মুখটা মোটেই দেখতে ভাল নয়।

—নিজের মুখ নিজে ভাল চেনা যায় না। আয়না সবসময়ই আমাদের ভুল প্রতিকৃতি দেখায়। তোমাকে দারুণ দেখতে।

—যাহ্, তিতির সৌপ্তিকের দিকে তাকায়, তার চোখ ঘন হয়ে আসে।

—ঠিক কীরকম দেখতে বলব? অনেকটা আভা গার্ডনারের মতো। আভা গার্ডনার খুব সমুদ্র ভালবাসতেন। সমুদ্রের সঙ্গে রং মিলিয়ে পোশাক পরতে ভালবাসতেন। তুমিও আজ ঠিক একটুক্‌রো সমুদ্র হয়ে আমার কাছে এসেছ।

তিতির আবার বলল, ইউ আর লায়িং। ছেলেরা ভীষণ মিথ্যেকথা বলে। চোখের বাইরে গেলে ভুলে যায়। আউট অব্‌ সাইট আউট অব্‌ মাইন্ড। ছেলেদের আমার চেনা আছে।

—তুমি আরও অনেক ছেলেকে দেখেছ বুঝি?

—না, এই একটাই দেখলাম। তিতির ফিসফিস করে বলল, অ্যান্ড ইউ আর দ্য লাস্ট।

সৌপ্তিক হঠাৎ চুপ করে গেল। তার সমস্ত শরীরে যেন তখন খেলে যাচ্ছে একটা অদ্ভুত শিহরণ। তার হঠাৎ মনে হল সে জয় করে ফেলেছে সমস্ত বিশ্ব। তার হাতের মুঠোয় উঠে এসেছে পৃথিবীর না-জানা কঠিনতম কুইজটি। কুইজ-কুইন। সে এখন এই পৃথিবীর রাজা। অ্যায়াম দ্য লর্ড অফ অল আই সি—

দুজনে মাঠের চারপাশে ট্র্যাক-বরাবর হেঁটে চলেছে। হাঁটছে তো হাঁটছেই। তিতির এক-একবার চোখ তুলে দেখে নিচ্ছে, তার দাদুরা তাদের হাঁটার পথ অনুসরণ করছে কি না। কদিন ধরে ব্রহ্মচারীদাদু ধীরপায়ে লাঠিতে ভর করে ভোরের হাওয়ার টানে টানে আসছেন। তাঁকে নিয়ে ব্যস্ত আছেন ওঁরা। ওঁদের একটু চোখের আড়াল হতেই তিতির পোশাকের ভাঁজ থেকে বার করল তার একটা ফোটো। তাদের স্টেট-লেভেল কুইজ-কনটেস্টের ফাইনালের দিন তোলা। কনটেস্টে প্রথম হওয়া তিনজন। সে, শোভা আর অবিনাশ।

সৌপ্তিক ফোটোগ্রাফি হাতে পেতে গভীরভাবে দেখল তিনজনকে। তার মুখের আলো নিভে গিয়ে হঠাৎ যেন একটু মেঘের আলোছায়া। গম্ভীর হয়ে বলল, এ ছেলেটা কে?

—ও তো আমাদের টিমে ছিল। অবিনাশ জৈন।

সৌপ্তিকের বুকের ভেতর কোথাও যেন ব্যথা চিনচিন করে উঠল, ও কি তোমার পার্টনার?

তিতির অদ্ভুতভাবে হাসল, তুমি কি জেলাস হচ্ছ?

সৌপ্তিকের আর তর সইছিল না, একটু ভাঙা গলায় বলল, বল না, ও কি তোমার কুইজের পার্টনার?

—ও আমার পার্টনার নয়। শোভার। শোভা দীক্ষিত আর অবিনাশ জৈন। সৌপ্তিক ভাল করে তাকাল তিতিরের মুখের দিকে। বোধহয় নিশ্চিন্ত হতে চাইল।

খুব আস্তে আস্তে বলল, ট্রু লাভার্স আর অলওয়েজ জেলাস।

তিতির ততক্ষণে লক্ষ করে দেখছে, তার দাদুরা তিনজনে উঠে পড়েছেন কংক্রিটের বেঞ্চ থেকে। বাড়ি ফেরার তোড়জোড় করছেন। তাকাচ্ছেন তিতিরের দিকে। তিতির বলে উঠল, তাহলে আমি যাই?

সৌপ্তিকের চোখ জ্বালা করে উঠল হঠাৎ। তার হাসি-হাসি, সরল, প্রায় যিশুর মতো দেখতে মুখখানায় ছায়া ঘনিয়ে আসে অকস্মাৎ, ধরা গলায় বলে উঠল, তুমি আবার কবে আসবে?

তিতির মুখে হাসি ধরে রাখার চেষ্টা করছিল, বলল, একমাত্র ঈশ্বর জানেন।

—ঈশ্বর তো অনেক কিছু জানেন, পৃথিবীর যাবতীয় কুইজ তো তাঁর নখদর্পণে। কিন্তু তাতে তো আমার জানা হল না। সামনের সামার ভ্যাকেশনে তোমাকে আসতেই হবে—

তিতিরের শরীরের ভেতরটা কেমন যেন করছিল। তার চোখ ফেটে জল আসছিল। সামার ভ্যাকেশনে সে আসতে পারবে কি না জানে না। তার বড়মামা আমেরিকা থেকে চিঠি লিখেছেন, দাদুকে ওখানে চলে যাওয়ার জন্য। দাদু চুপচাপ চিঠিখানা পড়েছেন, কিছু বলেননি মুখে। যদি দাদু সত্যিই কলকাতা ছেড়ে চলে যান আমেরিকায়, তবে সে কলকাতা এসে কার কাছেই বা থাকবে। তাহলে কি সৌপ্তিকের সঙ্গে তার আর দেখা হবে না?

সমস্ত শরীর ভেঙে কান্না উপছে আসছিল তিতিরের। ঠোঁটদুটো কাঁপছিল থরথর করে। সে বুঝতে পারছিল, কথা বলতে গেলেই সে কেঁদে ফেলবে। উদগত অশ্রু চেপে সে বড় বড় পায়ে পৌঁছতে চাইছিল কংক্রিটের বেঞ্চের দিকে। এতদিন সৌপ্তিকের সঙ্গে সে ক্রমাগত কুইজের খেলা খেলছিল। খেলতে খেলতে কখন যেন তাদের অজানিতে এক অন্য কুইজ খেলে ফেলেছে। জীবনের কুইজ। এ খেলাটা বোধহয় ঠিক হল না। হয়তো সারা জীবনের মতো এ কুইজের উত্তর সে আর দিতে পারবে না সৌপ্তিককে।

কী এক ভীষণ জ্বালায় জ্বলে যাচ্ছিল তিতিরের শরীর। এক সেল্‌ফ্-ইমোলেশনের হাত থেকে বাঁচতে সে পালিয়ে এসেছিল কলকাতায়, এখানে এসে আর-এক আগুনে আত্মাহুতি দিয়ে ফেলেছে। তার আগুনে পুড়ে যাচ্ছে দাউদাউ।

সৌপ্তিক হঠাৎ বলল, বল তো তিতির, একটিই হৃৎপিণ্ড, কিন্তু তা ভরে দেওয়া থাকে দুজনের শরীরে। কখন এমন হয়?

তিতির মাথা ঝাঁকাল। সে জানে না। সে কিচ্ছু জানে না। সে এই পৃথিবীর এক আনপড় লেড়কি, যে জীবনের গভীরতম খেলাটি ভুলভাবে খেলে ফেলেছে।

পৃথিবীর কোনও কুইজের উত্তরই আর জানা নেই তার।

সে সৌপ্তিকের দিকে তাকিয়ে ঘাড় ঝাঁকাল, সে জানে না। সে হেরে গেছে। হেরো।

সৌপ্তিক বিড়বিড় করে বলল, হোয়েন দেয়ার ইজ লাভ—

থার্ড রাউন্ড শেষ করে ফোর্থ রাউন্ডের মাথায় কর্নেলকে ধরতে পারল সুরঞ্জন। কর্নেলের ছ-ফুট দীর্ঘ দেহ তার পাঁচ-পাঁচ শরীরের পাশে আরও দীর্ঘ মনে হয়। লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে যান বলে তাঁকে ধরতে গিয়ে সে বেশ হাঁপিয়ে পড়েছে ইতিমধ্যে। অনেকক্ষণ ধরে ট্র্যাক-বরাবর কর্নেল একা হাঁটছেন দেখে হঠাৎ কেন যেন দ্রুত পা চালিয়ে তাঁকে ধরার ইচ্ছে হল সুরঞ্জনের। তেমন কোনও কারণ ছিল না অবশ্য।

কর্নেল ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন তার দিকে, এই যে ইয়াংম্যান, হাউ ডু ইউ ফিল নাউ।

—খুব ভাল। এখন চার রাউন্ড পর্যন্ত একদমে হেঁটে যাই।

—বাহ্। নাইস। আস্তে আস্তে আরও ইমপ্রুভ করবে। শীতকালটা শরীরের পক্ষে সবচেয়ে ভাল সময়। প্রচুর সবজি পাওয়া যায় বাজারে। অল গ্রীন ভেজিটেব্‌ল্‌স। তার থেকে প্রচুর ভিটামিন পাবে। তা ছাড়া শীতকালে বাতাসেও ফ্রেস অক্সিজেন। শীতের দু-তিন মাসে বছরের বাকি সময়ের বেঁচে থাকার রসদ সংগ্রহ করে নিতে হয়।

বেশ কনকনে ঠাণ্ডা পড়েছে কদিন হল। ফুলস্লিভ সোয়েটারের উপর গলায় একটা মাফলার জড়িয়ে নিয়েছে সুরঞ্জন। তবু কান দিয়ে কনকনে ঠাণ্ডা হু-হু করে ঢুকছে বলে বেশ শীত করছিল তার। হাতের পাতাদুটো বেশ অবশ-অবশ লাগছে। একজোড়া দস্তানা কিনবে কি না কদিন ধরে ভাবছিল সে।

কর্নেলের অবশ্য প্রোটেকশন একটু বেশিই। উলেন প্যান্ট, উলেন জামার উপর ফুলস্লিভ গলাবন্ধ কোট। তার সঙ্গে একটা মাঙ্কি ক্যাপ, হাতে দস্তানাও। শীত তাঁকে তেমন স্পর্শ করতে পারছে বলে মনে হচ্ছে না। বরাবরের মতোই ঋজুভঙ্গিতে হাঁটছেন। এখন তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে বেশ জোরেই হাঁটতে হচ্ছে সুরঞ্জনকে। চলতে চলতে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, প্রফেসর খাসনবীশ আজ এত তাড়াতাড়ি বসে পড়লেন যে। পুরো দু-রাউন্ডও দিলেন না মনে হল—

—প্রফেসরের শরীরটা তেমন ভাল যাচ্ছে না। সুগার হঠাৎ ডেঞ্জার-লেভেলের উপরে উঠে গেছে।

—কত এখন?

—চারশর উপর।

—চারশ! সুরঞ্জন চমকে উঠল হঠাৎ। সে চিনিতত্ত্বের কুটকচালি নিয়ে মাথা ঘামায়নি কখনও। কদিন আগে এক ডাক্তারের কাছে 'কেন এত শীর্ণকায় হয়ে যাচ্ছি বলুন তো' বলায়, তার ব্লাড-সুগারটা টেস্ট করতে বলেছিলেন। ডায়াবিটিস হলে অনেক সময় মানুষ রোগা হয়ে যায়। ব্লাড-রিপোর্ট পেতে অবশ্য আশ্বস্ত হয়েছিল। তার রক্তে চিনির পরিমাণ মাত্র সাতাত্তর। রিপোর্টের বাঁদিকে ছাপানো অক্ষরে লেখা ছিল, সুগারের নর্মাল রেঞ্জ ৭০-১০০। সে তুলনায় সাতাত্তর, বেশ কম। তাই এ মুহূর্তে অধ্যাপক খাসনবীশের রক্তে চিনির এমন প্রাবল্য শুনে তার চমকে ওঠারই কথা।

—হ্যাঁ। বরাবর তিনশ-সাড়ে তিনশ ছিল। ইদানীং একটু বেশি অত্যাচার করছিলেন শরীরের উপর। ওঁর মিষ্টি খাওয়া স্ট্রিক্ট্‌লি রেস্‌স্ট্রিক্‌টেড্‌। কিন্তু সুযোগ পেলেই মিষ্টির প্লেট নিঃশেষ করে ফেলেন।

—ইস, খুবই খারাপ ব্যাপারটা।

—মানুষ না খেয়ে যত মরে, খেয়ে মরে তার চেয়ে বেশি। সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হল, যাদের রক্তে সুগার হাই, তারাই মিষ্টি খাওয়ার জন্য পাগল হয়ে ওঠে। পেলে কিছুতেই ছাড়ে না।

সুরঞ্জন ঘাড় নেড়ে বলল, ঠিকই। সেদিন মিঃ হালদারের মেয়ের বিয়েতে দেখলাম, উনি অনেকগুলো রসগোল্লা খেয়ে নিলেন। এককালে ভালই খেতে পারতেন মনে হয়।

—এখন বুঝতে পারছি, হালদারের মেয়ে আর ঘোষদস্তিদারের ছেলে, পর-পর দুটো বিয়েতে খেয়ে অসুখটা আরও বাড়িয়ে ফেললেন উনি। আমি পাশে থাকলে কিছুতেই খেতে দিতাম না।

—আপনি তো খেতে বসলেন না। এসে দেখা দিয়েই চলে গেলেন। আপনার শরীরটা ভাল ছিল না বোধহয়।

কর্নেল হাসলেন, ভালই ছিল। তবে বয়স বেড়েছে তো। বছর দশেক হল, বিয়েবাড়িতে নেমন্তন্ন খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। কেউ ইনভাইট করলে সেখানে যাই, দেখা করে, প্রেজেন্টেশন দিয়েই তৎক্ষণাৎ বাড়ি ফিরে আসি। বয়স হয়েছে, এখন প্রলোভন সম্বরণ করতে হবে।

সুরঞ্জন কর্নেলের দিকে তাকায়। আটাত্তর-পেরনো একজন স্বাস্থ্যবান মানুষের পাশে তার নিজেকে সত্যিই খুব দুর্বল মনে হয়। মাত্র সাঁইত্রিশ বছর বয়সেই সে হীনবল, স্বাস্থ্যহীন। তাকে গুচ্চের ট্যাবলেট খেতে হয় রোজ। প্রতিদিন রাতের বেলা

ঘুমোতে যাওয়ার আগে সেই ভয়টা ঘিরে ধরে তাকে, যদি ঘুম ভেঙে হঠাৎ আবার দেখে—তার সমস্ত শরীর অবশ, সে বিছানা থেকে উঠতে পারছে না, বিশাখাকে ডাকতে পারছে না, হারিয়ে ফেলছে জ্ঞান। ক্রমশ মৃত্যু এসে আচ্ছন্ন করে ফেলছে তার চেতনা, তার শরীর। যদি আবার কোনও দিন এমন হয়!

এমন মনে হয় তার প্রায়ই। তখনই সে ভাবতে থাকে কর্নেলের কথা। কর্নেলের শেখানো সেই অটো-সাজেশনের কথা। সে তখন মনে মনে দুর্দান্ত সব কবিতা লিখতে শুরু করে, বিচিত্র সব বিষয় নিয়ে ফিচার লেখে। বিচিত্র স্টাইলে লেখা এইসব অভিনব ফিচার পড়ে একদিন সবাই বলাবলি করবে, কে এই সুরঞ্জন মুখোপাধ্যায়! কী চমৎকার তার গদ্য লেখার ভঙ্গি। কী জ্ঞান! এইসব ভাবতে ভাবতে তার মনে জোর আসে। শরীরে সাহস বাড়ে। এক চমৎকার ঘুমে পার করে দেয় অত বড় রাত। একসময় অ্যালার্মের শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে উঠে দেখে, বাইরের ঘন অন্ধকার দু-হাতে সরাতে সরাতে এগিয়ে আসছে স্বপ্নের ভোর। ফর্সা হয়ে আসছে পুবের আকাশ। আর একটু পরেই শুরু হবে লাল আবিরের খেলা। সে তক্ষুনি লাফিয়ে উঠে পড়ে মর্নিং-ওয়াকে যাবে বলে।

হাঁটতে হাঁটতে কর্নেল হঠাৎ বললেন, ঠিক আছে ইয়াংম্যান, তুমি আরও দু-একটা রাউন্ড দিতে থাক। আমি ততক্ষণে একটু বসি। ওদিকে প্রফেসর আর ব্যারিস্টার আমার বিরহে হয়তো এতক্ষণে হাপ্‌সি কাটছে।

কর্নেল এগিয়ে গেলেন কংক্রিটের বেঞ্চের দিকে। ওখানে পাশাপাশি বসে আছেন অধ্যাপক খাসনবীশ আর নীলেশ ব্রহ্মচারী। ব্রহ্মচারীসাহেব রোজ তাঁর প্রায়-পক্ষাঘাতগ্রস্ত শরীর নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এসে পৌঁছন কোনওক্রমে। তারপর বেঞ্চের উপর বসে দেখতে থাকেন ভোরবেলাকার দৃশ্য। সেই একই দৃশ্য, তবু তার মধ্যে যেন রকমফের দেখতে পান। বহুদিনের পরিচিত এই মাঠ, সবুজ ঘাস, রেন-ট্রি আর মানুষজনের মধ্যে খুঁজতে থাকেন বেঁচে থাকার রসদ।

শীতের প্রকোপ যত বাড়তে থাকে, ততই কমে আসতে থাকে প্রাতঃভ্রমণকারীদের সংখ্যা। আগে যেমন কাকভোর থেকে জমজম করে উঠত ম্যাকসাহেবের মাঠ, এখন তেমন ভিড় আর নেই। একমাত্র বৃদ্ধেরা সমস্ত শীত উপেক্ষা করে ঠিকঠাক হাজিরা দেন মাঠে। আসে কিছু স্বাস্থ্যপ্রিয় তরুণ বা যুবক, যারা শরীরটাকে মজবুত করে গড়তে চায়। কিছু রুগ্‌ন প্রৌঢ় বা আধাপ্রৌঢ় মানুষও আসেন, যাঁরা আরও কিছুকাল বেঁচে থাকতে চান, ভোগ করতে চান এই পৃথিবীর রূপ-রং-রস। বাদবাকিরা সেঁধিয়ে যান লেপ-কম্বলের ওমের ভেতর। খুব জরুরী না থাকলে কে-ই বা এই কাকভোরে শীতের প্রবল কামড় খামোখা ভোগ করতে

আসে! ভাবতে ভাবতে হেসে ফেলল সুরঞ্জন।

আসলে তার কাছে বেঁচে থাকাটাও এখন একটা লড়াই। এত বছর ধরে যা সে একটু একটু করে হারিয়েছে, তা এখন পুনরুদ্ধার করা বেশ দুরূহ কাজ। তবু সবটা না হলেও কিছুটা নিশ্চয় করা যায়। তাকে এখন সেই লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। সেদিন একটা অদ্ভুত খবরও পড়ল কাগজে। তিরাশি বছর বয়সে এক ভদ্রলোক হঠাৎ মারা গেলেন বাসের তলায় চাপা পড়ে। নিয়ম অনুযায়ী পোস্টমর্টেমে পাঠানো হল বডি। পোস্টমর্টেমের রিপোর্টে যা পাওয়া গেল তা ভারী অদ্ভুত। ভদ্রলোকের লিভারের দুই-তৃতীয়াংশ ড্যামেজ্‌ড্‌। দুটি কিডনির মধ্যে একটা একেবারেই অকেজো, অপরটিও আংশিক খারাপ। দুটি ফুসফুসই আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। এমনকি হৃৎপিণ্ডও ঠিকঠাক কাজ করছে না। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, ভদ্রলোক তাঁর জীবৎকালে তাঁর পরিবারের কাছে কোনও অসুস্থতার কথা বলেননি কখনও। ভদ্রলোক বোধহয় টেরই পাননি তাঁর কোনও অসুখ আছে বলে!

শুনলে কর্নেল নিশ্চয় বলবেন, ভদ্রলোক কখনও তাঁর অসুখ নিয়ে ভাবেননি বলেই অসুখ তাঁর ঘাড়ে চেপে বসতে পারেনি।

সুরঞ্জন মনে মনে বলে, আমিও লড়াই করব। শরীরের সঙ্গে লড়াই। বেঁচে থাকাও একরকমের যুদ্ধ।

সে প্রতিদিন নিয়ম করে ভোরবেলা ঘুম থেকে ওঠে। সামান্য একটু ব্যায়াম করে শরীরটাকে ফ্রেশ করে নেয়। তারপর ড্রেস করে চলে আসে মাঠে। কয়েক রাউন্ড ঘুরতেই চনমন করে ওঠে শরীর। গুনে গুনে তিনস্টেপে শ্বাস নেয়, চারস্টেপে শ্বাস ছাড়ে। সারাদিন সেই চনমনে ভাবটা ধরে রাখার চেষ্টা করে তার মন ও শরীরে। শোওয়ার সময় ভাবতে থাকে, ইমরান খানের প্রবল ফাস্ট বোলিংকে সে ছক্কা হাঁকিয়ে তছনছ করে ফেলছে।

ক্রমে শীত প্রবল হয়ে নেমে আসে কলকাতার বুকে। বেহালার প্রান্তদেশে এই শহরতলিতে আরও জাঁকিয়ে আসে কনকনে ঠাণ্ডা। রেন-ট্রি গাছের পাতা একটা-দুটো করে খসতে থাকে সবুজ নধর ঘাসের উপর। প্রাতঃভ্রমণকারীদের সংখ্যা একজন একজন করে কমতে থাকে। যাঁরা আসেন, অনেকেরই শরীর সোয়েটারে-মাফলারে-মাঙ্কি টুপিতে-দস্তানায়-মোজায় আগাপাশ্‌তলা ঢাকা। শুধু চোখদুটো আর নাকের ফুটো বাইরে বার করে ঘুরতে থাকেন মাঠের চারপাশ।

এর মধ্যে একদিন উইলিয়াম তাঁদের বাংলো, অর্ফানেজ, স্কুল, প্রার্থনাগৃহ, গির্জা সব চমৎকার করে সাজিয়ে তুললেন রঙিন আলোতে। বড়দিনের উৎসব ঘটা করে পালিত হল গোটা ম্যাকডোনাল্ড'স গ্রাউন্ডে। অনাথ শিশুরা নতুন পোশাক পরে

মেতে ওঠে হই-হল্লায়। কোরাস গান ছড়িয়ে দেয় চারপাশের অভিজাত পল্লীগুলোতে। সেই পুরনো গানটি নতুনভাবে গেয়ে ওঠে—উই শ্যাল ওভারকাম সাম ডে—

কর্নেল হঠাৎ সান্তাক্লজ সেজে এসে চকোলেট বিতরণ করতে থাকেন মুঠো-মুঠো। মনে মনে বললেন, ভাল থেকো, তোমরা সবাই ভাল থেকো।

ক্রমে নতুন বছর এসে পড়ে। নাইনটিন নাইনটি ওয়ান। মাঠের সবাই এঁকে অপরকে শুভেচ্ছা জানাতে শুরু করেন। হ্যাপি ক্রিশমাস শেষ হয়ে হ্যাপি নিউইয়ার। নতুন বছরে ফাদার উইলিয়াম ফুলের প্রদর্শনী করলেন মাঠে। গোটা সবুজ মাঠ জুড়ে শীতের মরসুমি ফুল। কতরকম ডালিয়া, তার কত-যে রং। কত চন্দ্রমল্লিকা, স্নো-বল। কত গাঁদা। কত গোলাপ। কতরকম ক্যাকটাস। পাতাবাহার। ফুলের প্রদর্শনীও শীতের দিনে এক দারুণ উৎসব। তিন-চারদিন ধরে সে দৃশ্য দেখতে এল কত মানুষজন।

শীতও একসময় যাই-যাই করতে থাকে। রেন-ট্রি গাছের সমস্ত পাতা একে-একে খসে যায়। বসন্তের আগে হঠাৎ সব রেন-ট্রিই কেমন ন্যাড়া, বিবর্ণ হয়ে ওঠে।

এতসব উৎসব, ঋতু-পরিবর্তনের দিনে হঠাৎ একটা অদ্ভুত দৃশ্যের মুখোমুখি হল সুরঞ্জন। সেদিন খুব ভোরে মাঠে এসেছে। তখনও একটু-একটু অন্ধকার। একমাত্র কর্নেল ছাড়া আর কেউই আসেননি। কিন্তু কর্নেল রাউন্ড দিচ্ছেন না মাঠে। ছেলেদের অর্ফানেজের সামনে একটা চাতাল, সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন। শুধু তিনিই নন, চাতালের উপর বসে দুটি বালক। সুরঞ্জন কাছে এগিয়ে গিয়ে দেখল, ডালিম আর টোটন। টোটন অঝোরে কাঁদছে দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে। ডালিম তার পাশে বসে বারবার বলছে, ও রকম করিসনে, টোটন। তুই চলে যা। তোর কত ভাগ্য।

টোটন কাঁদতে কাঁদতে মাথা নাড়ছে, না, কিছুতেই না।

—এ রকম রাগ করতে নেই। আমরা সবাই এখানে ঠিকঠাক থাকব। তুই মাঝে-মাঝে এসে আমাদের দেখে যাস।

কর্নেলও বললেন, টোটন, কথা শোনো। তোমার বাবা যখন নিতে এসেছেন, তার সঙ্গে বাড়ি চলে যাও—

টোটন তার কান্নার মধ্যে আস্ফালন করে ওঠে, কে আমার বাবা? আমার বাবা নেই, মা নেই, কেউ নেই। আমি তো অনাথ শিশু।

ডালিম ফের বলল, ও রকম বলতে নেই টোটন, তুই অনাথ নোস। তোর বাবা গরিব ছিল বলে তোকে অনাথআশ্রমে দিয়ে গিয়েছিল।

—না, না। টোটন আছড়ে পড়ে চাতালের উপর, এতদিন যখন অনাথ জেনেছি,

তখন আমি অনাথই। যে বাবা ছেলেকে অনাথ বলে আশ্রমে ভর্তি করে দিয়ে যায়, সে কীর'ম বাবা?

কর্নেল আস্তে আস্তে হাঁটু গেড়ে বসেন টোটনের পাশে, টোটন, তোমার বাবা খুব গরিব ছিলেন। তোমাকে খাওয়াতে পারতেন না। না খেতে পেলে তুমি বড় হতে কী করে?

টোটন হাউমাউ করে চাতালের উপর শুয়ে কাঁদতে থাকে। তার কাছে বিব্রত-মুখে বসে থাকে ডালিম। খানিক পরে আবার বলল, তোর কত ভাগ্য রে, টোটন। তোর বাবা আছে, মা আছে, আমাদের তো কেউ নেই রে—

কর্নেল সুরঞ্জনকে নিয়ে আস্তে আস্তে সরে আসেন সেখান থেকে। বললেন, খুব অভিমান হয়েছে টোটনের। তার বাবা-মা থাকা সত্ত্বেও তাকে যে অনাথ বলে এতকাল পরিচিত হতে হয়েছে, সেই লজ্জা, সেই রাগ, সেই অভিমানে কাল সন্ধে থেকে কেঁদে চলেছে। ওর বাবা থাকেন মেদিনীপুরের কোন গাঁয়ে। খুবই গরিব। কীভাবে যেন টোটনের পরিচয় গোপন করে ভর্তি করে দিয়ে গিয়েছিলেন অর্ফানেজে। হঠাৎ কাল এসে ফাদার উইলিয়ামকে সব কথা খুলে বলে নিয়ে যেতে চেয়েছেন টোটনকে। কিন্তু টোটন যেতে চাইছে না। সে তার এতদিনকার পরিচিত আশ্রম, বন্ধুদের ছেড়ে অপরিচিত জায়গায় ফিরে যেতে নারাজ।

সুরঞ্জন বিড়বিড় করে বলল, সত্যিই অদ্ভুত।

—কাল ওদের স্কুলের নতুন আন্টি বন্দনা রায়ও অনেক করে বুঝিয়েছে। মেয়েটা কদিন এসে বাচ্চাগুলোকে ভারী আপন করে নিয়েছে।

সুরঞ্জনের মাথায় বেশ কিছুক্ষণ অর্ফানেজের ছেলেমেয়েদের ভাবনাটা ঘুরপাক খায়। ডালিমের মুখ, টোটনের মুখ ভাবতে ভাবতে সে তার রাউন্ড শুরু করে। তাকে এখন অনেক পথ হাঁটতে হবে। মাঠের চারপাশে রাউন্ডের পর রাউন্ড। ফিচারের পর ফিচার। এই অর্ফানেজ নিয়েও সে একটা চমৎকার ফিচার লিখতে পারে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায়। কিংবা কবিতা। ফাদার ম্যাকডোনাল্ডের এই অর্ফানেজের কথা কেউ কখনও লেখেনি কোথাও। কত যত্নে কত আয়েসে মানুষ হয়ে উঠছে এতগুলো ছেলেমেয়ে। হঠাৎ একজন তার পিতৃপরিচয় জেনে ফেললে তার লজ্জার, অপমানের আর শেষ থাকে না।

রাউন্ড দিতে দিতে সুরঞ্জনের দেখা হয়ে যায় বিদ্যুৎ চ্যাটার্জির সঙ্গে, জানেন মুখার্জি, কী ভয়ঙ্কর খবর, আবার বিশ্বযুদ্ধ হতে চলেছে।

—বিশ্বযুদ্ধ!

—সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা ইরাকের সঙ্গে যুদ্ধে নেমে পড়ল বলে। আমেরিকার

সেক্রেটারি অব্ স্টেট্‌স্ জেম্‌স্ বেকারের সঙ্গে ইরাকের বিদেশমন্ত্রী তারিক আজিজের জেনেভার মিটিং ফেল করেছে। তার মানে অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধ। আর এখন যুদ্ধ মানে তা ছড়িয়ে পড়তে দেরি হবে না। রাশিয়া পিকচারে এলেই—

—রাশিয়া কি সত্যিই যুদ্ধে নামবে? গরবাচেভ তাঁর নিজের সমস্যা নিয়েই তো অস্থির।

—অথচ না এলেও বিপদ। আমেরিকা তো গুঁড়িয়ে দেবে ইরাককে।

সর্বত্রই আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে এই যুদ্ধের সম্ভাবনায়। যুদ্ধের কারণও আলোচনা করছে সবাই। ইরাক দখল করে নিয়েছে প্রতিবেশী রাজ্য কুয়েতকে। কুয়েতের উপরই ছিল আমেরিকার তেলের ভরসা। এখন তেল মানেই শক্তি। সেই তেলে টান পড়ায় আমেরিকা ভয়ঙ্করভাবে ক্ষেপে উঠেছে।

—বুঝলেন মুখার্জি, ইরাক একটা জাত বটে। দশ বছর ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। তাতে অন্তত দশ লক্ষ মানুষ মারা গেছে। ফের যদি আমেরিকার সঙ্গে যুদ্ধ হয়, আরও দশ লক্ষ লোক মারা যাবে নির্ঘাত।

সুরঞ্জন ঝাপসা চোখে তাকিয়ে থাকে বিদ্যুৎ চ্যাটার্জির মুখের দিকে, কিন্তু সাদ্দাম হুসেনের গোঁ-ও তো কম নয়। তিনি কুয়েত দখল করেছেন বলেই তো ইরাকের মানুষ বিপদে পড়ল।

—ইরাকের লোকজন তাতে কিন্তু একটুও ভাবনা করছে না। দিনপনের আগে ইরাকের আর্মি-ডে খুব ঘটা করে পালন করা হল বাগদাদে। কোনও হোটেল, রেস্তরাঁয় তিলমাত্র জায়গা ছিল না। চূড়ান্ত পান-ভোজন চলেছে সারা দিন-রাত। ইরাকের তাবৎ সৈন্যেরা তাদের বন্ধু,-বান্ধব, স্ত্রী, প্রেমিকা, বান্ধবী নিয়ে হুল্লোড় করেছে, নাচগান করেছে। সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং হল, এদিন পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের সংখ্যাই বেশি ছিল। প্রায় থ্রি-অ্যাজ টু-টু। কেন জানেন তো, যুদ্ধের ফলে ক্রমশই পুরুষ কমে যাচ্ছে ওদের দেশে।

—তারপরও আবার যুদ্ধ নামতে চাইছে!

—সাংঘাতিকভাবে চাইছে। সাদ্দাম হুসেন বলছে, আমেরিকাকে ক্র্যাশ করে দেবে।

—লোকটা পাগল নাকি? আমেরিকা তিন দিনে গুঁড়িয়ে দিতে পারে ইরাককে।

—সেদিন ইন্ডিয়া টু-ডে-তে এক জন ছাত্রীর ছবি ছাপা হয়েছে। ইরাকি ছাত্রী, তার নীচে ক্যাপশন, 'ইরানের সঙ্গে যুদ্ধে আমার কাকা আর ভাইকে হারিয়েছি। কী জানি এবারের যুদ্ধে আমাদের পরিবারের আর কে কে চলে যাবে।'

শুধু বিদ্যুৎ চ্যাটার্জি নয়। মাঠের আরও অনেকেই ইরাক-আমেরিকার ভাবী যুদ্ধ

নিয়ে জোর আলোচনায় মেতেছে। সুরঞ্জন কাল অফিসেও শুনেছে সবাই-ই খুব উত্তেজিত। শিগ্গির আর একটা বিশ্বযুদ্ধ আসছে পৃথিবীর বুকে।

এতসব আলোচনার মধ্যে একদিন সত্যিই শুরু হয়ে গেল যুদ্ধ। ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহের মধ্যে দেখা গেল, মিত্রজোটের সুপরিকল্পিত বোমাবর্ষণে ইরাকের তেলশোধনাগারগুলির প্রায় আশি শতাংশই ধ্বংস হয়েছে বা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

সর্বত্র তখন এক যুদ্ধের আতঙ্ক।

কয়েকদিন আগে অনিরুদ্ধ শাসমলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল সুরঞ্জনের। সুরঞ্জনের মতো অনিরুদ্ধ শাসমলও শরীর নিয়ে ব্যস্ত, বিব্রত। সুরঞ্জনকে দেখে বলেছিলেন, আমেরিকা কিংবা ইরাকের চেয়ে আমরা কিন্তু কম যুদ্ধ করছি না, মুখার্জি। আমরা লড়াই করছি শরীরের সঙ্গে।

হাঁটতে হাঁটতে সুরঞ্জন ঘাড় নাড়ে আপনমনে। সত্যিই তারা লড়াই করছে প্রত্যেকে। অনিরুদ্ধ শাসমলের লড়াই একরকম। সুরঞ্জন মুখার্জির লড়াই অন্যরকম।

পঞ্চাশটা বুকডন, একশ বৈঠক শেষ করার পর কয়েকটা আর্চ করে ফেলল বিশ্বজিৎ। শরীরটা পেছনের দিকে ধনুকের মতো বাঁকিয়ে হাতদুটো উল্টে দিয়ে ছুঁতে চাইল মাটি। মাটিতে হাতের তেলো কয়েক মুহূর্ত রেখে আবার এক হ্যাঁচকায় উঠে সোজা হল।

শীত যাই-যাই করেও যেন যাচ্ছে না। রেনট্রিগুলোর ন্যাড়া ডালপালায় এখন নতুন সবুজ পাতার উঁকিঝুঁকি। প্রতি বছর এই ফেব্রুয়ারি-মার্চের দিনগুলি গাছের খোলস বদলাবার সময়। পুরনো সাজ ফেলে দিয়ে নতুন সাজ গায়ে পরে নেয় প্রকৃতির পুত্রকন্যারা। বসন্ত সমাগমের দিনগুলো তাই ভারী মনোরম মনে হয় বিশ্বজিতের। এ সময় শরীরটাও বেশ ঝরঝরে লাগে।

পর-পর কয়েকটা আর্চ করার পর নজর পড়ল পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা সৌপ্তিকের দিকে। বলল, স্পাইনাল কর্ড যত ফ্লেক্সিব্‌ল্ রাখা যাবে, ততই দীর্ঘজীবী হওয়া যায়। বুঝলি? নে, তুইও শুরু কর—

কদিন ধরে চেষ্টা করছে সৌপ্তিক, কিন্তু কিছুতেই আর্চ করতে পারছে না। বিশ্বজিতের অর্ধেকও সে বাঁকাতে পারছে না শরীর। বলল, হবে না, ছোটবেলা থেকে অভ্যেস নেই তো—

বিশ্বজিৎ এক ধমক দিয়ে বলল, হবে না মানে! আলবৎ হবে। নে, আমি তোর পেছন দিকে হাত দিয়ে ধরছি।

বারকয়েকের চেষ্টায়ও যখন সৌপ্তিক পারল না, হাল ছেড়ে দিয়ে বিশ্বজিৎ একটা খারাপ গালাগাল দিয়ে বলল, শরীরটাকে কী বানিয়েছিস, অ্যাঁ? ছোটবেলায় ফুটবলে লাথিও মারিসনি বোধহয়?

—গালাগাল দিও না, বিশ্বজিৎদা। কারেবীদি আসছে। শুনে ফেলবে কিন্তু।

কাবেরী তার গায়ে একটা লাল কার্ডিগান জড়িয়ে দুলকিচালে হাঁটতে হাঁটতে আসছে তাদের দিকে। হাতে যথারীতি দুধের ক্যান। কিন্তু আজ চামেলি সঙ্গে নেই। কাবেরীর সঙ্গে চামেলি না থাকাটাই একটা আশ্চর্য ঘটনা। চামেলির কি তাহলে অসুখ করেছে!

বিশ্বজিতের সবুজ স্যান্ডোগেঞ্জি ততক্ষণে ঘামে ভিজে সপসপ করছে। গত সাতদিন ধরে সে হাফ-সোয়েটারও আর পরছে না। সেটা লক্ষ করে আজ একটু আগেই কর্নেল এসে দাঁড়িয়েছিলেন তার পাশে। তখন সবে বুকডন দেওয়া শুরু করেছে সে। কর্নেল একধমক দিয়ে বললেন, এতটা হিরোইজম্ করা ঠিক নয়, ইয়াংম্যান। শীত যাওয়ার মুখে হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে যায়। একবার সর্দি বসে গেলে মজা বুঝবে।

বিশ্বজিৎ হেসে বলেছে, আমার ঠাণ্ডা লাগে না।

কাবেরীর সঙ্গে চামেলি না থাকাটা যেমন অস্বাভাবিক, তেমনই কর্নেলের সঙ্গে প্রফেসর না থাকাটাও। আগে সঙ্গে ব্যারিস্টারও থাকতেন। ডানদিকটা প্যারালাইজ্ হয়ে যাওয়ার পর তিনি এখন মাঠে এসে বসে থাকেন চুপচাপ। গতকাল এক রাউন্ড ঘোরার চেষ্টা করেছিলেন, বারদুয়েক শরীর টলে যাওয়ায় আজ মাঠে পৌঁছেই কংক্রিটের বেঞ্চে বসে পড়েছেন। কিন্তু আজ প্রফেসরও না থাকাতে বিশ্বজিৎ জিজ্ঞাসা করে ফেলেছিল, আপনি আজ একা?

কর্নেল সামান্য বিষণ্ণ হলেন, প্রফেসরের শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। গত মাসদুয়েক ধরেই বেশ উইক ফিল করছিলেন, আজ আর আসেননি দেখছি। বলতে বলতে মুখে একরাশ চিন্তার ছাপ নিয়ে হাঁটা শুরু করেছিলেন আনমনে।

কাবেরীর মুখটা আজ কেমন বিষণ্ণ লাগছে। সৌপ্তিককে ততক্ষণে ধনুরাসন শেখাচ্ছে বিশ্বজিৎ। সৌপ্তিকের স্টিফ স্পাইনাল কর্ডকে এভাবে ফ্লেক্সিবল্ করে দিতে চাইছে। কাবেরীকে দেখে বলল, কী হল, আজ একা যে। ল্যাংবোট কোথায় রেখে এলে।

গম্ভীরমুখে কাবেরী বলল, চামেলি আজ আসেনি।

—তোমাকে একা ছেড়ে দিল যে বড়! না কি তোমার বাবা নজরদারি করা ছেড়ে দিল এতদিনে।

—তোমার এসব ইয়ার্কিগুলো ছাড় তো। অনেক কথা আছে। ব্যায়াম শেষ হয়েছে?

বিশ্বজিৎ সৌপ্তিকের দিকে তাকাল, আজ কেস খারাপ মনে হচ্ছে। তুই বরং দু-রাউন্ড দৌড় দিয়ে আয় ততক্ষণে।

সৌপ্তিক দৌড় শুরু করতেই বিশ্বজিৎ কাবেরীকে পাশে নিয়ে হাঁটতে শুরু করে, কী ব্যাপার, মুখখানা বেগুনপোড়া করে রেখেছ কেন? বাড়িতে ফের ঝামেলা শুরু হয়েছে নাকি?

—চামেলির সঙ্গে আজ খুব ঝগড়া হয়েছে। ও বলেছে, রোজ রোজ আমার সঙ্গে আর আসতে পারবে না। আমার জন্যে বছরের পর বছর ঘুম নষ্ট করে ভোরে উঠতে পারবে না আর। আর জানই তো, ও না এলে আমারও আর এখানে আসা হবে না।

বিশ্বজিৎ মুখখানা হাসি-হাসি করে বলল, তাহলে কেস জন্ডিস বল—

—তুমি তো ইয়ার্কি করেই কাটিয়ে দিলে এতগুলো বছর। আমিও আর পারছি না। বাড়িতে ভীষণ চাপ দিচ্ছে।

—সে তো আজ দু-বছর ধরেই চাপ দিচ্ছে। আরও কিছুদিন এইভাবে চালিয়ে যাও।

কাবেরী মুখ অন্ধকার করল, আর মোটেই চালিয়ে যাওয়া যাবে না। এর মধ্যে বাবা রোজ জিজ্ঞাসা করছে, দুধ আনতে গেলে এত দেরি হয় কেন! কতদিন আর বলা যায়, বিরাট লাইন ছিল, কিংবা বুথে আজ দুধ আসতে দেরি হয়েছে, কিংবা—। তা ছাড়া রোজ রোজ বাবার সঙ্গে মিথ্যেকথা বলতে ভালও লাগে না। এখন আবার চামেলিও ঝামেলা করতে শুরু করেছে, বলছে, তোরা বিয়ে করলে কর, না হলে এরকম করে আর কতকাল ঘুরবি।

বিশ্বজিৎ হঠাৎ হেসে উঠল, কিন্তু তা বলে এখন এই যুদ্ধের ভেতর বিয়ে করতে হবে! বিশ্বযুদ্ধ বাধবে বলে লোকে ভয়ে মরছে, আর তুমি এখন বিয়ে বিয়ে করে পাগল হচ্ছ! জান, বাজারে হঠাৎ চালের দাম কী রকম হু-হু করে বেড়ে যাচ্ছে! একটা যুদ্ধ মানে সাংঘাতিক ঘটনা। যুদ্ধ বাধলে যুদ্ধের সময় হঠাৎ বাজার থেকে চাল-ডাল-তেল উধাও হয়ে যায়। দাম বেড়ে যায়। ব্যবসায়ীরা আর্টিফিসিয়াল ক্রাইসিস সৃষ্টি করে সর্বত্র হুলুস্থুল বাধিয়ে দেয়। অতএব বিয়ের ভাবনা না ভেবে বরং বাবাকে গিয়ে বল, কিছু চাল-ডাল-তেল ঘরে স্টক করতে। তোমার বাবার তো অবস্থা ভাল। আমার মতো হা-ঘরে তো নয়। আমাদের বাড়ি শর্ট পড়লে তখন তোমাদের বাড়ি গিয়ে ধার নিয়ে আসব।

—তুমি যা হোক একটা কিছু ব্যবস্থা করো। আমার এসব ইয়ার্কি ভাল লাগে

না।

—এত তাড়াহুড়ো করার কী হয়েছে? আমার কি এখন বিয়ের বয়স হয়েছে। সবে ছাব্বিশ পেরোলাম।

—তোমার না হলেও আমার হয়েছে। মেয়েরা কুড়িতে বুড়ি হয়, আমার এখন একুশ। আমার বড়দির আঠারোয় বিয়ে হয়েছিল। মেজদির উনিশে। মা তো রোজ বাবাকে বলছে, ছেলের খোঁজখবর করতে।

—বাহ্, তা যুদ্ধটা অন্তত থামতে দাও। এই যুদ্ধের মধ্যে এখন বিয়ের কথা মাথায় আসছে কী করে!

—যুদ্ধ তো হচ্ছে ইরাকে।

—যুদ্ধ ইরাকে হলেও তার গোলাগুলির আঁচ তো কলকাতায়ও আছড়ে পড়ছে। চাল-ডাল পাওয়া যাচ্ছে না। পেট্রল-ডিজেল আসা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আর কদিন যুদ্ধ চললে কলকাতায় কোনও গাড়িঘোড়া চলবে না। সমস্ত শহর কোলাপ্স্ হয়ে যাবে। কাজকর্ম লাটে উঠে যাবে। দেখছ না, ইরাক এখন যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিতে কেবলই ইস্রায়েলের উপর স্কাড্ ছুঁড়ে যাচ্ছে। একবার ইস্রায়েল নেমে পড়লে ভয়াবহ সমস্যা। নির্ঘাত বিশ্বযুদ্ধ।

এতসব ভড়কি দিয়েও কাবেরীকে আজ কিছুতেই নিরস্ত করতে পারল না বিশ্বজিৎ। হঠাৎ হনহন করে কাবেরী দ্রুতপায়ে পার হয়ে গেল মাঠ। তার রকম-সকম দেখে বেশ হকচকিয়ে গেল বিশ্বজিৎ। দু-চার পা এগোবার চেষ্টা করল, ডাকল, কাবেরী, এই কাবেরী, শোন—

কাবেরী দাঁড়াল না। দুধের ক্যান হাতে নিয়ে পার হয়ে গেল ডায়মণ্ডহারবার রোড। এবার জনকল্যাণের পাশ দিয়ে চলে যাবে জেম্স্ লং সরনির দিকে।

কাবেরীকে যতক্ষণ দেখা যায়, ততক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল বিশ্বজিৎ। তার মুখে সর্বক্ষণ একটা হাসি লেগে থাকে। একটু আগেও তা ছিল। কাবেরী তার চোখের বাইরে মিলিয়ে যেতেই সেই মুখের হাসিটুকু নিভে গেল হঠাৎ।

খানিক পরেই দৌড় থামিয়ে তার কাছে এসে থামল সৌপ্তিক, কী হল বিশ্বজিৎদা, কাবেরীদি কি চলে গেল?

—হ্যাঁ, গন-ফট্। হেভি রেগে গেছে আজ।

সৌপ্তিক একটু থমকে গিয়ে ফের বলল, তা বিয়েটা করেই ফেল না, বিশ্বজিৎদা। চাকরি তো পেয়েই গেছ—

বিশ্বজিৎ হঠাৎ রেগে গিয়ে বলল, বিয়ে বললেই বিয়ে করা যায়! ঘাড়ের উপর দু-দুটো বোন। তাদের বিয়ে না দিয়ে বউ ঘরে আনলে টিকতে পারবে?

সৌপ্তিক খানিকক্ষণ চুপচাপ তাকিয়ে থাকে বিশ্বজিতের মুখের দিকে। হাসিখুশি বিশ্বজিৎকে হঠাৎ এভাবে রেগে যেতে বেশ অবাকই হয়। পরক্ষণেই বুঝতে পারে, কাবেরীদি রাগ করে চলে গেছে বলেই—

বিশ্বজিৎ তখন বাড়ি ফেরার জন্য তৈরি হচ্ছে। তার মেজাজটা মোটেই ভাল নেই আজ। এর আগেও কয়েকবার কাবেরী তাগাদা দিয়েছে বিয়ের জন্য। প্রতিবারই সে এটা-ওটা অজুহাত দেখিয়ে আলোচনা মুলতুবি রেখেছে। এবার কাবেরী মনে হচ্ছে খুব সিরিয়াস। সৌপ্তিক কীভাবে বিশ্বজিতের খিঁচড়ে-যাওয়া মনটাকে ভাল করে তুলবে বুঝতে পারে না। ভালবাসার জন হঠাৎ রাগ করে চলে গেলে বোধহয় এ রকমই হয়। তিতিরের সঙ্গে তার কখনও রাগ হয়নি। রাগারাগির সুযোগই হয়নি। তার আগেই তিতির তো চলে গেল জব্বলপুর।

কংক্রিটের বেঞ্চে তখন জোর তর্কবিতর্ক চলছে রাজনীতি নিয়ে। কে যেন বলল, জানেন, দেবীলাল তার ছেলেকে দিয়ে জ্যোতি বসুর কাছে খবর পাঠিয়েছে, কোয়ালিশন সরকার হলে জ্যোতি বসুকে প্রধানমন্ত্রী করা হবে।

কথাটা কানে যেতে সৌপ্তিক হঠাৎ বলল, নিউজটা দারুণ, তাই না, বিশ্বজিৎদা। এখনও পর্যন্ত কোনও বাঙালি প্রধানমন্ত্রী হননি—

বিশ্বজিৎ কোনও মন্তব্য করল না। সৌপ্তিক আবার বলল, তবে জ্যোতি বসু খুব চালাক লোক। উনি বুঝতে পারছেন, ভারতবর্ষের এখন দেউলে অবস্থা। প্রতিদিন একবার করে বিদেশের কাছে টাকার জন্য হাত পাততে হচ্ছে। টাকা ধার পেলে তবে সংসার চলবে। এমনকী এখন যদি ইলেকশন হয়, তাও বিদেশের কাছে ধার নিয়ে করতে হয়। এখন প্রধানমন্ত্রী হলে নির্ঘাত ডিসক্রেডিটেড হতে হবে।

বিশ্বজিৎ তবুও তার কথায় কান দিচ্ছে না। সৌপ্তিক কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে কথা ঘোরাতে চাইল ফের, শুনেছ বিশ্বজিৎদা, মিত্রপক্ষের সৈন্যদের কী হয়েছে? তারা তো সৌদি আরবের মরুভূমি থেকে ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাচ্ছে, ওদিকে মরুভূমিতে যে এত ইঁদুর আছে তা কেউ জানত না। সৈন্যদের জামা-প্যান্ট-মোজা-ব্যাগ, ইলেকট্রিক তার সব কেটে তছনছ করছে। কী কাণ্ড বল দেখি। সৈন্যরা এখন ইরাকের সঙ্গে যুদ্ধ করবে, না ইঁদুরদের মোকাবিলা করবে, তা বুঝতে পারছে না।

অন্যমনস্ক হয়ে বিশ্বজিৎ বলল, তাই!

—আচ্ছা বিশ্বজিৎদা, আমাদের কার্জন পার্কেও নাকি এরকম বড় বড় ইঁদুর আছে! বিশাল বিশাল সাইজের! গর্ত থেকে যখন বেরোয়, দেখে মনে হয় শুয়োরের ছোটভাই!

বহুক্ষণ বকবক করার পর বিশ্বজিৎ তার কথা কিছুই শুনছে না দেখে 'ধুত্তোরি'

বলে সৌপ্তিক হঠাৎ একটা দৌড় দেয়। মাঠের দিকেই। আরও এক রাউন্ড দৌড়বে সে!

পরদিন কাবেরীকে আর দেখা গেল না মাঠে। তার পরদিনও না। তার পরদিনও নয়।

বিশ্বজিতের ব্যায়ামে যেন একটু ভাঁটা পড়ে গেল। প্রায় বছরদশেক ধরে নিয়মিত ব্যায়াম করছে সে। মানুষের শরীরটাকে তার মনে হয় মন্দির। মন্দিরে যেভাবে পুজো দেয় মানুষ, সেও নিয়ম করে পুজো করে তার শরীরকে। সে মনে করে, পরিপূর্ণ সুস্থ থাকতে না পারলে জীবনকে পুরোপুরি উপভোগ করা যায় না। বাঁচতে হলে সুস্থশরীরে বাঁচতে হবে। রাজার কেতায় বাঁচতে হবে। সুস্থতাই জীবনের লক্ষণ। যাদের বুকের ছাতি চওড়া, তারা জীবনের অনেকগুলো দিক দেখতে পায়। যেমন লম্বা শরীরের মানুষ দেখতে পায় অনেকখানি পৃথিবী।

কাবেরী হঠাৎ মাঠে আসা বন্ধ করে দেওয়ায় খুব মুষড়ে পড়ল বিশ্বজিৎ। প্রতিদিন ভোরবেলা মাঠে এসে বুকডন দেওয়ার ফাঁকে এক-একবার উঠে দাঁড়ায়। দূরে, ডায়মণ্ডহারবার রোডের দিকে ছুড়ে দেয় তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। দেখতে চেষ্টা করে, দুধের ক্যান হাতে দুলিয়ে দুলকিচালে হেঁটে আসছে কি না কাবেরী। একদিন শখের বাজারে মাদার ডেয়ারির বুথেও গিয়ে দেখে এল, সেখানে কাবেরী কিংবা চামেলি কেউ লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে কি না। নেই দেখে তার ঘনকালো ভুরুতে কোঁচ পড়ে। তার শরীর-মন ক্ষতবিক্ষত হয়। তার ব্যায়াম করায় মন বসে না। সে মনে মনে বলল, যুদ্ধটা থামুক, কাবেরী।

কিন্তু এর মধ্যে যুদ্ধ আরও প্রবলভাবে জাঁকিয়ে বসেছে আরব-ইরাকের মাটিতে। হিরোসিমা-নাগাসাকিতে যে বোমা পড়েছিল, তার কয়েকশ গুণ বোমা ফেলা হয়ে গেছে ইরাকের ওপর। কত বিমানঘাঁটি, কত বহুতল বাড়ি, কত লোকালয় ধ্বংস হয়েছে ইরাকের, তার ইয়ত্তা নেই। কত সৈন্য নিধন হয়েছে তারও কেউ হিসেব দিতে পারছে না। সৌদি আরব ঘুরে ওয়াশিংটন ফেরার পথে আমেরিকার প্রতিরক্ষা-সচিব ডিন চেনি বলে গিয়েছেন, প্রায় একমাস লড়াই করার পরও ইরাকি ফৌজের ষাট শতাংশ লড়াই-ক্ষমতা এখনও অটুট। রেডিও থেকে ভেসে এসেছে সাদ্দাম হুসেনের উদ্দাম কণ্ঠ : ইরাকি ফৌজ উদ্ধার করবে পবিত্র মক্কা মদিনা আর জেরুজালেম। সাদ্দাম আরও বলেছেন, তাঁদেরই সামনে অপেক্ষা করছে জয়।

ডিন চেনি খুবই অবাক হয়ে গেছেন ইরাকের স্থলসৈন্য দেখে। বস্তুত বহুজাতিক শক্তির চেয়ে ইরাকের স্থলসৈন্য অনেক বেশি, ট্যাঙ্কও বেশি। তাই তাঁরা চাইছেন, স্থলযুদ্ধ শুরু না করে বিমানবাহিনী থেকে বোমাবর্ষণ করে ইরাককে শক্তিহীন করে

দিতে।

মিসেস সিন্‌হা হঠাৎ একদিন জিজ্ঞাসা করলেন, কী হল বিশ্বজিৎ, কাবেরীকে অনেকদিন মাঠে দেখছি নে—

বিশ্বজিৎ মজা করতে চাইল, আমি ওকে ইলোপ করেছি, দেবলীনাদি।

দেবলীনা সিন্‌হার সুন্দর মুখে কৌতুক ফুটে উঠল, শুধু ইলোপ করলেই হবে! আমাদের খাওয়াটা যেন ফাঁকি না যায়।

বিশ্বজিৎ হাসতে চেষ্টা করল, কিন্তু কেন যেন পারল না।

কয়েকদিন পরে হঠাৎ ম্যাকডোনাল্ডসাহেবের মাঠে এক অদ্ভুত দৃশ্য প্রত্যক্ষ করল সবাই। ক্যাথারিন যেমন রোজ একবার করে ডায়মণ্ডহারবার রোড পার হয়ে এদিকে আসেন ম্যাকডোনাল্ডসাহেবের সমাধিতে ফুল দিতে, তেমনই সেদিনও আসছেন চাঁপা আর কমলার হাত ধরে। তবে একটু সকাল-সকাল। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে রয়েছেন আর এক বৃদ্ধা মেমসাহেব। বৃদ্ধা, কিন্তু দেখতে ভারী সুন্দরী। এককালে খুবই যে অপরূপা ছিলেন তা তাঁর চোখের নীলমণির চাউনি, চোখা নাক, লাল টকটকে রং দেখেই বোঝা যায়। এখন প্রায় সত্তরের কাছাকাছি বয়স, কিন্তু ক্যাথারিনের মতো অশক্ত হয়ে পড়েননি। হাঁটছেন বেশ সাবলীল ভঙ্গিতে। আর ভাল করে লক্ষ করলে বোঝা যায়, তাঁর দু-চোখের দৃষ্টিতে এক পরিপূর্ণ বিস্ময়।

নিলয়, রীতেশ, সৌপ্তিক সবাই সেদিকে কিছুক্ষণ কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে চোখ রাখল বিশ্বজিতের দিকে, মেমসাহেবকে চেন না কি, বিশ্বজিৎদা?

ঘাড় নাড়ল বিশ্বজিৎ। সে এই ম্যাকসাহেবের মাঠে দশ বছর ধরে আসছে, এঁকে কখনও দেখেনি।

বৃদ্ধা মেমসাহেব ঘুরে ঘুরে দেখছেন দু-দুটো সবুজ মাঠ, শান-বাঁধানো পুকুর, প্রেয়ার রুম, গির্জা, অর্ফানেজ। অর্ফানেজে ঢুকে কৌতূহলী চোখে দেখছেন ছেলেদের।

কর্নেল অবাক হয়ে দেখছেন মেমসাহেবকে। সাদা ধবধবে গাউন পরনে। তার উপর গাঢ়-নীল রঙের কার্ডিগান। ফাদার উইলিয়াম কোথায় ছিলেন, হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন তৎক্ষণাৎ। মেমসাহেবের কাছে গিয়ে নড্ করলেন সম্ভ্রম জানিয়ে। দু-একটা কথা বলার পর কর্নেলকে কাছে ডেকে পরিচয় করে দিলেন, মিসেস অ্যান, *অস্ট্রেলিয়া থেকে কাল এসেছেন ক্যালকাটা দেখতে। ইন্ডিয়া দেখতে।*

কর্নেল ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন দেখছেন?

—নাইস, ভেরি, নাইস, বিড়বিড় করে বললেন মিসেস অ্যান, তাঁর দু'চোখভরে যেন তখনও স্বপ্ন জড়ানো রয়েছে। সাতসমুদ্র পাড়ি দিয়ে এসেছেন এই বিদেশি

মহিলা। সেই সমুদ্রের রং তাঁর দু-চোখের মণিতে। নীল তারা দিয়ে দেখছেন, পাঁচ দশক আগে কলকাতায় আসা তাঁরই দেশের এক যুবকের হাতে-গড়া এই প্রতিষ্ঠান। এক কিশোরীর কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে যিনি দেশ ছেড়ে চলে এসেছিলেন শিশুদের কল্যাণে নিজের জীবন উৎসর্গ করবেন বলে। যতদিন জীবনধারণ করেছিলেন, সেবাই ছিল তাঁর জীবনের পরমধর্ম।

এত সব দেখতে দেখতে মিসেস অ্যানের দু-চোখ জলে ভরে আসে। দেখছেন, আর বিড়বিড় করে বলছেন, নাইস, ভেরি নাইস।

ফাদার উইলিয়ামের কাছ থেকে কর্নেল এর পর নিচু গলায় যা শুনতে পেলেন, তাতে চমকে উঠলেন প্রবলভাবে। যুবক ম্যাকডোনাল্ডকে প্রত্যাখ্যান করেছিল যে কিশোরী, আজকের মিসেস অ্যান তিনিই। এতকাল পরে জীবনের সায়াহ্নে পৌঁছে দেখতে এসেছেন, তাঁর জীবনের প্রথম প্রেমিকের কৃচ্ছ্রসাধন, সেবা। তাঁর জন্যই এই জীবনভর ত্যাগ, কৃচ্ছ্রসাধন।

সৌপ্তিক ফিসফিস করে উঠল, তাই!

বিশ্বজিৎ তাকিয়ে আছে বৃদ্ধা মেমসাহেবের দিকে, কী আশ্চর্য, সেই তিনিই!

বৃদ্ধা মেমসাহেব তখন আস্তে আস্তে ম্যাকসাহেবের সমাধির কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসেছেন। রাশি রাশি ফুল সমাধির উপর সাজিয়ে দিতে দিতে ভেঙে পড়লেন কান্নায়।

ঘুম-ভাঙা, ফোলা-ফোলা চোখ মেলে মস্ত একটা হাই তুলতে তুলতে অনিমেষ ঘোষদস্তিদারের হঠাৎই খেয়াল হল, ঘুম ভাঙতে একটু দেরিই করে ফেলেছেন আজ। বেশি নয়, মাত্র দশ মিনিট। তবু ভোরের এই দশমিনিট তাঁদের কাছে খুবই অমূল্য। ঠিক সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত বন্ধুদের দাঁড়ানোর কথা শীলপাড়ার মোড়ে। অতএব বিছানা থেকে তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে, দ্রুত তাঁর নৈমিত্তিক কাজকর্ম সারার পর যখন পৌঁছতে পারলেন গন্তব্যে, ততক্ষণে পাঁচটা বেজে পঁয়ত্রিশ। শীলপাড়ার মোড়ে তখন কেউই অপেক্ষায় নেই তাঁর জন্য। নিশ্চয়ই তাঁর দেরি হওয়াতে দুই মাঠ-বন্ধু তাঁকে ফেলে চলে গেছেন মাঠে, এমন ভাবতে ভাবতে দ্রুত মাঠে পৌঁছে দেখলেন, না ক্ষৌণীশ হালদার, না নিশীথ দাশগুপ্ত, দুজনের কেউই তখনও মাঠে পৌঁছননি।

হতভম্ব দৃষ্টি মেলে চারদিকে তাকাতেই দেখলেন, বসন্তকালের হাত-পা গজিয়ে এর মধ্যে লায়েক হয়ে উঠেছে দিব্যি। গাছের ডালে ডালে দোল খাচ্ছে শেষ-ফাল্গুনের সবুজ। রেন-ট্রি গাছগুলোয় এখন সবুজের রমরমা। এ-সবুজ যেন একটু কচি

কলাপাতারঙের, তাতে চোখ পড়লে একটু যেন ছটফটানি জাগে শরীরে। এ-সময়ে মাছেরা টপাটপ বড়শি গেলে।

কাল-পরশু পরপর দু'দিন দু-জায়গায় মাছধরার প্রোগ্রাম আছে তাঁর। কাল ফলতা, পরশু বারাসাত। দুটো পুকুরই নাকি রুই-কাত্‌লায় থইথই। বড়শি ফেললেই—

খবরটা কানে আসা ইস্তক বসন্তকালের মতো নতুন যৌবন এসে যাচ্ছে তাঁর শরীরেও।

সারাজীবন জঙ্গলে-জঙ্গলে কাজ করে বেড়িয়েছেন অনিমেষবাবু। কিন্তু জঙ্গলটাকে ঠিক যেন ভালবেসে উঠতে পারেননি। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের মাঝারি-ধরনের অফিসার ছিলেন, মাইনেও খারাপ পেতেন না, বাঘের সঙ্গেও মোলাকাত হয়েছে বেশ কয়েকবার, কিন্তু জঙ্গলে বাস করে বাঘের সঙ্গে ভাব না করে ভালবেসেছেন জলের মাছকে। ছুটির দিন হলেই ছিপ আর চার নিয়ে বেরিয়ে পড়েন মাছবন্ধুদের সঙ্গে। একগলা রোদ্দুরে বসে ফাতনার দিকে ঠায় তাকিয়ে থাকতে থাকতে এখন তাঁর গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ থেকে কালো, ঝলসানো, পোড়া-পোড়া, চোখে হাইপাওয়ারের চশমা। গিন্নি কত বকাঝকা করেছেন, ছিপ লুকিয়ে রেখেছেন, ফেলে দিয়েছেন চারের হাঁড়ি, কিন্তু তাঁকে দমাতে পারেননি কোনওদিন।

তাঁর মাছ-ধরার গল্প শুনতে শুনতে সেদিন গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন কর্নেল, মাছ-ধরা হল এক ধরনের এসকেপিজ্‌ম্‌। দেশে এত-এত সমস্যা, সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফাত্‌নার দিকে তাকিয়ে বসে থাকা মানে ওয়েস্টেজ অব টাইম অ্যান্ড ম্যানপাওয়ার।

অনিমেষ ঘোষদস্তিদার সেদিন ভারী ফাঁপরে পড়ে গিয়েছিলেন কর্নেলের অমন বিশাল ব্যক্তিত্বের সামনে দাঁড়িয়ে।

কর্নেল তখন বলছিলেন, দেশটার কী হল বলুন তো! এদিকে একদল হিন্দুত্বের তাস খেলছে, আর একদল জাতপাতের তাস। এরপর তো গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে ভারতবর্ষে! একদিকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, অন্যদিকে জাতপাতের দাঙ্গা। ফাদার উইলিয়ামও সেদিন বলছিলেন, আরও কত যে ডালিমের সৃষ্টি হবে ভারতবর্ষে তা ভাবা যাচ্ছে না।

অনিমেষ ঘোষদস্তিদার চমকে উঠলেন, ডালিম!

—হ্যাঁ। ক্ষমতার লোভে মানুষ যে কত নীচে নামতে পারে তা ক'বছর আগেও এভাবে ভাবা যেত না। নিরপেক্ষতার নাম করে একদল আবার তোষণনীতিতে মত্ত। যত তোষণনীতি চলবে, হিন্দুত্ব হু-হু করে ছড়িয়ে পড়বে চারদিকে। ক'দিন আগেও

তো এত হিন্দুত্বের জিগির ছিল না। তোষণনীতির জন্যই তো—

অনিমেষ হেসেছিলেন, ওই যে বললেন, ক্ষমতার লড়াই। হিন্দুত্ব, জাতপাত, আর তোষণ, তিনটে মেজরপার্টি এখন তিনরকম তাস নিয়ে খেলতে শুরু করায় সাধারণ মানুষ বিপাকে। রাজায়-রাজায় যুদ্ধ হলে উলুখাগড়ারাই তো মারা যাবে, কর্নেলদা।

একদিকে যুদ্ধের খবর, অন্যদিকে নোংরা রাজনীতির খেলা, দুয়ের মধ্যে পড়ে গোটা ভারতবর্ষের পরিস্থিতি দিনদিন অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠছে। ক্রমশ সম্পর্কের ফাটল বেড়ে যাচ্ছে মানুষের মধ্যে। চিন্তার কথাই বটে। এতসব দুশ্চিন্তার মধ্যে কাল বিকেলে হঠাৎ একটা ভারী খাম তাঁদের লেটার-বক্স থেকে বেরুতেই আপাতত অনিমেষ ঘোষদস্তিদারের সামনে এক মস্ত গেরো।

কাল চক্রধরপুর থেকে নতুন পুত্রবধুর এই চিঠি এসে পৌঁছতে এমন গোল বেধে গেছে তাঁর বাড়িতে যে, রাতে ঘুমোতেই পারেননি ভাল করে। কোথায় ভাবলেন বিয়ে করে ছেলে তার বৌ নিয়ে হনিমুনের মেজাজে কাটাবে হাসপাতালের নতুন কোয়ার্টারে, তা তো নয়ই, বরং সে নাকি ড্যাম্ ব্যস্ত তার হাসপাতাল আর রুগি নিয়ে, সারাদিন পড়ে আছে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে। কী, না উনি দেশসেবা করছেন!

নতুন পুত্রবধু চিঠিতে লিখেছে, আপনারা যদি এই মুহূর্তে আমাকে এখান থেকে না নিয়ে যান তাহলে আমি নির্ঘাত একটা কিছু করে বসব। সকাল থেকে গভীররাত পর্যন্ত আপনার ছেলে হাসপাতাল নিয়ে মেতে থাকে। দুপুরে দয়া করে আধঘণ্টার জন্য কোয়ার্টারে খেতে আসেন, তাও কথা বলার সময় পর্যন্ত তাঁর নেই, খেয়েই আবার হাসপাতালে। বিরক্ত হয়ে গত কয়েকদিন বিকেলে আমি আশপাশের দু-তিনটে কোয়ার্টারে গিয়েছিলাম ভাব জমাতে। সেটা শুনতে পেয়ে আপনার ছেলে ভীষণ বকাবকি করেছে। পরদিন থেকে বেরুবার সময় আমাকে কোয়ার্টারের ভেতর তালা বন্ধ করে রেখে যাচ্ছে। আজ সামান্য ফুরসত পেয়ে এই চিঠিতে আপনাকে সব অবগত করলাম। নিজের বাড়িতে জানালাম না এই কারণে যে, সব শুনলে আমার মা-বাবা ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। তাছাড়া আমার স্বামী আমি নিজেই পছন্দ করেছি, তাতে আমার মা বাবার কোন দায়ভাগ নেই।

চিঠি পড়া ইস্তক অনিমেষবাবুর স্ত্রী ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। কাল রাতে বলেছেন, এক্ষুনি চক্রধরপুর নিয়ে চলো। কিন্তু গিন্নির তো যাব বললেই ল্যাটা চুকে গেল। তিনি এখন কী করেন! শ্যাম রাখবেন, না কুল রাখবেন! পর-পর দুদিন চুটিয়ে মাছ ধরবেন, না ছেলের বৌকে উদ্ধার করতে ছুটবেন চক্রধরপুর!

ব্যাপারটা গিন্নির সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে ঘুমোতে একটু রাতই করে ফেলেছিলেন কাল। ফলে সকালে ঘুম ভাঙতে এই দেরি।

ঘটনাটা সবিস্তারে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করবেন ভেবেছিলেন, এখন তাঁদের না দেখতে পেয়ে গাছে-গাছে বসন্ত-সমাগম দেখতে থাকেন অন্যমনস্ক হয়ে।

তাঁর ছেলেটা যে একটা আহাম্মক তাতে সন্দেহ নেই। সুন্দরী বৌ, প্রেম করে বিয়ে করেছিস, চুটিয়ে তাকে নিয়ে ক'টা মাস বিভোর থাকবি, তা নয় উনি দিনরাত ব্যস্ত হয়ে রুগি দেখছেন! আর তাতে তাঁর মাছ ধরার বারোটা বাজতে চলল!

মাঠে ঢুকতেই দেখা হয়ে গেল মিসেস সিন্‌হার সঙ্গে। এই ভোরবেলাতেই বেশ সেজেগুজে এসেছেন দেবলীনা। হাঁটাচলায় এখনো তরুণী বলে চালিয়ে দিতে পারেন দিব্যি। অনিমেষবাবু হেসে বললেন, কী ব্যাপার, পুজোর সময় তো খুব বেড়িয়ে এলেন রাঁচী-রাজগীর। আবার নাকি বেড়াতে যাচ্ছেন?

মিসেস সিন্‌হাকে হাসলে ভারী সুন্দর দেখায়, বললেন, হ্যাঁ, সিমলা-কুলু-মানালি। কালকা-মেলের টিকিটও কাটা হয়ে গেছে। এখন তো দু'মাস আগে টিকিট না কাটলে রিজার্ভেশন পাওয়া যায় না।

—বাহ্, বেশ বেশ। এখন সিমলার দিকেই তো ট্যুরিস্টদের ভিড় বাড়ছে। কাশ্মীর যাওয়া একরকম বন্ধই হয়ে গেল। সেবার টিকিট কেটেও যেতে পারিনি আমরা। মেয়ের অসুখ হওয়ায় টিকিট ক্যানসেল করতে হয়েছিল। ফলে এ জীবনে বোধহয় আর কাশ্মীর দেখা হল না। তা সিম্‌লা-ট্যুর চমৎকার। আমি তিন-চারবছর আগেই ঘুরে এসেছি।

—খুব নাকি বরফ ওখানে!

—আপনারা মে-তে যাচ্ছেন তো! একমাত্র রোটাং পাসেই বরফ পাবেন। তবে ডিসেম্বরে সিমলা পর্যন্ত বরফ-এ ঢেকে যায়।

—খুব শীত?

—রোদ্দুর থাকলে তেমন শীত লাগে না। কিন্তু ওয়েদার কোলাপ্‌স্ করলে হাড় কাঁপিয়ে দেবে। প্রোটেকশন নিয়ে যাওয়াই ভালো। তবে খুব এনজয় করবেন। মানালি ইজ বিউটিফুল। মাঝেমধ্যে এইসব হিলি স্টেশনে বেড়াতে গেলে মনের জানালাগুলো সব খুলে যায় টপাটপ।

—যা বলেছেন। কলকাতায় থাকতে থাকতে একঘেয়ে লাগে। মনে হয়, কখন এই ভিড়ভাট্টা লোডশেডিং ছেড়ে একটু বেরোব। ক'দিন ঘুরে এলে মনটা বেশ ভালা হয়ে যায়। তখন আবার কদিন কলকাতা ভালো লাগে। বিশেষ করে সকালের এই মাঠটা। এ-জায়গাটা বেহালাবাসীর কাছে একটা আকর্ষণ।

মিসেস সিন্‌হার সঙ্গে কথা বলতে বেশ ভালোই লাগছিল অনিমেষবাবুর। ভদ্রমহিলা খুবই সুন্দরী, কিন্তু দেমাক নেই। সবার সঙ্গেই সহজভাবে কথা বলেন।

কথা বলতে বলতে অনিমেষবাবুর মনটা হঠাৎ ভালো হয়ে গেল। বললেন, ঠিকই বলেছেন, ভাবছি, ফাদার উইলিয়ামকে একটা প্রস্তাব দেব। বলব, ডায়মণ্ডহারবার রোডের মুখে একটা ফলক পুতে তাতে লিখে দিন, ইফ দেয়ার ইজ এনি হেভেন, ইট ইজ হিয়ার।

মিসেস সিন্‌হা হাসতে হাসতে চললেন রাউন্ড শুরু করতে।

অনিমেষবাবুর ততক্ষণে চোখ পড়েছে ডালিমের দিকে। নীলগেঞ্জি নীল শর্টস্ পরা ডালিম কোণাকুণি দৌড় দিচ্ছে মাঠের সবুজ ঘাস মাড়িয়ে। এ ক'দিন ওর গায়ে সোয়েটার ছিল, উজ্জ্বল হলুদ রঙের সোয়েটার। সোয়েটারটা ওকে বুনে দিয়েছেন ম্যাকসাহেবের স্কুলের নতুন আন্টি বন্দনা রায়।

ডালিমের গায়ে সোয়েটার না দেখে অনিমেষবাবুর খেয়াল হল, শীত এতদিনে বেশ কমে এসেছে। সকালের দিকে সোয়েটার না পরলে গা একটু শিরশির করে বটে, কিন্তু দু-এক রাউন্ড মাঠে ঘুরতে না ঘুরতে গরম হয়ে ওঠে শরীর। সামান্য ঠাণ্ডা হাওয়াটা তখন বেশ উপভোগ্য মনে হয়।

দু-চারবার কোণাকুণি ছুট দিয়ে এবার ডালিম মাঠের একপাশে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে। এতক্ষণ লোকের ভিড়ে খেয়াল করেননি অনিমেষবাবু, এখন দেখলেন ডালিমের পাশে দাঁড়িয়ে আছে ওদের স্কুলের নতুন আন্টি বন্দনা রায়। সবুজ সবুজ জংলাছাপা শাড়ি বন্দনার পরনে। মুখেচোখে একটা আলগা শ্রী আছে। আপাতদৃষ্টিতে তাকে একটু গম্ভীর, হয়তো বা একটু বিষণ্ণও মনে হয়, কিন্তু এই মুহূর্তে ডালিমেরও ছোটাছুটির দৃশ্যটিকে সে উপভোগ করছে মুখমণ্ডলে এক আশ্চর্য উজ্জ্বলতা ফুটিয়ে।

টোটন তার বাবার সঙ্গে চলে যাওয়ায় ক'দিন ধরে ভারী মুষড়ে পড়েছিল ডালিম। দু-তিনদিন ভালো করে খাওয়াদাওয়াই করেনি। পড়ার বই নিয়ে বসেও অন্যমনস্ক হয়ে থাকত। নতুন আন্টি বন্দনা রায় তাই ডালিমকে ক্রমাগত সঙ্গ দিয়েছেন এ ক'দিন। মাঝেমধ্যে বেড়াতেও নিয়ে গিয়েছেন এখানে-ওখানে। ফাদার উইলিয়াম সেদিন বলছিলেন, মাত্র কয়েকদিনেই বন্দনা রায় ভারী প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছেন সব ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে।

কয়েকবার ছোটাছুটি করে বোধহয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ডালিম। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে সে এখন তার বন্দনা-আন্টির হাত ধরে ফিরে চলেছে অর্ফানেজের দিকে। অনিমেষবাবু তার মুখোমুখি হতেই মৃদু হেসে বললেন, সুপ্রভাত, ডালিম।

ডালিমও একগাল হেসে বলল, সুপ্রভাত, জেঠু। পরক্ষণেই সে আবার কাকে যেন বলে উঠল, সুপ্রভাত, কর্নেলজেঠু।

অনিমেষবাবু চমকে পেছন ফিরে দেখলেন, কর্নেল রায়চৌধুরী এসে দাঁড়িয়েছেন

সেখানে। বন্দনা রায়ের হাত ধরে ডালিমের লাফাতে লাফাতে ফিরে যাওয়ার দৃশ্যটিকে তিনি মুগ্ধ হয়ে দেখছেন। বেশ অনেকক্ষণ দেখার পর হঠাৎ বিড়বিড় করে বললেন, বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে। দেখছেন, মাত্র কয়েকদিন এসেই বন্দনা কীরকম আপন করে নিয়েছে ওদের! ডালিমের চোখেমুখেও একটা আশ্চর্য গ্লেজ লক্ষ করছি ক'দিন ধরে। বহুদিন মায়ের স্নেহ পায়নি যে ছেলেটা, হঠাৎ তা পাওয়ার পর ওর ভেতরে একটা আশ্চর্য পরিবর্তন।

বলতে বলতে কর্নেলের চোখমুখও যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বিড়বিড় করে বললেন, পৃথিবীতে এমন সব সুন্দর দৃশ্য দেখতে পাওয়ার জন্যই আমাদের মানবজন্ম সার্থক। তখন আরও কিছুকাল বেঁচে থাকতে লোভ হয়। মনে হয়, হাউ বিউটিফুল দি ওয়ার্ল্ড ইজ!

সুরঞ্জন রাউন্ড দিচ্ছিল একমনে। হঠাৎ কর্নেলকে দেখে এগিয়ে এল দ্রুত, গুডমর্নিং, কর্নেলদা।

—গুড্‌মর্নিং। কেমন ফীল করছ আজকাল?

—খুব ভালো। আপনার অটো সাজেশন দারুণ কাজ দিয়েছে। মনে হচ্ছে, নতুন জীবন ফিরে পাচ্ছি।

—ফাইন, ফাইন, আবারও স্বপ্নাবিষ্টের মতো বিড়বিড় করলেন কর্নেল, অসুখের কথা একদম ভাববে না। অসুখ মানুষের মনেই বেশি।

—কিন্তু একটা খারাপ খবর আছে, সুরঞ্জন মুখ ম্লান করে বলল, অনিরুদ্ধ শাসমলের স্ত্রী কাকলিকে হঠাৎ হসপিট্যালাইজ্ করতে হয়েছে। ক'দিন ধরে খুব টান উঠেছিল। হঠাৎ পরশু রাত থেকে বাড়াবাড়ি।

—মাই গড্, তাই নাকি! মেয়েটা বড্ড নেগলেক্ট করত নিজেকে। ক'দিন মর্নিং ওয়াক করতে আসছিল গলায় মাফলার না বেঁধেই। তখনই বারণ করেছিলাম ওকে।

অনিমেষবাবু অবাক হয়ে বললেন, অনিরুদ্ধ শাসমল নিজেও তো অসুস্থ। আবার তাঁর স্ত্রীও!

—অনিরুদ্ধ খুবই অসুস্থ। সেদিন আমার সঙ্গে দেখা হতেই বলল, 'এখনও বেঁচে আছি, কর্নেলদা। প্রতিদিন ঘুম ভেঙে উঠে মনে হয়, যাক্, আরও একদিন বেড়ে গেল আয়ু। এভাবে যে ক'টা দিন পারা যায়।' এর মধ্যে কাকলি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে তো ভারী চিন্তার কথা। ওদের মেয়েটা এবার ক্লাস টেনে উঠবে। কিন্তু কোথায় আছে বলো তো—কোন হাসপাতালে?

সুরঞ্জনের কাছ থেকে হাসপাতালের নাম, বেড-নম্বর সব জেনে নিলেন কর্নেল। তারপর দু'জনে হাঁটতে লাগলেন নিঃশব্দে। অনিমেষ ঘোষদস্তিদারের বুকের

ভেতরটাও ভারী হয়ে রইল কিছুক্ষণ। এক-একদিন মাঠে এসে এমন সব খারাপ খবর কানে আসে যে, তাতে সারাদিন ঝিম মেরে থাকে মনটা। তিনি নিজে হৈ-হুল্লোড় করে থাকতে ভালোবাসেন। নিজের সংসার, আর বন্ধুদের সঙ্গে হৈ-হল্লা নিয়েই বেঁচে থাকতে ইচ্ছে হয় শুধু। তবু তার মধ্যে ঢুকে পড়ে এতসব জটিল সমস্যা। এত সব সমস্যায় কিছু করার থাকে না তাঁর, তবু মনটা তো খারাপ হয়ে থাকে!

খানিকক্ষণ থম্ হয়ে দাঁড়িয়ে এগিয়ে গেলেন কংক্রিটের বেঞ্চের দিকে। দেখলেন, এর মধ্যে কখন যেন এসে পৌঁছেছেন নিশীথ দাশগুপ্ত।

তাঁকে দেখেই নিশীথবাবু হামড়ে পড়লেন প্রায়, কী ব্যাপার, আপনার জন্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাল্লা হয়ে গেলাম, আর আপনি মাঠে চলে এসেছেন?

অনিমেষবাবু অবাক হয়ে বললেন, দাঁড়িয়ে ছিলেন মানে? আমি পাঁচটা পঁয়ত্রিশে শীলপাড়ার মোড়ে এসে দেখলাম আপনারা কেউ নেই, তাইই—

—পাঁচটা পঁয়ত্রিশে? নিথীথবাবু হতবাক, আমি তো ঠিক সাড়ে পাঁচটায় পৌঁছেছি মোড়ে। দেখি দেখি আপনার ঘড়ি—। এ হে, আপনার ঘড়ি তো দশমিনিট ফাস্ট।

অনিমেষবাবু স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রইলেন নিজের ঘড়ির দিকে। যেন দশমিনিট এগিয়ে চলেছে তাঁর ঘড়ির কাঁটা এ তথ্যটি বিশ্বাস হল না।

নিশীথবাবু তাঁর মুখে পানের জাবর কাটতে কাটতে বললেন, মিঃ ঘোষদস্তিদার যে আজকাল ঘোড়া নিয়ে মাঠে আসছেন তা জানতাম না। ফরেস্ট তো জিপ চড়তেন শুনেছি—

অনিমেষবাবু ঝটিতি উত্তর দিলেন, আর মশাই ঘোড়ায় চড়ার দিনই তো এসে গেছে এখন। দেখছেন না, যুদ্ধ বাধার ফলে পেট্রল, ডিজেল আসা বন্ধ হতে চলেছে। তেল না এলে গাড়ি চলবে কী করে? গাড়ি না চললে লোকে যাতায়াত করবে কীভাবে? আবার ঘোড়ার যুগ ফিরে আসছে এ দেশে। তাই আগে থেকেই প্র্যাকটিশ করে রাখছি—

নিশীথবাবু তাঁর জাবর কাটা বন্ধ করে বললেন, শুনছি, তেলের দাম আবার বেড়ে যাচ্ছে। এমনিতেই জিনিষপত্রের দাম বেড়ে গেছে। তেলের দাম বাড়লে তো আরও বাড়বে।

তারপর এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিশীথবাবু আবার জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু মিঃ হালদার কোথায়? আজ মাঠে আসবেন না নাকি? সেদিন আপনারা দুজন প্রফেসরকে দেখতে গিয়েছিলেন শুনলাম।

—গিয়েছিলাম। খুব দুর্বল হয়ে পড়েছেন প্রফেসর। সুগার কিছুতেই কমছে না।

রোজ ইনসুলিন চলছে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে কেবলই যুদ্ধের গল্প করে গেলেন। বলছিলেন, ইরাকে যা হচ্ছে, সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার তার কাছে নস্যি।

সর্বত্রই এখন যুদ্ধের গল্প। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হবে কি হবে না এই নিয়ে ঘরে-বাইরে-অফিসে-ট্রামে-বাসে সর্বত্র জল্পনা চলছে। যুদ্ধের অভিনবত্বে, ব্যাপকতায় সমস্ত পৃথিবী শিহরিত। গর্বাচেভ দু-দফা শান্তি-চুক্তি দিয়েছেন। জর্জ বুশ বলেছেন, নো নিগোশিয়েশন, নো কমপ্রোমাইজ। সেন্ট্রাল বাগদাদে গত কয়েকদিন আগে রাতে সাংঘাতিক বোম্বিং হয়েছে। উপসাগরীয় যুদ্ধে এতাবৎকালের মধ্যে নাকি এমন বোম্বিং আর হয়নি। কুয়েত বাঙ্কার একদম ধ্বংস। কয়েকশো ইরাকি বন্দি। তবুও ইরাকের ঘোষণা, যুদ্ধ চলবে।

নিশীথ দাশগুপ্ত বললেন, এ কদিন আমেরিকা স্থলযুদ্ধ আরম্ভ করেনি কেন জানেন? মরুভূমিতে স্থলযুদ্ধ করতে হলে সৈন্যদের যে ধরনের মোজার দরকার হয়, তা নাকি তারা সাপ্লাই করে উঠতে পারেনি।

যুদ্ধের এহেন ডামাডোলের মধ্যেই হঠাৎ খবর এল, গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন গুড্‌মর্নিং বোস। বেশ কয়েকদিন তাঁকে দেখা যাচ্ছিল না মাঠে। কেউ কেউ ভাবছিলেন, হয়তো শেষ পর্যন্ত হিমালয়ের পথেই রওনা হয়ে গেছেন। কিন্তু না—

নিশীথবাবু হাসলেন, বুঝলেন, এই অসুস্থতা হল গিয়ে সাইকোলজিক্যাল। আবার নাকি মনে মনে প্রস্তুতি নিয়েছিলেন হিমালয়ে যাবেন বলে। কিন্তু ছেলেরা আবারও নিষেধ করেছে, দেশের অবস্থা ভালো নয়। যুদ্ধ ছড়িয়ে যেতে পারে ক্রমশ। এখন বেরুনো ঠিক হবে না। হয়তো তাইই—

—তাহলে চলুন, আজ বিকেলে একবার গিয়ে দেখে আসি ওঁকে। আমরা দেখা করতে গেলে নিশ্চয় একটু উৎসাহ পাবেন।

—উঁহু আজ-কাল-পরশু পরপর তিনদিন হবে না। অফিসে কাজ পড়েছে খুব। ইয়ার এন্ডিং চলছে তো, রাত পর্যন্ত থাকতে হচ্ছে।

অনিমেষবাবু ঘাড় নেড়ে বললেন, তাহলে আর এখন হল না। পরশুর পর থেকে আমিও আবার ক'দিন থাকছি না।

—কোথায় যাচ্ছেন, আবার মাছ ধরতে বুঝি?

—হ্যাঁ। তবে মাছ ধরতে নয়। ধরা শেখাতে। চক্রধরপুরে। আমার ছেলেটা আমার সঙ্গে এতকাল জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে বাঘ-সিংহ হয়নি, হয়েছে একটা হনুমান।

নিশীথবাবু বিস্মিত হয়ে তাঁর দিকে তাকাতেই অনিমেষবাবু সংক্ষেপে বিবৃত করলেন পুত্রবধুর চিঠির এপিসোড্‌টি। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, আমার এত মাছ ধরার নেশা। কিন্তু ছেলেটা মাছ ধরতে শিখল না। বৌও একধরনের মাছ।

গভীরজলের মাছ। তাকে ঠিকমতো খেলাতে জানতে হয়। চার ফেলে তৈরি করতে হয় মাছ-ধরার জমি। জমি বা জল যাই বলুন না কেন। জমি তৈরি হলে তারপর বড়শিতে চার গেঁথে ছুঁড়ে দিতে হয় গভীর জলে। ঠিকমতো চার ফেললে গাঁথবেই গাঁথবে। কিন্তু গাঁথার পরই তো শুরু হয় আসল খেলা। ঠিক হিসেব করে সুতো ছাড়তে হবে হুইল থেকে, আবার সময়মতো গুটিয়েও নিতে হবে। এই ছাড়া-গোটানো না জানলেই ফস্‌কে পালিয়ে যাবে মাছ। আর জানলে গুটিগুটি বশ মেনে চলে আসবে কাছে। হনুমানটা ডাক্তারি কেমন শিখেছে কে জানে। শুনতে পাই ভালোই শিখেছে। কিন্তু মাছ ধরাটা শেখেনি।

নিশীথবাবু আশ্চর্য হয়ে বললেন, কিন্তু আপনার ছেলের সঙ্গে কথা বলে তো মনে হয়, খুবই ইনটেলিজেন্ট।

—আমারও তো তাই মনে হত। সেদিন আমাকে বলল, এই যে রিটায়ারমেন্টের পর তোমরা বন্ধু খুঁজে পেয়েছ, এটা খুব ভালো লক্ষণ। এতে আরও লঙ্‌ লাইফ্‌ এনজয় করতে পারবে। যারা রিটায়ারমেন্টের পর একা হয়ে যায় তাদেরই হয় মুশকিল। হঠাৎ চট্‌ করে বুড়ো হয়ে যায় তারা—

—তাহলে মানতেই হচ্ছে, ইওর সন ইজ অ্যা গ্রেট ডক্টর। যে ডাক্তার শুধু প্রেসক্রিপশনই লেখে না, সাইকোলজিক্যাল ব্যাপারটাও বোঝে—

আবার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন অনিমেষবাবু, কিন্তু ডাক্তার যে তার বৌ-এর সাইকোলজি এখনও বুঝতে শিখল না, মিঃ দাশগুপ্ত! নতুন বৌকে ঘরের ভেতর তালাবন্দি করে রেখে দুনিয়ার লোকের চিকিৎসা করে বেড়াচ্ছে। প্যারাডক্স আর কাকে বলে?

নিশীথবাবু ফের পানে জাবর কাটতে কাটতে বললেন, তাহলে আমার ছেলেটাকে ছোটবেলা থেকেই মাছ ধরার কলাকৌশল শেখাতে শুরু করি কী বলেন! বিয়ের পর বৌ নিয়ে যাতে জেরবার হয়ে না পড়ে—

তাঁর কথা শেষ না হতেই হঠাৎ দূরের দিকে নজর পড়তে দেখা গেল হন্তদন্ত হয়ে হেঁটে আসছেন ক্ষৌণীশ হালদার। অন্যদিনকার চেয়ে একটু জোরেই হাঁটছেন। বোধহয় অনেক দেরি হয়ে গেছে বলেই এই তাড়া। কিন্তু ঘড়িতে প্রায় পৌনে সাতটা বাজতে চলল! মাঠ ফাঁকা হয়ে আসছে আস্তে আস্তে। ক্ষৌণীশবাবুকে দ্রুত পায়ে হেঁটে আসতে দেখে কিছু একটা রসিকতা করতে যাচ্ছিলেন অনিমেষবাবু, কিন্তু কাছে আসতেই তাঁর চোখ-মুখের অবস্থা দেখে থমকে গেলেন হঠাৎ। যেন ঝড়বিধ্বংস চেহারা ক্ষৌণীশ হালদারের।

—কী হয়েছে, মিঃ হালদার!

ক্ষৌণীশ হালদার এসে ধুপ করে বসে পড়লেন কংক্রিটের বেঞ্চে। কয়েক মুহূর্ত কোনও কথাই বলতে পারলেন না। চোখের দৃষ্টি স্থির, শূন্য। পরিপূর্ণ হতাশার ছাপ গোটা চেহারায়। বেশ কিছুক্ষণ পর ভাঙা গলায় বললেন, একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেলাম।

দুজনে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন তাঁর দিকে, কী হয়েছে? অমন করছেন কেন? কোনও দুর্ঘটনা?

—আমার সর্বনাশ হয়ে গেল। মেয়েটাকে বোধহয় জলে ফেলে দিলাম।

—কী হয়েছে আপনার মেয়ের? কোনও অ্যাকসিডেন্ট!

—এর চেয়ে দুর্ঘটনায় আমার মেয়ে মারা গেলেই বোধহয় ভাল হত। নিজের হাতে যে ভাবে সর্বনাশ করলাম তার, তা ভেবে শিউরে উঠছি।

খানিকক্ষণ থেমে থেমে, ভাঙা গলায়, প্রায় একরাশ কান্না মিশিয়ে যা জানালেন ক্ষৌণীশ হালদার, তা স্তম্ভিত হওয়ারই মতো। মেয়ে-জামাই আসাম রওনা হওয়ার পর যখন বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে আছেন তাঁরা, হঠাৎ কাল বিকেলে তাঁর বাড়িতে হাজির হয়েছিল এক বিবাহিতা তরুণী, তার সঙ্গে বছর তিনেকের একটি বাচ্চা। মেয়েটি এসে কেঁদে পড়ল তার কাছে। তার কথায় জানতে পারলেন, ক্ষৌণীশবাবুর জামাই অনেক আগেই নাকি বিয়ে করেছিল এই মেয়েটিকে। বাচ্চাটিও তার। কলকাতা থেকে আসামে চাকরি নিয়ে চলে যাওয়ার পর সে আর কোনও খোঁজখবরই নেয়নি মেয়েটির। হঠাৎ কাউকে না জানিয়ে ফের ক্ষৌণীশবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁর মেয়েকে বিয়ে করে ফিরে গেছে আসামে।

শুনে চমকে উঠলেন নিশীথ দাশগুপ্ত, কী বলছেন কি, মিঃ হালদার? পাত্র দেখার সময় তার সম্পর্কে খোঁজখবর নেননি?

ক্ষৌণীশ হালদার কথা বলতে পারছেন না। তাঁর চোখে শূন্যদৃষ্টি। মুখ ফ্যাকাশে, নিথর।

অবিশ্বাস্যচোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন নিশীথ দাশগুপ্ত আর অনিমেষ ঘোষদস্তিদার। ভারী খুঁতখুতে মানুষ ক্ষৌণীশবাবু। যখন বিচার করতেন কোর্টে, পুরোপুরি নিঃসন্দেহ না হয়ে রায় লিখতে বসতেন না। যে-মানুষটা সারাজীবন গুরুত্বপূর্ণ পোস্টে চাকরি করেছেন, কত মামলার রায় লিখেছেন, তিনিই কিনা এমন একটা ভয়ঙ্কর ভুল করে ফেললেন! নিজের মেয়ের বেলায়ই লিখে ফেললেন এরকম ভুল জাজমেন্ট!

আর অনিমেষ ঘোষদস্তিদার তখন নিজের মনে মাথা নাড়ছেন। আজ সকাল থেকে পরপর শুধু খারাপ খবর পাচ্ছেন। মন-খারাপ হওয়ার খবর। সেই কাল

বিকেলে তাঁর পুত্রবধুর কাছ থেকে চিঠিটা পাওয়ার পর থেকেই মনটা খারাপ হয়ে আছে তাঁর।

কর্নেল সেদিন ব্রহ্মচারীসাহেবকে নিয়ে পড়েছেন, বললেন, একদম একা হয়ে গেলাম যে, ব্যারিস্টার। প্রফেসর কতদিন হল আসছেন না, আপনিও মাঠে এসে বেঞ্চের উপর বসে থাকেন চুপচাপ, আমি একা কাঁহাতক মাঠে ঘোরাঘুরি করি!

ব্রহ্মচারীসাহেবের মুখে হাসির ভাব ফুটে আছে, কিন্তু তাঁর চোখমুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, ভেতরে-ভেতরে ভীষণ একটা যন্ত্রণা। অমন বিশাল শরীরের মানুষটা, এককালের দোর্দণ্ডপ্রতাপ ব্যারিস্টার, কোর্টে দাঁড়ালে বিপক্ষের ব্যারিস্টার-উকিলরা প্রমাদ গুণতেন মনে মনে, এই কমাস আগেও অন্ধকার থাকতে চলে আসতেন মাঠে সবার আগেই, হঠাৎ অসুস্থ হয়ে হারিয়ে ফেলেছেন চলার শক্তি। হাতে লাঠি নিয়ে ডানপায়ে ভর রাখতে গেলেই মনে হয় শরীরটা টলে যাবে মুহূর্তে।

তবু কর্নেল সাহস জুগিয়ে যাচ্ছেন সমানে, আপনার শরীরে আর তো কোনও অসুখ নেই আপাতত। তাহলে এত ভয় কীসের! ডাক্তার তো বলেছে, আরও বেশি হাঁটতে হবে। হাঁটাটাই এখন আপনার ব্যায়াম। হাঁটতে হাঁটতে বল ফিরে পাবেন পায়ে। মনে আর একটু জোর আনুন। দেখবেন, মনে জোর থাকলে আর পড়বেন না।

নীলেশ ব্রহ্মচারী এক-পা এক-পা এগোতে থাকেন। খুবই আস্তে, লাঠিতে ভর দিয়ে দিয়ে। কখনও কর্নেল তাঁর হাত ধরে থাকেন, তাতে একটু মনে জোর পান। হাঁটতে হাঁটতে পার হয়ে যান গোলপোস্ট। রেন-ট্রি গাছের তলা দিয়ে শান-বাঁধানো পুকুরের কাছে পৌঁছে বাঁক নেন বাঁদিকে। পুকুরের ধার-বরাবর হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ কানে আসে প্রার্থনাগৃহ থেকে পিয়ানোর টুং-টাং শব্দ। তারপর সমবেত কোরাস, দাউ লিভ ইন আওয়ার হার্ট, ও গড্—

প্রার্থনা-সংগীতের সুরে যেন সব সময়েই একটা জাদু মাখানো থাকে। যতই সুর ছড়িয়ে পড়তে থাকে হাওয়ায়, ততই মনটা একটু-একটু করে ভালো হতে থাকে। তাতে খানিকটা সাহস মেশানো থাকে, খানিকটা পবিত্রতা, খানিকটা ঈশ্বর-ঈশ্বর অনুভূতি।

গান শুনতে শুনতে নিঃশব্দে এগোতে থাকেন নীলেশ ব্রহ্মচারী।

যতক্ষণ প্রার্থনা-সংগীত হয়, ততক্ষণ কোনও কথাই যেন আর বলতে ভাল লাগে না কর্নেলের। সে সময়টুকু তিনিও যেন একাত্ম হয়ে যান অনাথ শিশুদের সঙ্গে। ভাসা ভাসা চোখের কয়েকটি অনাথের সঙ্গে তিনি নিজেও যেন বিড়বিড় করতে থাকেন,

ও গড্, দাউ লিভ ইন আওয়ার হার্ট—

আজকাল প্রায়শ এই অনাথ শিশুদের মতো কেমন যেন নিঃস্ব মনে হয় নিজেকে। এই সকালের সময়টুকু এতকাল ঐশ্বর্যে ভরা ছিল তাঁর। কতদিন ধরে তিন বন্ধু ভোরের মুহূর্তগুলো একযোগে উপভোগ করতেন। রাত থাকতে উঠে প্রস্তুত হয়ে ডানহাতে ছড়ি ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়তেন মাঠে। এসে রোজই দেখতেন ব্যারিস্টার নীলেশ ব্রহ্মচারী বড় বড় স্টেপ ফেলে রাউন্ড দিচ্ছেন মাঠে। দেখা হলেই বড় করে একটা শ্বাস নিয়ে, সবুজ হাওয়ায় শরীর পরিপূর্ণ করে বলতেন, সুপ্রভাত, কর্নেল। কিছুক্ষণ দুজনে একসঙ্গে ঘোরার পর দেখা যেত ছোট্টখাট্টো চেহারার অধ্যাপক খাসনবীশ হেঁটে আসছেন ছোট-ছোট পায়ে। ফিনফিনে ধুতির কোঁচা কখনও লুটিয়ে থাকে ঘাসের উপর। দেখা হতেই চমৎকার করে বলতেন, সুপ্রভাত কর্নেল, সুপ্রভাত ব্যারিস্টার। তারপর তিনজনে সবুজ বাতাসে শরীর ভরতে ভরতে ঘুরতেন মাঠের চারদিকে।

অথচ এখন দৃশ্যপট বদলে গেছে পুরোটাই। কতদিন ধরে অধ্যাপক খাসনবীশ শুয়ে আছেন বিছানায়, আগের চেয়ে আরও খানিকটা শ্রিঙ্ক করেছেন মনে হল। কবে ভাল হয়ে মাঠে আসতে পারবেন কে জানে! ব্যারিস্টার ব্রহ্মচারী অর্ধপঙ্গু। মারাত্মক অসুখ তাঁকে এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে। শুধু তাঁদের পাশে একা তিনি, এ মাঠের সর্বজ্যেষ্ঠ সদস্য, এখনও রাউন্ডের পর রাউন্ড হেঁটে যাচ্ছেন ঋজু, দৃপ্ত ভঙ্গিতে।

ব্যারিস্টারকে আজ ধরে ধরে এক রাউন্ড পুরো হাঁটালেন কর্নেল। তাতে ব্যারিস্টার একটু হাঁপাচ্ছেন মনে হল। তাঁকে কংক্রিটের বেঞ্চে বসিয়ে রেখে নিজের পরবর্তী রাউন্ডের জন্য প্রস্তুত হলেন কর্নেল। ঘাসে পা রাখতেই দেখা হয়ে গেল ফাদার উইলিয়ামের সঙ্গে। গির্জার সেই পরিচিত ঘণ্টাধ্বনি এখনও বাজেনি। অন্যদিনকার চেয়ে একটু আগেই বেরিয়েছেন ফাদার। পাদ্রিদের সাদা পোশাকের উপর নীল কোমরবন্ধনী বাঁধা। হাঁটছেনও একটু শ্লথ ভঙ্গিতে। কর্নেলের সঙ্গে দেখা হতেই বললেন, সুপ্রভাত।

—সুপ্রভাত, ফাদার, কর্নেল প্রত্যুত্তরে হাসলেন।

—একটা খুব ভাল খবর আছে, কর্নেল।

—ভাল খবর, বাহ্ বাহ্। কর্নেলের চোখমুখ যেন এক প্রশান্তিতে ভরে উঠল, কী খবর? আজকাল ভাল খবর তো পাওয়াই যায় না।

—খবরটা একদিকে খারাপও বটে। ডালিম আমাদের আশ্রম ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

—তাই নাকি? কর্নেল আশ্চর্য হলেন, কোথায় যাচ্ছে?

ফাদার দাঁড়ালেন, তাঁর মুখে এক অদ্ভুত আলোর আভা, বললেন, সেদিন বন্দনা রায় হঠাৎ এসেছিল আমার বাংলোয়। প্রথমে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল, তারপর নিচু গলায় আস্তে আস্তে বলল, ডালিমকে আমি নিতে চাই, ফাদার, ওকে আমার কাছে দেবেন? আমি তো প্রথমে অবাক। এরকম একটা প্রস্তাব আসতে পারে ভাবিইনি। বললাম, তোমার বাড়িতে কে আছে? তখন বলল ওর সব কথা। বলল, প্রথম বয়সে ও ভুল করেছিল। ভালবেসেছিল একটি যুবককে। সমস্ত ব্যাপারটাই ওর জীবনে একটা চরম ভুল বোঝাবুঝির সময়। একটা মিস্‌হ্যাপ বলা যায়। ছেলেটা ওর সঙ্গে বিট্রে করে। আপাতত ও থাকে ওর মায়ের সঙ্গে। বাকি জীবন এভাবেই কাটিয়ে দেবে। ডালিমকে পেলে ও নিজের মতো করে মানুষ করবে। বলতে বলতে ঝরঝর করে কাঁদছিল ও, বারবার বলছিল, ডালিমকে আমাকে দেবেন? ডালিমকে আমাকে দেবেন, ফাদার?

কর্নেল অবাক হয়ে শুনছিলেন ফাদার উইলিয়ামের কথা। খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে বললেন, তা ভালই তো প্রস্তাবটা—

—বন্দনা বলেছে, ও এখানেই টিচারি করবে, ডালিমকেও এখানে পড়াবে। শুধু আশ্রম থেকে নিয়ে গিয়ে নিজের কাছে রাখবে।

—তা ডালিম কী বলল?

—ডালিম তো মহাখুশি। বলেছে, তাহলে কিন্তু আমি আর আন্টি বলে ডাকব না, মাম্মি বলব।

—বাহ্, চমৎকার, কর্নেলের মুখটা খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, হেসে বললেন, বন্দনা ওকে খুবই ভালবাসে দেখতে পাই। কিন্তু আমরা, যারা সকালে মর্নিং-ওয়াক করতে আসি, তারা ডালিমকে খুব মিস্ করব। ওই যে ভোরে উঠে ছোট্ট একটা লাল, নীল বা সবুজ বলের মতো মাঠের এক কোণ থেকে আর এক কোণের দিকে দৌড় দেয়, ভারী চমৎকার লাগে দৃশ্যটা।

ফাদার হাসলেন, আশ্রমের ছেলেমেয়েরাও তাই বলছিল। ডালিম থাকলে বেশ জমিয়ে রাখে ওদের।

কর্নেল হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, আর অ্যানের খবর কী? উনি কি এখনও আছেন, না কি ফিরে গেছেন দেশে?

ফাদারের মুখটা ভরে উঠল খুশিতে, তাহলে আপনাকে আর একটা ভাল খবর দিই। অ্যান বোধহয় আর দেশে ফিরছেন না। থেকে যাচ্ছেন আমাদের এখানে, পাকাপাকিভাবে। ওঁর জীবনটাও খুব কষ্টের। যাকে প্রথমে বিয়ে করেছিলেন, তার সঙ্গে এক বছরের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। তারপর দ্বিতীয়বার যাকে বিয়ে

করেছিলেন, দশ বছর পরে তিনিও মারা যান। সেও অনেককাল হয়ে গেছে। ওঁর এক ছেলে, এক মেয়ে। দুজনেই অস্ট্রেলিয়ায় সেট্‌ল্‌ড্‌। তারা মায়ের খবর খুব-একটা রাখে না। অ্যান্‌ ঠিক করেছেন, এখানেই থেকে যাবেন, ক্যাথারিনের সঙ্গে। জায়গাটা খুব মনে ধরেছে ওঁর।

—বাহ্‌, বাহ্‌, কর্নেলের বুকটা আনন্দে, খুশিতে ভরে উঠল। আজকাল ভাল খবর খুব একটা পাওয়া যায় না। চারদিকে শুধু অসুখ আর অ-সুখ। এর মধ্যে একমাত্র ফাদারই মাঝেমধ্যে কিছু ভাল খবর দিতে পারেন। এই বিশাল সংসার নিয়ে বেশ ভালই কাটাচ্ছেন ফাদার উইলিয়াম। সব সময়ই এক অদ্ভুত প্রশান্তিতে ঝলমল করছে তাঁর উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ মুখখানা। তাঁর সাদা পোশাকে মূর্ত হয়ে ওঠে শান্তির প্রতীক।

সেই মুহূর্তে ঢং ঢং করে বেজে ওঠে গির্জার ঘণ্টাধ্বনি। সেই পবিত্র গম্ভীর শব্দ ছড়িয়ে পড়ে ম্যাকডোনাল্ড'স গ্রাউন্ডের চত্বর পেরিয়ে আরও বহু দূর। অমনি অর্ফানেজের গ্রীল-দেওয়া গেট খুলে যায়। ভেতর থেকে সার দিয়ে বেরিয়ে আসে সুন্দর অথচ বিষণ্ণ চেহারার শিশুরা। তাদের পরনে পরিপাটি পোশাক।

ফাদার ব্যস্ত হয়ে বললেন, তাহলে চলি, কর্নেল।

প্রার্থনাগৃহের ভেতর ফাদার উইলিয়াম ঢুকে যেতেই কর্নেল আবার হাঁটা শুরু করলেন। শিশুদের মিছিলের মধ্যে একবার খুঁজে বার করার চেষ্টা করলেন ডালিমকে। কিন্তু অতজনের মধ্যে ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারলেন না। ভিড়ের মধ্যে তখন ফর্সা কোনও মুখ দেখলেই মনে হয় সে-ই ডালিম।

হাঁটতে হাঁটতে দেখা হয়ে গেল বিদ্যুৎ চ্যাটার্জির সঙ্গে। বুকডন দিচ্ছিল বিদ্যুৎ। কর্নেলকে দেখে উঠে দাঁড়াল, বলল, সামনেই নববর্ষ। পয়লা বৈশাখের দিন আমরা একটা গেট-টুগেদার করব। ঠিক যেভাবে বিজয়া-সম্মেলনী করেছিলাম, সেরকমভাবেই।

—তা বেশ তো। চমৎকার প্রস্তাব।

—মিসেস সিন্‌হা আগেরবার থাকতে পারেননি বলে খুব লজ্জিত। বলেছেন, এবার একটা গীতি-আলেখ্য করবেন। শুধু বৈশাখের ওপরই রবীন্দ্রনাথের যত গান আছে, তা দিয়েই অনুষ্ঠানটা হবে। এর গ্রন্থনা-অংশ কে লিখে দিচ্ছেন জানেন?

কর্নেল মাথা নাড়লেন, তোমরা কত কিছু প্ল্যান-প্রোগ্রাম করছ তার কিছুই তো জানি না। সেদিন মনোজিৎ বলল, তোমরা নাকি মর্নিং-ওয়াকারদের নিয়ে একটা ক্লাব করে তার নাম দিয়েছ 'সুপ্রভাত'। বছরে দুবার-তিনবার করে আউটিঙে যাবে ঠিক করেছ। কখনও রায়চক, কখনও ডায়মণ্ডহারবার, কখনও ব্যারাকপুরের দিকে। তাই না? কিন্তু মনোজিৎকে কদিন হল দেখতে পাচ্ছি নে কেন?

বাহ্, আপনি শান-বাঁধানো পুকুরের দিকে এ-কদিন তাকিয়ে দেখেননি? মনোজিৎদা তো পাড়ার ছেলেদের সাঁতার শেখাচ্ছেন। গরম পড়ে গেছে। এ সময়টা ভোরের দিকে খুব প্লেজান্ট ওয়েদার। ওদিকে তাকিয়ে দেখুন না—

বিস্মিত কর্নেল তাকিয়ে দেখলেন ম্যাকডোনাল্ডসাহেবের বিশাল পুকুরের দিকে। টলটলে জলে কদিন ধরে ঝাঁপাই জুড়ছে একদঙ্গল কিশোর। দৃশ্যটি তাকিয়ে দেখেছেন বটে, কিন্তু খেয়াল করে দেখেননি, কারা সাঁতার কাটছে। এখন লক্ষ করতেই দেখলেন, শর্টস পরে খালি গায়ে কিনারে দাঁড়িয়ে আছেন মনোজিৎ রায়। কাউকে কাউকে নির্দেশ দিচ্ছেন গভীর জলের দিকে না যেতে। দেখতে দেখতে হঠাৎ মনে পড়ল, মনোজিৎ এ রকম একটা কথা অনেকদিন আগে তাঁকে বলেছিল বটে। তাহলে সত্যিই সাঁতারের ক্লাব করল!

বিদ্যুৎ চ্যাটার্জি ততক্ষণে বলছে, আমাদের গীতি-আলেখ্যর গ্রন্থনা লিখে দিচ্ছেন তথাগত গুহ। উনি বলেছেন, গ্রন্থনা-অংশ পাঠও করবেন উনি। বিজনেসম্যান, অথচ শিল্প-সাহিত্যের দিকে কী দারুণ ইন্টারেস্ট।

—ঠিক আছে, চালিয়ে যাও। তোমাদের সব প্রোগ্রামেই আমি আছি। কর্নেল আবার হাঁটতে শুরু করলেন ট্র্যাক-বরাবর। পৃথিবীতে এত কষ্ট, এত দুঃখের মধ্যেও মানুষ ইচ্ছে করলে কতরকম আনন্দ খুঁজে নিতে পারে। ছোট ছোট ব্যাপার, তবু তার মধ্য দিয়েই ছুঁয়ে ফেলা যায় আর-একজনের হৃদয়। এই হৃদয় স্পর্শ করতে পারাটাই বড় কথা। পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করে চলার মধ্যে কোনও আনন্দ নেই। কাছে আসার মধ্যেই জীবনের বেঁচে থাকার সার্থকতা।

এর মধ্যে একদিন পুকুরের পাড় দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বাতাসে চমৎকার একটা গন্ধ পেয়ে থমকে দাঁড়ালেন কর্নেল। একটা নতুন ফুলের গন্ধে বুকের ভেতরটা ভরে গেল যেন। নজর পড়ল, ফেন্সিঙের ধারে বিশাল নাগকেশর গাছের দিকে। গুঁড়ির একটু ওপরেই কাণ্ড ভেদ করে বেরিয়েছে ফুলের কুঁড়ি। কয়েকটা নাগকেশর ফুলও থোকা হয়ে ঝুলছে হাতের নাগালের মধ্যে। হাত দিয়ে কেউ যাতে পাড়তে না পারে তাই একটা তারের জাল দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে কাণ্ডটা। ভালই করেছে অবশ্য। নইলে এমন সুন্দর দৃশ্য কারও-না-কারও হাতে ছিন্ন, বিদীর্ণ হয়ে যেত চোখের পলক না ফেলতে। ফুল যে গাছেই সুন্দর, তা অনেকে বোঝে না।

নাগকেশর গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আরও কিছুক্ষণ গন্ধটা ফুসফুসের ভেতর ভরে নিলেন কর্নেল। অসংখ্য ছোট ছোট কুঁড়ি হয়েছে চারপাশে। বছরের এই সময়টা কয়েক মাস ধরে ফুলগুলো একের পর এক ফুটবে। কয়েকদিন পরে ঝরে পড়বে মাটিতে। তখন গাছের তলাটাও দেখতে ভারী সুন্দর লাগে।

কর্নেলের হঠাৎ নজর পড়ল বিশ্বজিতের দিকে। কিছুকাল হল ব্যায়ামে একটু ঢিল দিয়েছে মনে হয়। প্রায়ই দেখতে পান, তার ব্যায়াম ফেলে তাকিয়ে আছে ডায়মণ্ডহারবার রোডের দিকে। কেন তাকিয়ে আছে, তাও বুঝতে পারেন। মাঠে রোজ নিয়ম করে আসত কাবেরী আর চামেলি। কী কারণে যেন দুজনে হঠাৎ মাঠে আসা বন্ধ করে দিয়েছে। ওরা আর কেন আসে না তা জানতে পারেননি কর্নেল। হঠাৎ কি বিশ্বজিতের ঝগড়া হয়েছে কাবেরীর সঙ্গে! না কি অভিমান! কৌর্টশিপে মান-অভিমানের পালা একটা থাকেই। কিন্তু তা কি এত দীর্ঘদিন ধরে চলতে দিতে হয়! একদিন জিজ্ঞাসাও করে ফেলেছিলেন বিশ্বজিৎকে, কী হল, ব্যায়ামবীর, সেই দুধওয়ালিকে আজকাল আর মাঠে আসতে দেখি নে তো!

বিশ্বজিৎ মুখে হাসি আনল, অ্যাবস্কন্ডিং। থানায় একটা ডায়েরি করেছি। কিন্তু পুলিশও খুঁজে পাচ্ছে না।

—তাই নাকি! তাহলে একটা হুলিয়া বার করতে বল।

বিশ্বজিতের মুখে হাসি ছিল বটে, কিন্তু তার ভেতরের একটা যন্ত্রণা দেখতে পেয়েছিলেন কর্নেল। মাঠে কতটুকু সময়ই বা আর দেখা হয় তাঁদের, তবু এর মধ্যেই এইসব ছোট ছোট ঘটনা তাঁর ভেতরে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়। হঠাৎ এদের মধ্যে দিয়ে তিনি স্পষ্ট দেখতে পান তাঁর যৌবনের দিনগুলো। সেই বয়সে তাঁরও এমন সব ভাল-লাগা খারাপ-লাগার কত ঘটনাই না ছিল! জীবনে এমন কিছু ঘটনা থাকে, যা সারাজীবন মানুষকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। আটাত্তর পেরিয়েও মনে হয়, এই তো সেদিনকার কথা। এই তো সেদিন তিনি বই-খাতা হাতে গুছিয়ে নিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনে। কলেজে তাঁর প্রথম দিন। এই তো সেদিন আর্মিতে জয়েন করলেন! প্রথম যেদিন আর্মির পোশাক পরে দাঁড়িয়েছিলেন আয়নার সামনে, নিজেকে চিনতেই পারেননি যেন। মনে হল, যুদ্ধের পোশাকে তাঁর সামনে অবতীর্ণ কে এই যুবক! তারপর একটার পর একটা পদে উন্নীত হয়েছেন। প্রত্যেকটা ছবিই জ্বলজ্বল করে গেঁথে আছে তাঁর মনের ভেতর। এমনকি রাষ্ট্রপতির পদক পাওয়ার দিনটিও। কখন যৌবন পার হয়ে প্রৌঢ়ত্বে, প্রৌঢ়ত্ব থেকে উপনীত হয়েছেন বার্ধক্যে তা বুঝতেই পারলেন না। হঠাৎ চারপাশের কোলাহল থেকে কখন যেন ভেতরে ভারী একা হয়ে পড়েছেন।

এবার বৈশাখ মাসটা অন্যবারের চেয়ে আরও চমৎকার হয়ে দেখা দিয়েছে। ভোরের দিকে গুমোট গরম নেই, বরং কোনও কোনও দিন ঠাণ্ডা একটা হাওয়া ছাড়ছে দক্ষিণ থেকে। তাতে রোদ ওঠার আগে পর্যন্ত বেশ মোলায়েম লাগে শরীরটা। কয়েকদিন ধরে ভিড় বেড়ে যাচ্ছে মাঠে। চৈত্র-বৈশাখ এই দুটো মাস

মর্নিং-ওয়াকারদের সংখ্যা বেড়ে যায়। যারা সারা বছর শরীরচর্চা করে না, তারাও এ সময় মাঠে আসে। কেউ চারদিকে, কেউ আড়াআড়ি হাঁটাহাঁটি করে, সুপ্রভাত বিনিময় করে। মাঠের উষ্ণতা আরও একটু বেড়ে যায়। সারাক্ষণ সবুজ ঘাস, রেন-ট্রি গাছের পাতায় আছড়ে পড়ে কলধ্বনি।

এর মধ্যে একদিন খেয়াল করে দেখলেন, সমবেত কিশোর কণ্ঠের হইচই জুড়ে রয়েছে সারা মাঠ। নিশীথবাবু একদিন সঙ্গে করে নিয়ে এলেন তাঁর মেয়ে কেয়াকে। বললেন, কর্নেলদা, এবার মাধ্যমিক দিল—

মাধ্যমিকের পর মার্চের শেষদিকে, উচ্চমাধ্যমিকের পর এপ্রিলের শেষদিকে মাঠ ভরে যায় রকমারি কিশোর-কিশোরীতে। তাদের কলকণ্ঠে জমজম করতে থাকে ম্যাকসাহেবের মাঠ। ছোটাছুটি, হইচই, হাস্যধ্বনিতে থইথই করে ওঠে ভোরের চমৎকার মুহূর্তগুলো।

কর্নেল কেয়ার মাথায় হাত রাখলেন। প্রায় তিতিরের মতোই তার হাবভাব। বললেন, কেমন হল পরীক্ষা। স্টার পাচ্ছ নিশ্চয়ই।

কেয়া হাসল, চেষ্টা তো করেছি—

—চেষ্টাটাই সব, তারপর কিছুটা লাক। একজামিনেশন সিস্টেমটাই গোলমেলে। লক্ষলক্ষ ছাত্রছাত্রী, ঠিকমত খাতা দেখা হয় কিনা তাতে সন্দেহ হয়। তবু এত কমপিটিটিভ হয়ে পড়েছে এখানকার লেখাপড়ার জগৎ, চাকরির জগৎ যে, ভাল রেজাল্ট না করলে উপায় নেই। সেই জন্যেই তো ছেলেমেয়েদের সঙ্গে দেখা হলেই বলি, ওয়ার্ক, ওয়ার্ক হার্ড। পরিশ্রমের কোনও বিকল্প নেই। পরিশ্রমের পরেও যদি ভাল ফল না হয় তখন বলি, ঠিক আছে, ডোন্ট ওরি, ট্রাই নেক্সট্ টাইম।

নিশীথ দাশগুপ্তও হাসলেন, সত্যি আপনার ইনস্পিরেশনের তুলনা নেই।

—ইনস্পিরেশনই তো সব। মানুষ প্রেরণা থেকেই এগিয়ে যায়। বসে থাকলে কারোরই চলবে না। এগিয়ে যেতে হবে। সেই পুরনো কথাটাই আবার বলতে হবে, চরৈবেতি, চরৈবেতি।

—প্রফেসর খাসনবীশকে দেখে এলেন নাকি, কর্নেলদা?

—দেখে এসেছি। প্রায় রোজই যাচ্ছি, কিন্তু ভাল নেই। সুগার যে কী সাংঘাতিকভাবে আক্রমণ করতে পারে তা প্রফেসরকে দেখে বুঝতে পারছি। প্রেশারটাও হাইয়ের দিকে। এইজন্যেই তো সবাইকে উপদেশ দিই, নিজেকে কন্ট্রোলে রাখ—

একটু পরেই কেয়া মিশে গেল অন্য মেয়েদের ভিড়ে। কর্নেলও আস্তে আস্তে এগুলেন কংক্রিটের বেঞ্চের দিকে। ব্যারিস্টার অনেকক্ষণ বসে রয়েছেন ওখানে।

অবশ্য ঠিক একা নেই, আরও কয়েকজন বয়স্ক মানুষের সঙ্গে ভাব করে নিয়েছেন এর মধ্যে। টুকটুক করে কথা বলেন। আগের চেয়ে একটু ইম্প্রুভও করেছেন মনে হচ্ছে।

বেঞ্চের কাছে পৌঁছবার মুখে হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়াল সৌপ্তিক। কচি-কচি দাড়িগুলো আরও একটু বড় হয়েছে। চোখের মণিদুটো আরও উজ্জ্বল। অথচ মুখে সামান্য সঙ্কোচের ছাপ। আস্তে আস্তে বলল, তিতির কি সামার ভেকেশনে কলকাতা আসছে, জ্যেঠু?

তিতির আসবে কি না সে ভাবনা তো কর্নেলের নিজেরও। তিতির এলে কয়েকটা দিন বেশ আনন্দে কাটে। এক ছটফটে কিশোরীর শাসনে বেঁধে রাখা যায় নিজেকে। হেসে বললেন, এখনই ঠিক বলা যাচ্ছে না। হার ফাদার ইজ লাইকলি টু বি ট্রান্সফারড টু ব্যাঙ্গালোর দিস মান্থ। যদি যেতে হয়, তাহলে হয়তো তিতির ব্যস্ত থাকবে গোছগাছ করা নিয়ে—

সৌপ্তিকের মুখের আলো দপ করে নিভে যায়। ম্লান হেসে চলে যায় কর্নেলের কাছ থেকে। তার হতাশ মুখচোখের দিকে তাকিয়ে বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে কর্নেলের। ঠিক তখনই যেন দু-চারটে রেন-ট্রির পাতা ঝরে পড়ে তাঁর পায়ের কাছে। শীতের দিনে যে দু-একটা পাতা ঝরে যেতে বাকি ছিল, তারা এখনও দুটো-একটা করে ঝরে পড়ছে টুপ-টাপ শব্দে।

কয়েকদিন পরে এমনই একটি পাতা-ঝরার খবর পেয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন কর্নেল। বুকে হঠাৎ সর্দি বসায় কয়েকদিন আগে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছিল কাকলিকে। আগের দিন রাতে হাসপাতালের বেডেই মারা গেছে সে। তার ফুসফুস আরও একটু বাতাস চেয়েছিল প্রকৃতির কাছে। একমুঠো বাতাসের জন্য প্রচুর লড়েছিল তার ছোট্ট ফুসফুসটি নিয়ে, শেষ পর্যন্ত আর পারেনি। হঠাৎ প্রকৃতি তার সঙ্গে কৃপণের মতো ব্যবহার করেছে কাল। সামান্য একটু বাতাস, তাও দেয়নি।

কয়েকদিন ধরেই সৌপ্তিকের খুব মন খারাপ। আজ আর একটু বেশিই। এক রাউন্ড মাঠের চারপাশে দৌড় দিয়ে এসেই তার মনে হল, ছুটতে ইচ্ছে করছে না একদম। শরীরের কোথায় একটা বৈকল্য। মনের সঙ্গে শরীরের একটা সম্পর্ক আছে। মন ভাল না থাকলে সবকিছুই বিশ্রী লাগে। শরীরটা ভার-ভার, মাথার ভেতরটা কেমন যেন ঘোলাটে লাগছে সকাল থেকে।

কলকাতায় এক আত্মীয়-বাড়িতে লেখাপড়া করতে আসা সৌপ্তিকের জীবনযাপন নিস্তরঙ্গই ছিল এতদিন। হঠাৎ জব্বলপুর থেকে তিতির নামের মেয়েটা বেড়াতে এসে ঘুলিয়ে দিয়ে গেছে তার অস্তিত্ব, বেঁচে থাকা। মাত্র কয়েকমাস আগেও

তিতিরকে সে চিনত না, কয়েকদিনের আলাপ-পরিচয়, কুইজ খেলার পর তার সমস্ত পৃথিবী এখন তিতিরময়। সবখানেই যেন তিতির, তিতির আর তিতির। কোন ইংরেজ কবি নাকি লিখেছিলেন, ইট'স বেটার টু হ্যাভ লাভ্‌ড অ্যান্ড লস্ট দ্যান নট টু হ্যাভ লাভ্‌ড অ্যাট অল। পংক্তিটি যতবার মনে পড়ে তার, ততই মনে হয় বড় নিষ্ঠুর, বড় ভয়ঙ্কর এই কথাগুলো। যতদিন কাউকে ভালবাসেনি ততদিনই বরং তার মনে একটা অন্যরকম সুখ ছিল, বড় হয়ে ওঠার সুখ। এখন তার চারপাশে কেবল দুঃখ আর দুঃখ।

এক-এক সময় সৌপ্তিকের মনে হয়, তিতিরের সঙ্গে তার দেখা না হলেই বোধহয় ভাল হত। সে সময় জীবনটা তার অন্যরকম ছিল। আবার কখনও একলা হলে তিতিরের মুখখানা মনে মনে ভাবতে ভারী ভাল লাগে। ভাবতে ভাবতে মনে হয়, তিতির তাকে হঠাৎ ধনী করে দিয়ে গেছে। তিতিরকে নিয়ে একলা-একা ভাবনাটাই তার জীবনের সেই ঐশ্বর্য। এমন ঐশ্বর্য খুব কম মানুষেই পায়। তখন মনে হয়, পড়াশুনো করে খুব বড় হতে হবে তাকে। বিশাল মাইনের একটা চাকরি পেতে হবে। মানুষের মতো মানুষ হয়ে উঠতে পারলে সে মুখ উঁচু করে কর্নেলের কাছে গিয়ে বলতে পারবে, তিতিরকে আমার চাই। তিতির আমার জীবনের অনেকখানি।

আবার এক-এক সময় তার মনে হয়, তিতিরের মুখটা যেন সে আর মনে করতে পারছে না। যত দিন যাচ্ছে, ততই ঝাপসা হয়ে আসছে তার সুন্দর মুখখানা। তখন বুকের ভেতর একটা ব্যথা চিনচিন করতে থাকে। একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা। যেমন এই মুহূর্তে তার বুকের ভেতর সেই মন-খারাপটা চাগাড় দিয়ে উঠছে আবার। কাল বিকেলে একটি অকাল-মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ার পর থেকেই এই চিনচিনে ব্যথা। ইস, কী খারাপ দিনটাই না গেল কাল!

কাল বিকেলে বিশ্বজিতের সঙ্গে সে গিয়েছিল অনিরুদ্ধ শাসমলের বাড়িতে। কর্নেলও গিয়েছিলেন। একটু পরে মনোজিৎ রায়ও। তখন সদ্য হাসপাতাল থেকে নিয়ে আসা হয়েছে কাকলির ডেডবডি। সুন্দর ফুলের মতো মুখ। সাদা ধবধবে চাদরে ঢেকে রাখা হয়েছে তার গলা পর্যন্ত। মাত্র একমুঠো বাতাসের অভাবে বন্ধ হয়ে গেছে তার হৃৎযন্ত্র।

সৌপ্তিক তাকাতে পারছিল না মৃতদেহের মুখের দিকে। কিছুদিন আগেও এই মহিলাকে সে দেখেছে মাঠের চারদিকে ধীর পায়ে ঘুরে বেড়াতে। একটু আস্তে আস্তে হাঁটতেন বটে, কিন্তু কোনও অসুস্থতার ছাপ ছিল না মুখে। যেন অসুখটাকে অসুখ বলেই গ্রাহ্য করেননি কখনও। কর্নেলও বলছিলেন, নিজেকে খুব নেগলেক্ট করত

মেয়েটা।

সমস্ত বাড়ির পরিবেশ তখন শোকস্তব্ধ। বাড়িটা বিশাল, দেখেই বোঝা যায়, যৌথ পরিবার। একতলা-দোতলা মিলিয়ে অনেকগুলো ঘর। চার-পাঁচ ভাই সপরিবারে থাকেন। প্রত্যেকের ঘর আলাদা, কিন্তু রান্না-খাওয়াদাওয়া একসঙ্গে। এক-একবেলায় নাকি পঁচিশটি পাত পড়ে। এহেন যৌথ পরিবারের একটি উজ্জ্বল দীপ হঠাৎ ঝোড়ো হাওয়ার একফুঁয়ে নিভে যেতে চারপাশে এক বিধ্বস্ত চেহারা।

ঘরের ভেতর থেকে কান্নার শব্দ পাচ্ছিল সৌপ্তিক। মহিলা কণ্ঠের কান্না। কিন্তু অনিরুদ্ধ শাসমলের মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠেছিল। তাঁর চোখে অশ্রুর চিহ্নমাত্র নেই। বরং পাথরের মতো শক্ত মুখ। নিজের শরীর নিয়েই তিনি বহুকাল ধরে বিব্রত। প্রায়ই বলতেন, আমি না থাকলে কাকলি আর লালির যে কী হবে! কে দেখবে ওদের!

সে ভাবনার আর তোয়াক্কা করলেন না কাকলি। তাঁর স্বামীকে-মেয়েকে একলা রেখে নিজেই চলে গেলেন অন্য পারে।

অনিরুদ্ধ শাসমলের চোখমুখ যতটা শক্ত, তার চেয়েও কঠিন মুখে দাঁড়িয়ে আছে লালি। চোদ্দো-পনেরো বছরের এই কিশোরীকে দেখে বারবার তিতিরের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল সৌপ্তিকের। আর তার বুকের ভেতরটা হাহাকার করে উঠছিল। লালির সামনে এখন ঘোর বিপদ। এতটুকু মেয়ে কীভাবে মোকাবিলা করবে জীবনের হার্ডলগুলো তা সে ভাবতেই পারছিল না।

তবু এই যৌথ পরিবারটিকে দেখে এক অন্য অনুভূতি হচ্ছিল তার। অনিরুদ্ধ শাসমল একবার বিড়বিড় করে বলেছিলেন, আমার লালির কী হবে? কার কাছে রেখে যাব লালিকে!

তাঁর দাদা সুরথ শাসমল শোকার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন মৃতদেহের দিকে। চমক ভেঙে মৃদু ধমক দিলেন ভাইকে, কেন, আমরা মরে গেছি নাকি? লালিকে কি আমরা কেউ আলাদা চোখে দেখি?

সুরথ শাসমলই একসময় বলছিলেন কর্নেলকে, জানেন, কাকলি এ বাড়ির মেয়েই ছিল যেন। বউ নয়। ওর বাবা একজন পণ্ডিত মানুষ। সরকারের উচ্চপদে চাকরি করতেন। বেদ-উপনিষদ সম্পর্কে অগাধ পাণ্ডিত্য। একটা বইও লিখেছেন সেসব বিষয়ে তাঁর নিজস্ব ব্যাখ্যাসহ। তিন মেয়ে তাঁর, তিনজনকেই শিক্ষিত করে মানুষ করেছিলেন। কাকলি তাদের মধ্যে মেজ। অথচ সে-ই সবার আগে চলে গেল! সব ভাল ছিল মেয়েটার, শুধু নিজের শরীরটাকে কখনও যত্ন করতে শেখেনি।

অনিরুদ্ধ শাসমল হঠাৎ ফিসফিস করে বললেন, যত্ন করার সময় কোথায় পেল!

সে তো সারাক্ষণ আমাকে নিয়েই ব্যস্ত থাকত। ডাক্তার তো তিন বছর আগেই আমার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করে দিয়েছেন। তারপর আমার জীবনের প্রতিটি দিনই তো কাকলির পরিচর্যায় ছিল। সে-ই তো বাঁচিয়ে রেখেছিল আমাকে।

কাকলি চলে যাওয়ায় হঠাৎ ভীষণ অসহায় বোধ করছেন অনিরুদ্ধ শাসমল। এখন তাঁকে আর কে পরিচর্যা করবে! হয়তো তাঁর আয়ুও দ্রুত শেষ হয়ে আসবে এর পর।

এমন ভাবতে ভাবতে একটা বড় দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তাঁর বুক থেকে। তখন কয়েকজন এয়োতি মহিলা কাকলির কপালে-সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দিচ্ছিলেন। দুই পা-জুড়ে আলতা। আলতা-সিঁদুর মাখাতে মাখাতে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেনও।

একটু পরেই একজন মহিলা এসে লালির পাশে দাঁড়ালেন, আস্তে আস্তে বললেন, লালি, ঘরে চল।

লালি শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, না, আমার মাকে নিয়ে যাবে, আর আমাকে তোমরা ঘরে নিয়ে যেতে চাইছ!

আর একজন বলল, ওকেও তো শ্মশানে যেতে হবে।

খাটিয়ার চারপাশে তখন এক ভদ্রলোক গোছা-গোছা ধূপ গুঁজে জ্বালিয়ে দিচ্ছিলেন একের পর এক। তারপর কে যেন বলল, চল্, আর দেরি করিসনে।

কথাটা শোনার পরই সৌপ্তিকের চোখদুটো জ্বালা করে উঠেছিল। সে লালির মুখের দিকে আর একবার তাকিয়েছিল ভাল করে। ঝড়ের আগে যেমন থমথম করতে থাকে পৃথিবী, তেমনই লালির ফর্সা মুখখানা। চুল উস্কখুস্ক, এলো হয়ে ছড়িয়ে আছে তার মুখে, বুকে, পিঠের সবখানে। শুধু চোখদুটো কী এক অব্যক্ত বেদনায় ধকধক্ করছে।

সৌপ্তিকের পাশে দাঁড়িয়েছিল বিশ্বজিৎ, হঠাৎ নিচুকণ্ঠে বলল, শ্মশানে যাবি, সৌপ্তিক? মনোজিৎদা যাচ্ছে।

সৌপ্তিক ঘাড় নাড়ল, সে যাবে না। সে এইসব দৃশ্য একদম সহ্য করতে পারে না। মৃত্যুকে এমন কাছে দাঁড়িয়ে কখনও প্রত্যক্ষ করেনি সে। মৃত্যু যে এমন নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে পারে ভেবে কান্না পাচ্ছিল তার। ঈশ্বর মাঝে-মাঝে কেন এত নিষ্ঠুর হয়ে ওঠেন তা সে জানে না। এমন সুন্দর জীবন হঠাৎ এক কশাঘাতে কী ভয়ঙ্কর দুঃসহ হয়ে ওঠে।

আর কী অদ্ভুত, মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জেনেও মানুষের বেঁচে থাকার ইচ্ছেটা কত প্রবল!

একটু পরেই চারজন যুবক গিয়ে দাঁড়াল খাটিয়ার চার কোণে। তাদের চওড়া কাঁধে শবদেহ তোলার আগে অনিরুদ্ধ শাসমল হঠাৎ মৃদুকণ্ঠে বললেন, একটু দাঁড়াও—

চারজন যুবক থমকে দাঁড়াতেই তিনি ধীর পায়ে এগিয়ে গেলেন তাঁর দীর্ঘ সতেরো বছরের সঙ্গিনীর দিকে। কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করলেন তাঁর মুখ। একটু পরে হাঁটু গেড়ে বসলেন পাশে, নিচু হয়ে পর-পর তিনবার চুম্বন করলেন কাকলির ঠোঁটে। তারপর উঠে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে কয়েক মুহূর্ত কেঁপে উঠল তাঁর চোখের পাতা, ঠোঁট।

চারজন যুবক পরক্ষণেই তাদের কাঁধে তুলে ধরল খাটিয়া। সঙ্গে সঙ্গে কোথাও কান্নার ধ্বনি প্রবল হয়ে উঠল। ঝাপসা হয়ে উঠেছিল সৌপ্তিকের চোখদুটোও।

কিন্তু না, লালি কাঁদছে না। সে বুঝতে পারছে, তার সামনে এখন কঠিন লড়াই। তাকে এখন ভীষণ শক্ত হতে হবে। সে ভেঙে পড়লে তার বাবা এক নিদারুণ আঘাতে জর্জরিত হয়ে পড়বেন। তাহলে তার বাবাকে বাঁচানোই কঠিন হয়ে পড়বে।

শবযাত্রার পিছু-পিছু কয়েকজন লোক একটা অদ্ভুত বাজনা মৃদুস্বরে বাজাতে বাজাতে চলল। বিশ্বজিৎ বলল, এর নাম ডাংগেরা। এয়োতি স্ত্রী মারা গেলে ডাংগেরা বাজানোই নাকি নিয়ম।

সমস্ত ঘটনাটা যতবার মনে পড়ছে সৌপ্তিকের, ততবার শোকে, আঘাতে স্তব্ধ হয়ে পড়ছে। মাঠের চারদিকে দৌড়তে দৌড়তে থেমে যাচ্ছে হঠাৎ। কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে তার স্নায়ু।

হঠাৎ চারদিকে তাকিয়ে দেখল, বিশ্বজিৎ আজ ব্যায়াম করতে মাঠে আসেনি। কাল সৌপ্তিককে বলেছিল, সে কাবেরীর জন্য শখেরবাজার মাদার ডেয়ারির কাছে অপেক্ষা করবে। দীর্ঘদিন কাবেরীর সঙ্গে দেখা না হওয়ায় সে ভীষণ মুষড়ে আছে। এতদিনের মধ্যে কাবেরী একবারও কোনও ছলছুতোয় বাড়ি থেকে বেরিয়ে তার কাছে আসেনি বলে খুব অবাকও হয়েছে। সৌপ্তিককে বলেছে, সত্যিই ওর বিয়ের ঠিকঠাক হয়ে গেল না কি রে!

মাঠের কোণে, কংক্রিটের বেঞ্চের ওপাশে ফাদার উইলিয়ামকে দেখে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল সৌপ্তিক। ফাদার খুবই খুশি-খুশি মুখে কর্নেলের সঙ্গে কথা বলছেন। কেন যেন ফাদারদের দেখলে ভারী ভাল লাগে তার। সে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্র। বেশ কয়েকজন ফাদার তাদের ক্লাসে পড়াতে আসেন রোজ। সেসব ফাদারদের কেউ ফ্রান্স, কেউ বেলজিয়ামের। কিন্তু ফাদার উইলিয়াম বাঙালি। তাঁর সদাহাস্যময়, প্রশান্ত মুখখানা দেখে ভারী চমৎকার লাগছে আজ। তেমনই ভাল লাগছে কর্নেলকেও। এই দুই ব্যক্তিত্বময় পুরুষ যখন মাঠের পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলেন, তখন সে দৃশ্য যেন এক অপার্থিব সৌন্দর্যের আকর। সেই সৌন্দর্য নিঃশেষে পান করার জন্য সে পায়ে পায়ে তাঁদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ফাদার তখন বলছেন, খুব ভাল

খবর, কর্নেল। শেষ পর্যন্ত চাঁপার জন্য এমন একটা ভাল পাত্র যে পেয়ে যাব তা ভাবতেই পারিনি। ছেলেটা কলকাতার এক ইকনমিক ফিল্যানথ্রাপিক স্টাডি সার্কেলের গবেষক। কয়েকদিন ধরেই এই অনাথ আশ্রম-দুটোর ইতিহাস খুঁজতে যাতায়াত করছিল। বছর উনত্রিশেক বয়স। খুব ব্রাইট ছাত্র। চাঁপাকে দেখে হঠাৎ খুব পছন্দ হয়ে গেছে।

কর্নেল ঘাড় নাড়ছিলেন, সত্যিই একটা ভাল খবর শোনালেন, ফাদার। রোজ এত এত দুর্ঘটনা, মৃত্যুর খবর শুনে মনটা এত খারাপ লাগে আজকাল!

—জানেন, বিয়ের সমস্ত খরচ বহন করবে পাত্র নিজেই। বলেছে, আপনাদের কোনও চিন্তা নেই। খুব অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই বিয়েটা করতে চাই।

বিদ্যুৎ চ্যাটার্জি যাচ্ছিলেন সেখান দিয়ে, তাকে ডেকে কর্নেল বললেন, তোমরা অল্প অল্প করে চাঁদা তোল এর-ওর কাছ থেকে, মাঠের সদস্যদের তরফ থেকে চাঁপাকে একটা সুন্দর উপহার দিতে চাই। মেয়েটাকে রোজ দেখে দেখে একেবারে নিজেদের বাড়ির মেয়ে বলে মনে হয়।

বিদ্যুৎ চ্যাটার্জি তৎক্ষণাৎ তাঁর হাতের কাগজের তাড়াটা দেখিয়ে বললেন, একটু পরেই সবাই জড়ো হবে এখানে, পয়লা বৈশাখের অনুষ্ঠানের মহড়া দিতে, তখনই আলোচনা করে নেবখন।

—বেশ, বেশ, বলে কর্নেল আর ফাদার হাঁটতে শুরু করলেন ফের। তাঁরা চলে যাওয়ার পর বিদ্যুৎ চ্যাটার্জির নজর পড়ল সৌপ্তিকের দিকে, বললেন, সৌপ্তিক, তুমি কোরাসে গান গাইবে? গানের লোক তেমন পাচ্ছি না। সৌপ্তিক হকচকিয়ে গিয়ে বলল, আমি গান গাইব!

—হ্যাঁ, কোরাসে। তুমি একদিন ফেন্সিঙের কাছে বসে নিচু গলায় গাইছিলে শুনেছিলাম। দ্যাখো না যোগ দিয়ে।

সৌপ্তিক কিছুটা অবাক হয়ে গেল, তারপর রাজি হয়ে গেল চট করে, ঠিক আছে, দেখি—

কয়েকদিন ধরে জোর রিহার্স্যাল চলছে কংক্রিটের বেঞ্চের পাশে, রেন-ট্রির তলায়, ঘাসের ওপর ছড়িয়েছিটিয়ে বসে। গ্রন্থনায় তথাগত গুহর গলা ভারী চমৎকার শোনাচ্ছে। তাঁর চেহারাটাও বেশ নায়ক-নায়ক, চশমার ফ্রেমটা বোধহয় সোনার—এমন ঝকঝক করছে! তাঁর পাশে মিসেস সিন্‌হার একক গানগুলি মুগ্ধ হয়ে শোনার মতো। কোরাসে কীভাবে গাইতে হবে তাঁর তালিম দিচ্ছেন মিসেস সিন্‌হা। প্রথমেই কোরাসে 'এসো, এসো, এসো হে বৈশাখ'। তারপর মিসেস সিন্‌হার গলায় 'বৈশাখের এই ভোরের হাওয়া আসে মৃদুমন্দ'। তারপর আবার কোরাস : 'দারুণ অগ্নিবানে/

হৃদয় তৃষায় হানে।' তারপর মিসেস সিন্‌হার একক—

দু-তিনদিনের মধ্যে গীতি-আলেখ্যর রিহার্স্যালের সঙ্গে পুরোপুরি মিশে গেল সৌপ্তিক। ভাবল, যদি তাতে তার মন খারাপ একটু ভাল হয়ে যায়। সবাই প্রাণপণে খাটছে। তথাগত গুহ সেদিন দারুণ প্রশংসা করলেন মিসেস সিন্‌হাকে, সত্যি, আপনার এমন চমৎকার গানের গলা—আর সেই প্রতিভাকে এভাবে চেপে রেখেছেন এতকাল!

তৎক্ষণাৎ কম্‌প্লিমেন্ট দিলেন দেবলীনা সিন্‌হা, আর আপনার ভরাট গলা না হলে কি এই গীতি-আলেখ্য দাঁড়াতে পারত?

—আমার কথা বাদ দিন। আপনি এতদিন রেডিও কিংবা টিভিতে কেন অডিশন দেননি তাই ভাবছি।

—অডিশন দিয়ে কিছু হয় না। সব জায়গায় ব্যাকিং লাগে মশাই। অডিশন তো স্রেফ আই-ওয়াশ।

হাসলেন তথাগত গুহ, যেন এসব ব্যাপারের অন্দরমহলে তিনি যাতায়াত করে থাকেন। ভদ্রলোককে দেখলেই অবশ্য মনে হয়, খুবই রিসোর্সফুল। চেহারাও যেমন সুন্দর, তেমনই কথাবার্তা। দেবলীনা সিন্‌হার পাশে বসে যখন ভরাট গলায় গ্রন্থনা-অংশ পাঠ করেন, তখন মনে হয় দেবলীনা সিন্‌হার মতো সুন্দরী গায়িকার পাশে এমন সুপুরুষ ভাষ্যকারই মানায়। তাঁদের পাঠ ও গানের এই যুগলবন্দি শোনার সময় একদিন সৌপ্তিকের মনে হঠাৎ মিস্টার সিন্‌হার মুখটা ভেসে উঠল। মিস্টার সিন্‌হা একটু ভোরের দিকে আসেন। গোলপোস্টের পাশে দাঁড়িয়ে কিছু ফ্রি-হ্যান্ড, একটু এক্সারসাইজ করে যখন চলে যান, তখনও হয়তো দেবলীনা সিন্‌হা পৌঁছন না মাঠে। দেবলীনা সিন্‌হার পাশে মিস্টার সিন্‌হার চেহারাটা কেমন যেন বেমানান মনে হয়। বরং তথাগত গুহর সঙ্গেই দেবলীনা সিন্‌হার চেহারাটা বেশি মানানসই।

কথাটা মনে হওয়ামাত্র সৌপ্তিক ধিক্কার দিল নিজেকে। সে বড্ড আবোল-তাবোল ভাবনাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। এ ধরনের কোনও কথা তার ভাবাই উচিত হয়নি।

পরমুহূর্তে আবার মনে হল, কথাটা তার মাথায় কেন উদয় হল হঠাৎ! কয়েকদিন ধরে তথাগত গুহর সঙ্গে দেবলীনা সিন্‌হার কথাবার্তা, আচার-আচরণ একটু কি অস্বাভাবিক লাগছে তার কাছে! একটু বেশি অন্তরঙ্গ হচ্ছেন কি দুজনে! যাই হোক, ভাবনাটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। আসলে যে ভাবনাটা এতদিন সে ভাল করে কখনও ভাবেনি, তিতিরের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর সেই ভাবনাটা মাঝেমধ্যে ঘাই দিয়ে যাচ্ছে তার মগজে। ভাবনাটা হল, নরনারীর সম্পর্ক।

রিহার্স্যাল দিতে দিতে হঠাৎ বোধহয় তাইই—

মাঠে দৌড় দিতে দিতে হঠাৎ একদিন নজর করল, এক ভদ্রলোকের সঙ্গে হঠাৎ খুব তর্ক বেধে গেছে বিদ্যুৎ চ্যাটার্জির। আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু বি জে পি। বি জে পি ক্ষমতায় এলে কী কী সুবিধা ও অসুবিধা হবে তাই নিয়ে আলোচনা হতে হতে এখন কলহে পরিণত।

বর্ষীয়ান নিশীথ দাশগুপ্ত শুনছিলেন তাদের বিতর্কের বিষয়বস্তু। দ্রুত গিয়ে বললেন, এ সব আলোচনা বেশি না করাই ভাল। এমনিতেই নানান গুজব ছড়াচ্ছে। আবার কোথা থেকে কী ঝামেলা বেধে যায় তার ঠিক কী।

মাঠের আরও অনেকে তাঁর কথায় সায় দিলেন। ইরাক-আমেরিকার যুদ্ধ শেষ। বিশ্বের তাবৎ অস্ত্রবিক্রেতারা এখন নাকি ভাবছে, আবার কোথায় যুদ্ধ বাধানো যায়। এক সংবাদপত্র জানাচ্ছে, তাদের তালিকার এক নম্বরে আছে ভারত-পাকিস্তান। যেন-তেন-প্রকারেণ একটা উত্তেজনা ছড়িয়ে দিতে পারলে যুদ্ধের একটা পটভূমি তৈরি হয়ে যাবে।

অতএব দুজনেই ক্ষান্ত দিলেন কলহে। বিদ্যুৎ চ্যাটার্জি হেসে বললেন, আসলে ভদ্রলোক ভ্রান্ত ধারণায় ভুগছেন। ওঁর ভুল ভাঙিয়ে দিতে চেয়েছিলাম।

কয়েকদিন রিহার্স্যাল দিতেই গীতি-আলেখ্যটা বেশ দাঁড়িয়ে গেল শেষপর্যন্ত। এখন শুধু নববর্ষের শুভদিনটির জন্য অপেক্ষা। সবাই টানটান হয়ে রয়েছে উত্তেজনায়। সৌপ্তিক নিজেও খানিকটা নার্ভাস হয়ে আছে। সে কুইজ-মাস্টার, কিন্তু কোরাসে গান-গাওয়া তার এই প্রথম।

বোধহয় নার্ভাসনেস কাটাতেই সে মাঝেমধ্যে জগিং করে নিচ্ছে। চলতে-ফিরতে হইচই শুনে তাকিয়ে দেখল, মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা তাদের পরীক্ষার শেষে এখন মাঠময় হুল্লোড় করে বেড়াচ্ছে। কিশোর-কিশোরীদের কলকাকলিতে রমরম করছে সারাটা চত্বর। এই সময়টাতে নতুন করে জেগে ওঠে ম্যাকসাহেবের মাঠ। শালোয়ার-কামিজপরা কয়েকজন কিশোরী ছোটাছুটি করছিল মাঠের মাঝখানে। তাদের দিকে চোখ পড়তেই হঠাৎ বুকের ভেতর বিদ্যুৎ বয়ে গেল সৌপ্তিকের। একটা মেয়েকে ঠিক যেন তিতিরের মতো দেখতে।

তিতির কি সামার ভ্যাকেশনে সত্যিই আসবে! আসবেই তা বলেনি। বলেছিল, আসতে পারে। আসবে কি আসবে না তা সেদিন বলতে পারেননি কর্নেলও। তিতিরের বাবার নাকি ব্যাঙ্গালোরে বদলি হয়ে যাওয়ার কথা।

মাঝে-মাঝে তিতিরকে চিঠি লিখতে ইচ্ছে করে তার। তখন তাড়াহুড়োয় খুব ভুল হয়ে গেছে, তিতিরের ফোটো চেয়ে নিয়েছিল, কিন্তু তার ঠিকানাটা রেখে দেয়নি। একদিন ভেবেছিল, কর্নেলের কাছ থেকে চেয়ে নেবে, কিন্তু চাইতে গিয়ে ভারী লজ্জা

বোধ করছিল। কিছু যদি ভাবেন কর্নেল! পরে ভেবেছে, আগে ওরা ব্যাঙ্গালোরে বদলি হয়ে যাক। তারপর না হয় একদিন গিয়ে বলবে—। বলতেই হবে তাকে।

মাধ্যমিকের ছেলেরা গিয়ে ভিড় করেছে মনোজিৎ রায়ের সাঁতারের আখড়ায়ও। তাদের সামলাতে গিয়ে অস্থির হয়ে পড়ছেন তিনি। বারবার সাবধান করে দিচ্ছেন ছেলেদের, মাঝখানটা কিন্তু খুব ডিপ। বেশি দূর যাবে না কিন্তু—

সেদিন রিহার্স্যাল শুনতে এসে বলছিলেন, ভারী মুশকিলে পড়ে যাচ্ছি সাঁতার শেখাতে গিয়ে। নতুন নতুন ছেলে এসে বলেছে, আমাকে শেখান। কী করে সামলাই বলুন তো!

কিন্তু নববর্ষের ঠিক আগের দিন, ভারী একটা দুঃসংবাদ নিয়ে এলেন মনোজিৎ রায়। কর্নেলকে বললেন, কাল হঠাৎ ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন প্রফেসর। চোখে দেখতে পাচ্ছেন না। চিনতেও পারছেন না কাউকে। ডাক্তার এসে বললেন, কোমা।

নববর্ষের কুয়াশারঙের ভোর চমৎকার একটি গীতি-আলেখ্য আর প্রীতি-সম্ভাষণে ভরে ওঠার কথা ছিল, তার পরিবর্তে ম্যাকসাহেবের মাঠে চরম দুঃখের মতো এসে পৌঁছল প্রফেসর হীরেন খাসনবীশের মৃত্যুসংবাদ। গত দুদিন ধরে যমে-মানুষে লড়াই গিয়েছে, তবু শেষ পর্যন্ত যুঝতে পারেননি প্রফেসর। কাল সন্ধে পর্যন্ত হাসপাতালে ছিলেন কর্নেল রায়চৌধুরী, মনোজিৎ রায়, তথাগত গুহ, তাঁদের সঙ্গে সুরঞ্জনও। সন্ধের দিকে ডাক্তার মিত্র এসে বিষন্নমুখে মাথা নাড়ালেন, স্যরি, কর্নেল।

খুব ভোর-ভোর মাঠে এসে সুরঞ্জন দেখল, এত ভোরে মাঠে এসেছেন একমাত্র কর্নেল। কিন্তু প্রতিদিনকার মতো ট্র্যাক-বরাবর রাউন্ড দিচ্ছেল না তিনি। একা চুপচাপ ভাবলেশহীন হয়ে বসে আছেন বিশাল রেন-ট্রি গাছের নীচে, কংক্রিটের বেঞ্চিতে। দু-চোখে স্পষ্টতই শূন্যতা। সুরঞ্জনের দিকে একবার তাকালেন বটে, কিন্তু অন্যদিনকার মতো অভ্যাসবশত বলে উঠলেন না, সুপ্রভাত, সুরঞ্জন।

সুরঞ্জন মাথাটা নিচু করে এসে দাঁড়াল তাঁর সামনে, চলুন একটু হাঁটি। চুপচাপ বসে থাকলে আরও মন-খারাপ লাগবে।

কর্নেলের ভেতর থেকে একটা বড় দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল সজোরে। তারপর হাতের ছড়িটা ভর করে উঠে দাঁড়ালেন, যেন খানিকটা কষ্ট করেই। সুরঞ্জনের মনে হল, আগের মতো ঋজু হয়ে দাঁড়াতে পারছেন না, একটু ঝুঁকে পড়েছেন সামনের দিকে। চলার গতিতেও শ্লথভাব। অনেকক্ষণ কোনও কথা না বলে দুজনে হাঁটতে লাগলেন পাশাপাশি। প্রতিটি মুহূর্তই যেন ভারী হয়ে নেমে আসছে বুকের ভেতর। অনেকক্ষণ পর সুরঞ্জন বলতে পারল, ভেতরে ভেতরে খুব ক্ষয় হয়ে গিয়েছিল

প্রফেসরের। বাইরে থেকে দেখলে ঠিক বোঝা যেত না।

কর্নেল ঘাড় নাড়লেন, একজ্যাক্টলি। তারপর একটু থেমে আবার বললেন, আমাদের বয়স হয়েছে তো। বয়সটাকে আমরা ইগ্‌নোর করতে চাইলে কি হবে, ভেতরে ভেতরে সবাই প্রতিদিনই একটু একটু করে ক্ষয়ে যাচ্ছি।

সুরঞ্জন চমকে উঠল যেন। কর্নেলের কথায় হঠাৎ কী এক বেদনার সুর। বরাবরই প্রত্যয়ে দৃঢ় থাকেন যে কর্নেল, তাঁর কণ্ঠস্বরে এমন হতাশা ঠিক প্রত্যাশা করা যায় না। একটু পরে আবারও বলেন, ক্ষয় তো সর্বত্র। আমাদের গোটা সমাজ ব্যবস্থায় কি রকম ঘুণ ধরে গিয়েছে, বল। সব জায়গায় অবক্ষয়। সমাজ ভেঙে যাচ্ছে, মূল্যবোধ শেষ হয়ে যাচ্ছে। তেমন একজন শ্রদ্ধেয় মানুষও নেই দেশে। বেশিদিন বেঁচে থেকে এ সব আর না দেখাই ভাল।

সুরঞ্জন কর্নেলের দিকে তাকায়। অধ্যাপক খাসনবীশের মৃত্যুতে কী ভীষণ শক পেয়েছেন কর্নেল, তা তাঁর এই হতাশাতেই বোঝা যাচ্ছে। বেশ কয়েকদিন ধরে ভীষণ একাকীত্ব বোধ করছিলেন কর্নেল, হঠাৎ আরও একা হয়ে পড়তে ভেঙে পড়েছেন একেবারে।

সুরঞ্জন কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। হঠাৎ দেখল, হাতের লাঠিতে ভর দিয়ে ধীরগতিতে হেঁটে আসছেন ব্যারিস্টার নীলেশ ব্রহ্মচারী। আগের চেয়ে অবশ্য তাঁর গতিতে জোর এসেছে। কর্নেল কয়েকদিন তাঁকে হাত ধরে হাঁটিয়ে, উৎসাহ দিয়ে মনের জোর অনেকটা ফেরাতে পেরেছেন। ব্যারিস্টার কাছে আসতেই কর্নেল ম্লানহেসে বললেন, আমাদের খাতায় হাত পড়ে গেল, ব্যারিস্টার।

ব্রহ্মচারীসাহেবের ঠোঁটদুটো কেঁপে উঠল যেন। কথা শুরু করতে আজকাল বেশ খানিকটা সময় লাগে তাঁর। একটু পরে বলতে পারলেন, শুরুটা তো আমাকে দিয়েই হওয়ার কথা ছিল। আরও কিছুদিন আয়ু ছিল বলে বেঁচে ফিরে এসেছি। তাও কবে আছি কবে নেই কে জানে।

কর্নেল হঠাৎ তাঁর হতাশা থেকে বেরিয়ে ব্যারিস্টারের পিঠে ছোট্ট একটা চাপড় মেরে বলে উঠলেন, না, ব্যারিস্টার। আপনার কিছু হয়নি। এখন দিব্যি সুস্থ হয়ে উঠেছেন। যেভাবে রিকভার করছেন, আমার ধারণা, উইদিন অ্যা মান্থ অর টু, আপনি ফের আগের মতোই হাঁটাচলা করতে পারবেন। আগে তো একদম পারছিলেন না, এখন তো দিব্যি দু রাউন্ড পর্যন্ত হাঁটতে পারছেন। আর একটু মনের জোর বাড়ান, দেখবেন ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠছেন আরও। আপনাকে আরও অনেকদিন বাঁচতে হবে। ইওর ওয়াইফ ইজ স্টিল ইয়াং অ্যান্ড বিউটিফুল।

সুরঞ্জন একটু লজ্জা পেয়ে গেল যেন। দুই বয়স্ক মানুষের কথার মাঝে সে একটু

পিছিয়ে পড়ল ইচ্ছে করেই।

কর্নেল তখন বলছেন, শুধু প্রফেসরের স্ত্রীর কথা ভেবে একটু শঙ্কিত বোধ করছি। বেচারি ভীষণ শক্ পেয়েছে। একেই তো বাতের ব্যথায় পঙ্গু, তার মধ্যে এত বড় একটা আঘাত। কাল সন্ধে বেলা গিয়ে অনেকক্ষণ ছিলাম ওঁর কাছে। শুধু দু-চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল।

ততক্ষণে একজন একজন করে প্রাতঃভ্রমণকারীরা ভরিয়ে ফেলেছেন মাঠ। আজ আর অন্যদিনের মতো মন উজাড় করে 'সুপ্রভাত' জানাতে পারছিলেন না কেউ। সবারই মন ভারাক্রান্ত। আজ বহু বছর ধরে ধবধবে ধুতি-পাঞ্জাবি পরে যে গোলগাল ছোট্ট মানুষটা ম্যাক্সাহেবের মাঠে এক উজ্জ্বল উপস্থিতি নিয়ে বিরাজ করতেন, সেই জায়গাটা হঠাৎ ফাঁকা হয়ে গেছে। কথায় কথায় আর বলে উঠবেন না 'হোয়াট অ্যা ক্রাইসিস!' তাঁর চমৎকার রসিকতাগুলি আর হাসির ঝলক উপছে দেবে না এর-ওর ঠোঁটে। বলবেন না, কী হে মিস্টার, কবে খাওয়াটা পাচ্ছি?

সোয়া ছটা নাগাদ মনোজিৎ রায় এলেন হন্তদন্ত হয়ে, বললেন, তাহলে আমরা একটা ছোট্ট সভার আয়োজন করি। ওঁর আত্মার শান্তিকামনায়—

প্রায় না-বলতেই সবাই এসে হাজির হলেন মাঠের মাঝখানে। দু-মিনিট নীরবতা পালন করার পর মনোজিৎ রায় বললেন, খুবই দুঃখের কথা এই যে, আমরা কাল আমাদের এক প্রিয়জনকে হারিয়েছি। যে মানুষটি এতকাল ধরে নিয়মিত হাজিরা দিয়ে এসেছেন, কিছুদিন ধরে অসুস্থতাবশত প্রাতঃভ্রমণে আসতে পারছিলেন না, কিন্তু তাঁর মন পড়ে থাকত মাঠে। যখনই তাঁর খবর নিতে গিয়েছি, বারবার জিজ্ঞাসা করেছেন সবাইকার কথা। এমনকী আজ যে নববর্ষের উৎসব হওয়ার পরিকল্পনা ছিল, তার খোঁজও নিচ্ছিলেন রোজ। বলেছিলেন, দেখবেন, এই অনুষ্ঠানে যেন সবাইকে ভাল করে মিষ্টিমুখ করানো হয়। বছরের প্রথম দিন মিষ্টিমুখ করলে সারা বছর মিষ্টি-মিষ্টি কথা বেরোবে মুখ দিয়ে। আরও বলেছিলেন, যে গীতি-আলেখ্যটি তোমরা ও-দিন সবাইকে শোনাবে, সেটা একদিন আমার বাড়িতেও করতে হবে। আমাকে বাদ দিয়ে তোমরা সবাই এনজয় করবে সেটি হচ্ছে না। সেদিন আমার বাড়ি নেমন্তন্ন রইল মাঠের সবাইকার।

বলতে বলতে গলাটা যেন ধরে এল মনোজিৎ রায়ের।

তথাগত গুহের গীতি-আলেখ্য গ্রন্থনায় অংশ নেওয়ার কথা ছিল আজ। তিনি বললেন, খুবই হতাশ লাগছে এই ভেবে যে, অধ্যাপক খাসনবীশ আমাদের অনুষ্ঠানটি শুনতে চেয়েছিলেন তাঁর নিজের বাড়িতে, অথচ তা শোনানোর অবকাশ দিলেন না। আমি প্রস্তাব রাখছি, ওঁর বাড়ির কাজকর্ম মিটে গেলে একদিন সবাই ওঁর বাড়িতে

গিয়ে সমবেত হই আমরা। গীতি-আলেখ্যটি অনুষ্ঠিত করব সেখানেই। আমার মনে হয়, স্বর্গ থেকে এই অনুষ্ঠান শুনে নিশ্চয়ই খুব খুশি হবেন অধ্যাপক।

বিদ্যুৎ চ্যাটার্জি, দেবাশিষ দত্ত, আরও অনেকে একযোগে বলে উঠলেন, চমৎকার প্রস্তাব।

ব্যারিস্টার নীলেশ ব্রহ্মচারী লাঠিতে ভর করে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আসলে চলে যাওয়ার কথা ছিল আমারই। অথচ আমাকে ফাঁকি দিয়ে কেমন ড্যাং-ড্যাং করে চলে গেল প্রফেসর। আই এনভি হিম—দ্যাট গ্রেট সোল।

সবশেষে উঠে দাঁড়ালেন কর্নেল। কর্নেল আজ এতটাই শোকাভিভূত, এতখানি মুহ্যমান যে, কোনও কথাই বলতে পারলেন না। শুধু তাঁর ঠোঁটদুটো বারকয়েক কেঁপে কেঁপে উঠল।

সেদিন সমস্ত মাঠে থম্ হয়ে রইল একরাশ স্তব্ধতা। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বাড়ি ফিরতে ফিরতে সবাই দেখলেন, কংক্রিটের বেঞ্চে তখনও চুপচাপ বসে আছেন কর্নেল আর ব্যারিস্টার। তৃতীয় জন তাঁদের পাশে নেই। না থেকেও আজ যেন বড় বেশি করে রয়েছেন।

শুধু সেদিনই নয়, পর-পর কয়েকদিন মাঠের পরিবেশ একটু ভারী হয়েই রইল। কর্নেল আরও বেশি করে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন ব্যারিস্টারকে নিয়ে। দু-রাউন্ডের জায়গায় তিন রাউন্ড হাঁটাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। দিনকয়েকের মধ্যে সফলও হলেন। আগের চেয়ে পায়ে অনেকটা জোর ফিরে পাচ্ছেন নীলেশ ব্রহ্মচারী। একদিন পরিহাস করে কর্নেলকে বললেনও, জানেন, কলেজে উঠে সিগারেট খাওয়া শুরু করার পর একদিন ধরা পড়ে গিয়েছিলাম বাবার কাছে। বাবা বলেছিলেন, আগে নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখ। তারপর নেশাভাঙ কোরো। তা এতদিন পর আবার সেই কথাটা আবার মনে পড়ে গেল। ড্রিঙ্কস্ তো একেবারে ছেড়ে দিয়েছি, সেদিন আবার ইচ্ছে হয়েছিল, তাতে আমার মিসেস বললেন, আগে ভাল করে দাঁড়াতে শেখ, তারপর ওসব কথা ভাববে। নইলে নয়।

সুরঞ্জনও আগের চেয়ে অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছে। আগে প্রায়ই মনে হত, রাতের বেলা ঘুমোবার পর কে যেন তার বুকে চেপে বসেছে। ধড়মড় করে উঠে বসে পড়ত হঠাৎ-হঠাৎ। বড় বড় নিশ্বাস নিত। তাতে বিশাখা ভয় পেয়ে যেত, উঠে বসে বলত, কী হল, আবার সে রকম হচ্ছে নাকি? সুরঞ্জন মাথা নাড়ত, নাহ,—

আজকাল সেই ভয়টা কেটে গেছে তার। ভালই ঘুম হচ্ছে রাতে। একদিন পাঁচ রাউন্ড হনহন করে হাঁটার পরও মনে হল, তেমন কষ্ট হচ্ছে না। হাঁপাচ্ছেও না। সকালে মর্নিং-ওয়াক করে বাড়ি ফেরার পর সারাদিন কাজ করার জন্য পাচ্ছে অফুরন্ত এনার্জি।

একদিন মনোজিৎ রায় হঠাৎ বললেন, এবার বরং আমার ক্লাবে সাঁতারে যোগ দিন। দেখবেন, ফুসফুসে আরও স্ট্রেন্‌থ্‌ পাবেন।

সুরঞ্জন ছোটবেলায় সাঁতার জানত। সাঁতার আর সাইকেল চালানো একবার শিখলে আর নাকি কেউ ভোলে না। তবু দ্বিধাগ্রস্ত হল, এতদিন পর সাঁতারে নামলে সে কি আর পারবে!

মনোজিৎ রায় কিন্তু তাঁর সাঁতারের ক্লাব নিয়ে বেশ আছেন। ভোর হতে-না-হতে তুমুল ভিড় ম্যাকসাহেবের পুকুরে। পনেরো-কুড়িজন তরুণ আর কিশোর পুকুর দাপিয়ে বেড়ায় ঘণ্টাখানেক ধরে। তাদের সঙ্গে সমানতালে মনোজিৎবাবুও।

দেখা হয়ে গেল বিদ্যুৎ চ্যাটার্জির সঙ্গে। বললেন, দেখছেন মুখার্জি, আডবানীর রথ-পলিটিক্স কী সাংঘাতিক অবস্থার সৃষ্টি করেছে দেশে!

সুরঞ্জন বলল, আডবাণী এখন যেন ধরেই নিয়েছেন, তিনিই দেশের নেক্সট প্রাইম মিনিস্টার। টি ভি-তে রামায়ণ দেখিয়ে কী ভুল করেছেন তা এখন হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছেন রাজীব গান্ধী। ফোর্থ এপ্রিল দিল্লির বোট ক্লাবে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ যে বিশাল সমাবেশ করেছে তাতে সব্বার টনক নড়েছে।

—হিন্দু মৌলবাদ জেগে উঠলে কী সাংঘাতিক অবস্থা হবে আপনি বুঝতে পারছেন!

—বুঝতে পারছি, চ্যাটার্জি। কিন্তু বি জে পি-কে রোখার কোনও উপায় কেউ খুঁজে পাচ্ছে না। স্রেফ হিন্দু আবেগের উপর নির্ভর করে বি জে পি এখন চ্যালেঞ্জ জানাতে সাহস পাচ্ছে বাকি সব রাজনৈতিক দলগুলোকে। দেখা যাক, রাজীব গান্ধী এখন কোন দাওয়াই প্রয়োগ করেন। ইলেকশন তো সামনেই।

দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সত্যিই এখন এক বাঁকের মুখে। কীভাবে পাওয়ারে আসা যায় তাই নিয়ে ছক কষছে সব রাজনৈতিক দলই। বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং খেলছেন অনুন্নত সম্প্রদায়ের তাস। বি জে পি খেলছে হিন্দু-তাস। আডবাণী বলছেন, বি জে পি যাতে নির্বাচনে লড়তে না পারে, পদ্মচিহ্ন না পায় তার জন্য চেষ্টা হচ্ছে। অন্যদিকে অন্যেরা বলছে, ধর্মের সঙ্গে রাজনীতিকে মেশাচ্ছে বি জে পি। অবস্থা সামাল দিতে পঁচিশে মার্চ ঝাঁসির কাছে পীতাম্বরী দেবীর মন্দিরে পুজো দিয়ে উত্তরপ্রদেশে নির্বাচনী প্রচার শুরু করলেন রাজীব গান্ধী।

এতসব ভাবতে ভাবতে নতুন করে রাউন্ড দিতে শুরু করে সুরঞ্জন। নাগকেশর গাছটার কাছাকাছি পৌঁছে হঠাৎ একঝলক মিষ্টি গন্ধ নাকে ঠোনা দিতেই থমকে দাঁড়ায়। কয়েকদিন ধরেই গন্ধটা পাচ্ছে। আজ যেন সে গন্ধ আরও তীব্র। মিষ্টি সুবাস নাকের ভেতর দিয়ে ভরে যাচ্ছে ফুসফুসে, স্নায়ুতে। কে যেন দাঁড়িয়ে আছেন গাছের পাশেই। সে একলহমা দাঁড়িয়ে বলল, কী দেখছেন, প্রতুলদা?

প্রতুল সেন একজন বিখ্যাত ফুলপ্রেমিক, থাকেন বেচারাম চ্যাটার্জি রোডে। সুরঞ্জনের বাড়ির খুব কাছেই। বললেন, অনেকদিন পরে নাগকেশর দেখছি। সচরাচর দেখা যায় না এ ফুল। আমার খুব প্রিয়।

প্রতুল সেন তাঁর বাড়িতে হরেকরকমের ফুলের চাষ করেন। তাঁর বাড়ির সামনে পাঁচ ফুট উঁচু পাঁচিল। পাঁচিলের সামনে দাঁড়ালে ভেতরে শুধু রং আর রং। কত রঙের ফুল তাঁর বাগানে! কত রকমের! পাতাবাহারই যে কত ভ্যারাইটির তার ইয়ত্তা নেই।

প্রতুল সেন তখন বলছেন, অনেকদিন আগে বহরমপুরের কাছে সারগাছিতে এই গাছ দেখেছিলাম। কী দারুণ কনস্ট্রাকশন ফুলগুলোর খেয়াল করেছ?

সুরঞ্জন আগ্রহী হয়, কী রকম?

—ভাল করে লক্ষ করে দেখ, নাগকেশরের দুটো পার্ট। উপরে সাপের মতো ফণা তুলে আছে ম্যাজেন্টায় লালে মেশানো গুচ্ছ-গুচ্ছ কেশর। নীচের চাতালে হালকা-হলুদ ধানবনের মতো চেহারা। তার মাঝখানে শিবলিঙ্গের মতো একটু কিছু। এই কনস্ট্রাকশনের একটা অদ্ভুত ব্যাখ্যা আছে। ব্যাখ্যা হল, শিব ধ্যান করছেন ধানক্ষেতে বসে। তার মাথায় রৌদ্র আড়াল করে ফণা তুলে দাঁড়িয়ে আছে সহস্র নাগ!

—বাহ্, চমৎকার তো ব্যাখ্যাটা, সুরঞ্জন হতবাক হয়, এতদিন ধরে ফুলগুলো দেখছি, কখনও এভাবে ভাবিনি তো ব্যাপারটা।

প্রতুল সেন ততক্ষণে যেন স্বগতোক্তির মতো বিড়বিড় করছেন, ভাবা যায়, একটা এতবড় গাছের কাণ্ড ফুঁড়ে এমন নিখুঁত গড়নের ফুলের জন্ম হচ্ছে প্রতিদিন! এক ঈশ্বর ছাড়া আর কে এমন নিখুঁত নির্মাণ করতে পারে, বল!

সুরঞ্জন হাসল, আপনি খুব ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, তাই না?

—তা একটু করি। তবে রোজ পুজোআচ্চা করতে বসি না। ফুলের বাগানই আমার কাছে মন্দির। যতক্ষণ ফুলের পরিচর্যা করি, ততক্ষণই মনে হয়, আমি ঈশ্বরের কাছেই বসে আছি। একটা সামান্য বীজ থেকে এমন এক-একটি ফুলের গাছ, সেই গাছ থেকে চমৎকার সব ফুল, তার রং, তার ডিজাইন, কে এতসব নিখুঁত প্ল্যানিঙে তৈরি করল, বলতে পার? প্রতিটি ফুলেরই গঠনসৌকর্য বিস্মিত করার মতো। সে গোলাপই বল, চন্দ্রমল্লিকাই বল, ডালিয়া, কনকচাঁপা বা নাগকেশর—যাই হোক না কেন। আরও কি আশ্চর্য জান, এত সব ফুলের পাপড়ি সাজানোর ব্যাপারেও একটা জ্যামিতিক গঠন আছে।

সুরঞ্জন আশ্চর্য হয়, জ্যামিতিক গঠন!

—যে ফুলের চারটে পাপড়ি, তার চারটে পুংকেশর, চারটে গর্ভকেশর থাকে। যার ছটা পাপড়ি, তার ছটা পুংকেশর, ছটা গর্ভকেশর। এইটেই স্বাভাবিক নিয়ম।

তবে তার ব্যতিক্রমও অবশ্য আছে। এমনকি ফুলের পরাগধানীর গঠনও একটি নির্দিষ্ট নিয়মে তৈরি। দেখে মনে হবে, কোনও শিল্পী রং-তুলি নিয়ে বসে অনেক মাপজোক করে এক-একটা ফুলের ডিজাইন তৈরি করেছেন।

সুরঞ্জন ঘাড় নাড়ে, খুব অদ্ভুত, তাই না?

—কিন্তু আমার শুধু অবাক লাগে, কে তৈরি করল এতসব ডিজাইন! বৈজ্ঞানিকরা বলেন, প্রাকৃতিক নিয়মে তৈরি, বিবর্তনের নিয়ম অনুযায়ী তৈরি হয়েছে ফুলের গঠন, গাছের গঠন, এমনকি মানুষের শরীরের এই গঠন, তার যন্ত্রাংশ সবই। কিন্তু বৈজ্ঞানিকরা যাই বলুন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এইসব সৃষ্টির খেলা আমার খুবই আশ্চর্যজনক মনে হয়। যেন কেউ অদৃশ্যে থেকে নিয়ন্ত্রণ করছেন এই বিশ্বের বিপুল কর্মকাণ্ডগুলি।

—তাহলে বলছেন, এই সমস্ত কিছুই ঈশ্বরের তৈরি!

—এক্জ্যাক্টলি। কোনও একটা সুপারপাওয়ার কন্ট্রোল করছে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। গাছ, লতা, পাতা, পিঁপড়ে থেকে শুরু করে মানুষ, সবকিছুই এক মহাবৈজ্ঞানিকের মতো নিজের হাতে তৈরি করেছেন সেই অদৃশ্য শক্তি। আমার বাগানে রোজ কাজ করার সময় আমি সেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব সর্বক্ষণ অনুভব করি।

সুরঞ্জন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে প্রতুল সেনের মুখের দিকে। ওঁর চোখেমুখে এই মুহূর্তে এক অদ্ভুত আলোর খেলা। বোধহয় ঈশ্বরভাবনার প্রতীক হয়ে জেগে উঠেছে এই আলো। চোখের তারায় ঝকঝক করছে চমৎকার দ্যুতি।

প্রতুল সেন তখনও বলে চলেছেন, ঈশ্বর আছেন কি নেই এ নিয়ে বিতর্ক চলতে পারে। কিন্তু ঈশ্বরভাবনার একটা পজিটিভ রেজাল্ট আছে। যতক্ষণ তুমি ঈশ্বর সম্পর্কে ভাবনাচিন্তা করবে, দেখবে তোমার মনের স্বাভাবিক স্তর উন্নীত হয়ে এক অন্য স্তরে বিরাজ করছে। মনের ভেতর একটা সতেজ ভাব এসেছে। তাতে মন প্রফুল্ল থাকছে, একটা ডিভাইন অনুভূতি সজীব রয়েছে তোমাতে। সেইটেই লাভ। যেমন ভোরের দূষণমুক্ত বাতাস তোমাকে ফ্রেশ করে তুলছে, তেমনই পনেরো-কুড়ি মিনিট বা তার বেশি সময়, যতটা তুমি অ্যাফোর্ড করতে পার, ঈশ্বরভাবনায় নিজেকে নিয়োগ করলে তেমনই স্তব্ধ, সতেজ হয়ে উঠবে শরীর। সবটাই মনের ব্যাপার। কনসেনট্রেশনের ব্যাপার।

—বাহ্, বেশ বলেছেন প্রতুলদা। এভাবে ভাবিনি কখনও। বলতে বলতে হেসে ফের হাঁটতে শুরু করল সুরঞ্জন।

প্রতুল সেনের কথাগুলো তার মাথার ভেতর ঘুরতে থাকে। অনেকদিন আগে কে যেন তাকে বলেছিল, প্রত্যেক মানুষের ভেতরই ঈশ্বর লুকিয়ে থাকেন। রোজ

একপাতা করে গীতা পাঠ করবে, দেখবে, আস্তে আস্তে সেই ঈশ্বর জেগে উঠবেন তোমার ভেতরে।

কয়েকদিন ধরে এইসব অদ্ভুত ব্যাপারগুলো ঘুরপাক খেতে থাকে সুরঞ্জনের মাথার ভেতর। এই আত্মানুসন্ধানও মানুষের জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এমন মনে হতে থাকে তার।

বিষয়টি মনের ভেতর ঢালা-উপুড় করতে করতে একদিন ভোরবেলা সে বেরুতে যাচ্ছে ম্যাকসাহেবের মাঠের দিকে, হঠাৎ নতুনপাড়ার মোড়ে দেখা হয়ে গেল মনোজিৎ রায়ের সঙ্গে। সঙ্গে তাঁর ক্লাবের ছেলেরা। সবাই সাঁতারের অনুশীলন করতে যাচ্ছে।

—কী ব্যাপার, এখানে দাঁড়িয়ে যে মনোজিৎবাবু?

—আজ মাঠে যাবেন না। খুব খারাপ খবর আছে।

সুরঞ্জনের বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে, আবার কী খারাপ খবর? যেন ফিসফিস করে উঠলেন মনোজিৎ রায়, রাজীব গান্ধী সট ডেড।

—সে কি! সুরঞ্জন যেন বিশ্বাস করতে পারে না, কখন শুনলেন?

—রাতের খবরে। সঙ্গে সঙ্গে বাংলা বন্ধ্ ডেকে দিয়েছেন আমাদের চিফ মিনিস্টার।

—কী করে হল? আবার কি পঞ্জাবিরাই?

—তা পরিষ্কার করে বলেনি। মাদ্রাজের কাছে কোথায় যেন মিটিং করতে গিয়েছিলেন। সেখানেই—

সুরঞ্জন থমকে গেল মুহূর্তে। মাত্র সাত বছর আগে এভাবেই ইন্দিরা গান্ধী গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন। যখন খবরটা পেয়েছিল, তখন সে কলকাতা কর্পোরেশনের অফিসে একটা দপ্তরে বসে। কার সঙ্গে যেন দেখা করতে গিয়েছিল অফিসের টিফিন টাইমে। শুনতে পেয়েছিল, চাঁদনিচকের কাছে তখন গোলমাল শুরু হয়ে গেছে। বাস-ট্রাম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কলকাতার রাস্তায়। সে দ্রুত কর্পোরেশন অফিস থেকে বেরিয়ে চৌরঙ্গির মোড়ে এসে দেখতে পায় রাস্তা প্রায় সুনসান। বাস-ট্রাম নেই বললেই চলে। যা দু-একটা আসছে, তাতে ঠাসবুনোটি ভিড়। মিনিট পনেরোর চেষ্টায় যে মিনিবাসটিতে সে উঠতে পারল, সেটা যাচ্ছে গড়িয়াহাট। সেই বাসেই উঠে পড়ল শুধু এ জন্যেই যে, এই মুহূর্তে চৌরঙ্গি এলাকা থেকে যতটা দূরে চলে যাওয়া যায়। গড়িয়াহাট পৌঁছে দেখেছিল, ততক্ষণে কলকাতা অচল, স্তব্ধ। সেদিন গড়িয়াহাট থেকে বেহালা নতুনপাড়া পর্যন্ত পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরতে হয়েছিল তাকে। বেহালায় চলে এসেছিল চলমান আরও বহু মানুষের পিছু-পিছু। গোলমালের ভয়ে কোনও শর্টকার্ট গলি ধরতে সাহসই পায়নি কেউ। সদর রাস্তায় হেঁটেছিল সবাই।

আজও নিশ্চয় তেমন গোলমালের আশঙ্কায় বন্ধ ডেকে দিয়েছেন জ্যোতি বসু। হয়তো আবারও দাঙ্গা বাধতে পারে, আবারও সৃষ্টি হবে নতুন নতুন ডালিমদের।

রাজীব গান্ধীর মৃত্যুতে ভারতবর্ষের ইতিহাস অনেকটাই বদলে গেল রাতারাতি। কংগ্রেসের হাত থেকে ভোটের হাওয়া অনেকখানি ছিনিয়ে নিতে পেরেছিল বি জে পি। হঠাৎ ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনায় নির্বাচনে সেই 'সহানুভূতির হাওয়া' উঠল, যার বলে বলীয়ান হয়ে সাত বছর আগে রাজীব গান্ধী নিজেই জিতেছিলেন নির্বাচনে। নাইনটিন এইট্টি ফোর, আর নাইনটিন নাইনটি ওয়ান—দুবারের নির্বাচনে কোথাও যেন একটা মিল আছে। এবারের কর্ণধার হলেন নরসীমা রাও।

দেশে নতুন প্রধানমন্ত্রী হতেই রাজনীতির ছক অনেকটা পালটে গেল। তার সঙ্গে দেখা দিল ভয়াবহ অর্থনৈতিক সমস্যা—যা গত কয়েক মাস ধরে নাকানি-চোবানি খাইয়েছে আগের প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রশেখরকেও।

ততদিনে ঘোর বর্ষা নেমে এসেছে দেশে। এতসব রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে ধারাশ্রাবণের জল কখনও কখনও ডুবিয়ে দিচ্ছে গোটা কলকাতাকে। অফিস-ফেরতা মানুষকে কাঁদিয়ে ছাড়ছে। হাওড়া-শিয়ালদহ লাইনে ট্রেন চলাচল ব্যাহত। সন্ধের পর কলকাতার পথে প্রায়শ উধাও হয়ে যচ্ছে বাস। কখনও ভোর থেকে টানা ঝিরঝিরে বৃষ্টি। একদিন দুদিন তিনদিন। চতুর্থ দিনে হয়তো একটু পরিষ্কার আকাশ।

এতসব অস্থিরতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেও কিন্তু ম্যাকসাহেবের মাঠে আসার বিরাম নেই কর্নেলের। কোনও দিন বা ছাতা মাথায় চাপিয়েই চলে এলেন মাঠে। এসে দেখলেন তিনি একাই সেদিন এসেছেন। একবছর আগে কিন্তু এ দৃশ্য কল্পনাই করা যেত না। প্রফেসর খাসনবীশ আর ব্যারিস্টার ব্রহ্মচারী উপস্থিত থাকতেন নিশ্চয়ই। একটা বছর মহাকালের ইতিহাসে খুব বেশি সময় নয়। কিন্তু এতটুকু সময়ের মধ্যে ম্যাকসাহেবের মাঠের ইতিহাস বদলে গেছে একেবারে।

তিনদিন পর আকাশ পরিষ্কার হতে দেখলেন, খুব ভোর-ভোর মাঠে চলে এসেছে সুরঞ্জন। মাঠে জল-কাদা বলে সে রাউন্ড না দিয়ে বসল কর্নেলের পাশে, কংক্রিটের বেঞ্চিতে। গত একবছরে অনেকটা পরিবর্তন হয়েছে তারও। স্বাস্থ্যটা একটু ফিরেওছে মনে হয়। বেঞ্চিতে বসে হঠাৎ বলল, আপনাকে খুব বিষণ্ণ দেখাচ্ছে, কর্নেল।

কর্নেল হাসলেন ম্লানভাবে, মনটা ভাল নেই, সুরঞ্জন, মাঝে-মাঝে মনে হয় বড় দীর্ঘদিন বেঁচে আছি, দিস ইয়ার অ্যায়াম গোয়িং টু টাচ এইট্টি। নাউ আই শুড্ সে গুডবাই টু অল অব্ ইউ, অফটার লং এইট্টি ইয়ারস্।

কথাটা শুনে চমকে উঠল সুরঞ্জন। বলল, আপনি তো এ ধরনের কথা বলেন

না, কর্নেলদা। আপনি তো সবসময়েই আশাবাদী, সারাজীবন তো অন্যকে প্রেরণা জুগিয়েছেন। এই যেমন আমাকেই। আমি তো একসময় ভেবেছিলাম আর কোনও দিন ভাল হয়ে উঠব না। হয়তো শয্যাশায়ী হয়ে বেঁচে থাকব। হয়তো মরেই যাব। কিন্তু মাত্র একবছরেই আমি ঢের সুস্থ হয়ে উঠেছি। বোধহয় ছোটবেলা থেকে কখনও এতটা সুস্থ থাকতাম না। দীর্ঘ জীবন বেঁচে থাকাটাও তো ক্রেডিট।

—আসলে দীর্ঘ জীবন সুখেরও বটে, দুঃখেরও বটে। দীর্ঘ জীবন লাভ করে অনেক কবি-সাহিত্যিক-চলচ্চিত্রকার-অভিনেতা অনেক কিছু দিয়ে গেছেন পৃথিবীকে। আমাদের রবীন্দ্রনাথই তো পঞ্চাশ পার হওয়ার পর জীবনের শেষ ত্রিশ বছরে কী দারুণ সব গল্প-কবিতা-গান উপহার দিয়ে গেছেন। কিংবা ওয়ার্ডওয়ার্থ, ব্রাউনিং, ভিক্টর হুগো, বার্টান্ড রাসেল, অথবা চার্লি চ্যাপলিনের কথাই ধর না কেন, সবাই এইট্টি ক্রশ করেছিলেন। কিন্তু এঁদের কথা আলাদা। আমার তো কোনও কনট্রিবিউশন নেই পৃথিবীতে। শুধু শুধু এত দীর্ঘ জীবন বেঁচে থেকে পৃথিবীর বোঝা বাড়িয়ে লাভ কী!

প্রতিবাদ করল সুরঞ্জন, কে বলল আপনার কোনও কনট্রিবিউশন নেই? এই যে মাঠের এতসব মানুষকে প্রতিদিন দেখভাল করছেন, তাদের অ্যাডভাইজ করছেন, তাদের সুখদুঃখের শরিক হচ্ছেন, এটা কি কনট্রিবিউশন নয়! তা ছাড়া, দেশের জন্য আপনি লড়াই করেছেন। ভারত-চীন যুদ্ধ, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ—সিক্সটি টু, সিক্সটি ফাইভ—দুটোতেই তো আপনি—

—সে তো অনেকদিন হয়ে গেল সুরঞ্জন। পাস্ট ইজ পাস্ট। উই শ্যুড লিভ উইথ দ্য প্রেজেন্ট। উই শ্যুড লুক ফর দ্য ফিউচার। তবে হ্যাঁ, একটা কথা ঠিক, দীর্ঘ জীবন বেঁচে থাকলে ইতিহাসের ভাঙাগড়া লক্ষ করা যায়। কত যে উত্থান-পতন দেখে গেলাম এ জীবনে!

বলতে বলতে মুখটা হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল কর্নেলের, দেখ সুরঞ্জন, দেশ, কাল, পৃথিবী মাঝেমধ্যে একটা বাঁকের মুখে এসে দাঁড়ায়। যে রাশিয়ায় এক সময় মনে হয়েছিল, কমিউনিস্ট পার্টির কোনও বিকল্প নেই, সেখানে গর্বাচেভ হঠাৎ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন সেই পার্টিকে। আবার যে গর্বাচেভকে রাশিয়ার মুক্তিসূর্য বলে মনে করছিলেন কেউ কেউ, তাঁর বিরুদ্ধে গত দু-দিন আগে ক্যুপ হতে চলেছিল। ভাগ্যিস ইয়েলেতসিন ভীষণ সাহস দেখিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন পথে, তাই গর্বাচেভ রক্ষা পেলেন। কিন্তু ইতিহাস আবার কীভাবে বাঁক নেবে তা জানে না। শেষ পর্যন্ত হয়তো গর্বাচেভও তলিয়ে যাবেন ইতিহাসের নীচে—

সুরঞ্জন মাথা নাড়ল, এই দেখুন না, ভারতবর্ষের রাজনীতিই কীরকমভাবে বদলে

গেল।

—সত্যিই, নরসীমা রাও কোনও দিন ভাবতেই পারেননি, তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রী হবেন। প্রধানমন্ত্রী হয়েই দেখলেন, দেশের অর্থনীতির কী ভঙ্গুর অবস্থা। নতুন অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিং বলেছেন, আয়্যাম লাইক অ্যা পিজিয়ন থ্রোন অ্যামঙ দ্য ক্যাট্‌স্‌। ভরতুকি তুলে দেবেন বলে ঘোষণা করেও শেষ পর্যন্ত সমালোচকদের চাপে, বিরোধী পক্ষের চাপে কিছুটা পিছু হটলেন।

সুরঞ্জন অবাক হচ্ছিল। কর্নেল আজ হঠাৎ মুখে এক অদ্ভুত প্রশান্তি নিয়ে আলোচনা করছেন দেশ, কাল নিয়ে। একটু থেকে আবার বললেন, আমাদের প্রফেসর বেঁচে থাকলে বলতেন, হোয়াট অ্যা ক্রাইসিস—

প্রফেসরের কথা মনে পড়তেই হঠাৎ কেমন স্তব্ধ হয়ে গেলেন কর্নেল। প্রায় চার মাস আগে বাংলা নববর্ষের ঠিক আগের দিন প্রফেসর খাসনবীশ তাঁদের ছেড়ে চলে গেছেন। দীর্ঘকালের বন্ধু চলে যেতে বেশ অনেকখানি উদ্‌ভ্রান্তের মতো হাঁটাচলা করতেন তিনি। প্রায়ই বিড়বিড় করে কী-সব বলতেন। ইদানীং সেই ধাক্কা সামলে উঠলেও বেশ হতাশ হয়ে পড়েছেন মনে মনে। ভারী একা হয়ে গেছেন। ঋজু দীর্ঘ শরীরটা বয়সের ভারে হঠাৎ যেন ন্যুজ হতে শুরু করেছে।

কয়েকদিন আগে একটা চিঠি এসেছে মালবিকার। তারা ব্যাঙ্গালোরে গিয়ে বেশ বড় একটা বাংলো পেয়েছে। শহরের সবচেয়ে সুন্দর আর নিরিবিলি জায়গায় বাংলোটা। লিখেছে, কিছুদিনের জন্য এসে ঘুরে যাও, বাবা। খুব ভাল লাগবে। যে পাড়াটায় আছি, একেবারে ছবির মতো। সঙ্গে তিতিরও একটা দীর্ঘ চিঠি দিয়েছে। দাদু, এস না একবার! তোমাকে কতদিন দেখিনি। আমেরিকা থেকেও আবার পত্রাঘাত, কলকাতার বাড়িঘর ডিজপোজ অফ্‌ করে চলে এস একেবারে। এখানেই সেট্‌ল্‌ করছি। আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম আর ইন্ডিয়ান পরিবেশে খাপ খাওয়াতে পারবে না—সে কথা ভেবেই—

কর্নেল চুপচাপ ভাবেন, আর দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। এই পোড়া দেশটা ছেড়ে তাঁর বোধহয় আর কোথাও যাওয়া হবে না। উনত্রিশ বছর আগে তাঁর স্ত্রী রেবা যে বাড়িতে শুয়ে তাঁকে গুডবাই করে চলে গিয়েছিল, বাকি যে কদিন বাঁচবেন, সেখানেই কাটিয়ে দিতে চান। কলকাতার উপর তাঁর বড় মায়া।

এমন সব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ নজরে পড়ল, মাঠে আরও কয়েকজন প্রাতঃভ্রমণকারী এসে পৌঁছেছেন। সারা মাঠে কাদা আর জল বলে অনেকেই বসে পড়ছেন কংক্রিটের বেঞ্চে। কেউ কেউ গোলপোস্টের কাছে দাঁড়িয়ে ব্যায়াম সেরে নিচ্ছেন। তাদের মধ্যে একজন মিস্টার সিন্‌হা। কোমরে হাত রেখে বৈঠক করেছেন।

মিসেস সিন্‌হা বেশ কয়েকদিন মাঠে আসেনি দেখে সেদিন তার কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন কর্নেল, কী ব্যাপার, দেবলীনা আসছে না কেন আজকাল?

হঠাৎ মিস্টার সিন্‌হা কেমন রেগে উঠলেন, বললেন, মাঠে তো ইদানীং আসত প্রেম করার জন্য। তাই আমি বারণ করে দিয়েছি।

কর্নেল বেশ থতমত খেয়ে গিয়েছিলেন কথাটা শুনে। কিছুদিন ধরে অবশ্য লক্ষ করছিলেন, মাঠে দেবলীনা এসে তথাগতর সঙ্গে একটা দুটো রাউন্ড হাঁটে। দুজনে গল্পগুজব করে, হাসি-ঠাট্টা করে তাও দেখেছেন। কিন্তু তার যে এমন একটা পরিণতি ঘটবে তা ভাবতে পারেননি।

মিস্টার সিন্‌হা তারপরও বলেছিলেন, জানেন, সুন্দর চেহারার লোকগুলো লেডি-কীলার হতে ভালবাসে। তারা তাদের চেহারা দিয়ে, কথা দিয়ে মেয়েদের ভোলায়। নানারকম প্রলোভন দেখায়। রেডিওতে চান্স করে দেবে, টিভি-তে চান্স করে দেবে বলে নিয়ে বেরোয়। তারপর—

কর্নেল স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। মাথা নাড়তে নাড়তে ফিরে এসেছিলেন নিজের জায়গায়। পর-পর অনেকগুলো ঘটনা এমন ঘটে গেল যে, আজকাল ভীষণ ক্লান্ত লাগে তাঁর। এই তো কদিন আগে ভীষণ একটা দুর্ঘটনা ঘটে যেতে মনোজিৎও আর মাঠে আসছে না।

ভাবতে ভাবতে তাঁর নজর চলে গেল ফাদার ম্যাকডোনাল্ডের নিজের তত্ত্বাবধানে কাটানো বিশাল শান-বাঁধানো পুকুরটার দিকে। বর্ষার জলে ডুবুডুবু পুকুর এই মুহূর্তে শান্ত, নিস্তরঙ্গ। কিছুদিন আগেও মনোজিৎ রায় তার ছেলেদের নিয়ে সারা সকাল ঝাঁপাই জুড়ত পুকুরে। গোটা মার্চ-এপ্রিল দাপিয়ে বেড়িয়েছে জলের মধ্যে। হঠাৎ একদিন প্রবল হইচই শুনে দাঁড়িয়ে পড়লেন পুকুরের ধারে। সাঁতারুরা তখন জল ছেড়ে উঠে পড়েছে পাড়ে। সবাই বিপন্ন মুখে তাকিয়ে আছে পুকুরের মাঝখানের দিকে। কে যেন বলল, ডুবে গেছে, ডুবে গেছে।

কে ডুবে গেছে, কী করে ডুবে গেছে কিছুই বুঝতে পারছিলেন না কর্নেল। শুধু দেখলেন, বাকি সব সাঁতারুই ততক্ষনে নিজের নিজের পোশাক পরে নিয়েছে, শুধু একসেট জামা-প্যান্ট তখনও পড়ে আছে কিনারে। দেখে বুকটা ছাঁৎ করে উঠেছিল।

সবাই তখন চেঁচাচ্ছে, কার ছেলে, কাদের বাড়ির ছেলে?

মনোজিৎ রায় তখনও পাংশুমুখে তাকিয়ে আছেন জলের দিকে। বললেন, বুঝতে পারছি না। তবে আমার সঙ্গে যারা সাঁতার কাটত তারা কেউ নয়।

ভিড়ের মধ্য থেকে কে যেন চেঁচিয়ে বলল, কেউ জলের মধ্যে গিয়ে একটু খুঁজুন না? খুঁজলেও হয়তো পাওয়া যেত।

কিন্তু জলে লাফিয়ে পড়ে একজন ডুবন্ত মানুষকে বাঁচানোর মতো সাহস ও শক্তি বোধহয় কারোরই ছিল না সেখানে।

কর্নেল উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, কী সর্বনাশ! কাদের বাড়ির ছেলে!

মনোজিৎ রায় বললেন, ঠিক বুঝতে পারছি না। ইদানীং এ-পাড়া ও-পাড়া থেকে ছেলেরা চলে আসছিল সাঁতার কাটতে। সব চিনিও না।

কে যেন বলল, তিনটে ছেলে ঠাকুরপুকুর থেকে দু-তিনদিন ধরে আসছিল। আজ একটু বেশি দুঃসাহসী হয়ে পার হতে গিয়েই একজনের দম ফুরিয়ে গিয়েছিল।

—বাকি দুই বন্ধু তাহলে কোথায় গেল?

—তারা ভয় পেয়ে পালিয়ে গেছে। তিনজনেই এবার একসঙ্গে মাধ্যমিক দিয়েছিল।

পুকুরের চারদিকে ভিড় বেড়েই চলেছিল। সমস্ত বিকেল ধরে খুঁজেও উদ্ধার করা যায়নি ছেলেটাকে। পরদিন সকালে ভেসে উঠেছিল তার লাশ।

খুব আঘাত পেয়েছিল মনোজিৎ। তার সেই বোস-মাসিমার আত্মীয়দের কাছে একবার ঘা খেয়েছিল, তারপর আবার এখানে। ক্ষোভে দুঃখে সাঁতার শেখানো বন্ধ করে দিয়েছে তারপর। মাঠেও আজকাল আসছে না প্রায়।

ফাদার উইলিয়াম কদিন পরে বলেছিলেন, পুকুরটা খুব বিপজ্জনক। দিস ইজ ফিফ্‌টিয়েথ ইনসিডেন্স।

—ফিফ্‌টিয়েথ! কর্নেল স্তম্ভিত হয়েছিলেন। এর আগেও কয়েকটা মৃত্যুর খবর কানে এসেছিল তাঁর। তারপর বেশ কিছুদিন স্নান করা বন্ধই হয়ে গিয়েছিল পুকুরে।

ঘটনাটা তাঁর মন বিষণ্ণ করে রেখেছিল বেশ ক'দিন। আজ নির্জন পুকুরটার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

তিনদিন পর আকাশে আলো ফুটতে আস্তে আস্তে আরও কিছু প্রাতঃভ্রমণকারীদের আসতে দেখা গেল। তাঁদের মধ্যে দু-তিনজন প্রায়-বৃদ্ধও আছেন, যাঁদের কর্নেল আগে কখনও দেখেননি। এ রকম নতুন এক-এক দল মানুষ প্রায়ই কখনও একা, কখনও দল বেঁধে স্বাস্থ্যোদ্ধারে এসে থাকেন। কেউ কেউ হাঁটা চালিয়ে যেতে থাকন, কেউবা দু-চারদিন এসে ফের বন্ধ করে দেন। অনেকেই ভোর-ঘুম ছেড়ে এত কষ্ট করার প্রয়োজনীয়তা খুঁজে পান না।

মাঠে নতুন মানুষ এলেই আগে কর্নেল তাঁদের সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করতেন, বাহ্, চমৎকার, কোথায় থাকেন? বীরেন রায় রোডে। পূর্ব, না পশ্চিম? কোথায়? প্যারিসপাড়া, না কি নতুনপাড়ার দিকে? ওহ্, বেচারাম চ্যাটার্জি রোডে? আজকাল সেই আগ্রহটা হারিয়ে ফেলছেন আস্তে আস্তে। নতুন মানুষদের সঙ্গে আলাপ হওয়া মানেই মায়া বাড়ানো। তাদের সুখ-দুঃখের শরিক হওয়া। তাতে দিনে-দিনে কষ্ট

বেড়ে যাচ্ছে আজকাল।

হঠাৎ অনিরুদ্ধ শাসমলকে দেখে চমকে উঠলেন সেদিন। কাকলি মারা যাওয়ার পর অনেকদিন দেখেননি তাকে। আরও বয়স্ক, আরও শীর্ণ হয়ে গেছে যেন। এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন আছ, অনিরুদ্ধ? বুকের ব্যথাটা আরও বেড়েছে?

অনিরুদ্ধের চোখের গোড়ায় কেমন কালসিটে দাগ পড়েছে। সামান্য হেসে বলল, ক্লাস টেনে উঠেছে মেয়েটা। যদি আরও কটা বছর বেঁচে থাকতে পারতাম—

কর্নেল মৃদু ধমক দিয়ে বলেছেন, অহেতুক চিন্তা কোরো না তো। মনের জোর বাড়াও, দেখো, ঠিক হয়ে যাবে সব।

—না, কর্নেলদা। আর ঠিক হবে না। সময় হয়ে এসেছে বুঝতে পারছি। কলেজে যাওয়া কবেই তো বন্ধ করে দিয়েছি। এখন সারাক্ষণ বুকের ভেতর যন্ত্রণা হচ্ছে। ডাঃ জে সি মুখার্জিও এখন আর আগের মতো আশা দিতে পারছেন না—

অনিরুদ্ধের চেহারা দেখেই তা বুঝতে পারছেন কর্নেল, তবু তাকে আশ্বস্ত করতে বিন্দুমাত্র খামতি নেই তাঁর, ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখ, অনিরুদ্ধ। কত সময় মির‍্যাক্‌ল্ ঘটে যায়। ঈশ্বরের সৃষ্টি এই শরীর। এর রহস্য মানুষ পুরোপুরি আবিষ্কার করতে পারবে না কোনও দিন।

—সামনের সপ্তাহে ডাঃ জে সি মুখার্জি নার্সিংহোমে ভর্তি হতে বলেছেন।

—তাই নাকি!

এভাবে একটার পর একটা খারাপ সংবাদে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন কর্নেল। যত একা হয়ে পড়ছেন, ততই বিপন্ন বোধ করছেন ভেতরে-ভেতরে। তবু মাঠের সঙ্গে এমন একটা নাড়ীর সংযোগ হয়ে গেছে যে না এসে পারেন না। ভোরের আলো না ফুটতেই প্রতিদিন নিয়ম করে—

এর মধ্যে একদিন সৌপ্তিক সসংকোচে এসে দাঁড়াল তাঁর সামনে, তিতির কি ব্যাঙ্গালোর চলে গেছে?

সৌপ্তিককে যেন আরও ব্রাইট মনে হচ্ছে তাঁর। কদিন আগে তার রেজাল্ট বেরিয়েছে। ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে অনার্সে। এম এস-সিতে ভর্তি হয়ে যাবে কদিনের মধ্যে। বললেন, হ্যাঁ—

—ওর ঠিকানাটা একবার দেবেন?

সৌপ্তিকের দাড়িগোঁফে ভরা মুখখানার দিকে ভাল করে তাকালেন। শান্ত, প্রেমিক চাউনি। ছেলেটাকে খুব ভাল লাগে তাঁর। বললেন, ঠিক আছে, কাল নিয়ে আসব। কিন্তু বিশ্বজিৎ আসছে না কেন মাঠে? সে তো শরীরের ব্যাপারে প্রচণ্ড সজাগ।

সৌপ্তিক হাসল, আমার সঙ্গেও কয়েকদিন দেখা হয়নি। খুব নাকি ব্যস্ত আছে।

—ও, কর্নেল কেন যেন উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন। আজকাল সব ব্যাপারেই চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন খুব।

মাঠে একা-একা ঘুরছিলেন নিশীথ দাশগুপ্ত, জিজ্ঞাসা করলেন, কবে রিটায়ারমেন্ট?

—আর দু-মাস আছি চাকরিতে।

—তারপর কী করবে কিছু ঠিক করেছ?

—না, এখনও বুঝতে পারছি না কী করা যায়।

—তুমি তো ল' পাশ করেছিলে। কোর্টে নামটা এনরোল করাও। কদিন যাতায়াত করতে-করতে পশার করে ফেলতে পারবে। ঘোষদস্তিদারের খবর কী?

—ছেলে আর ছেলের বউকে দেখতে প্রায়ই চক্রধরপুরে যেতে হচ্ছে। তবে একটা ভাল খবর আছে। ছেলে বোধহয় দু-এক মাসের মধ্যে কলকাতার কাছেই কোথাও ট্রান্সফার হচ্ছে।

—বাহ্, তাহলে তো বেশ ভালই হয়।

কয়েকদিন পর হঠাৎ কাবেরীকে দেখে ভারী চমকে উঠলেন কর্নেল। হাতে দুধের ক্যানটি নেই। পরিবর্তে তার সিঁথিতে সিঁদুর। হাতে চুড়ি-শাঁখা-পলায় এক অন্য চেহারা। তাহলে এর মধ্যে কাবেরীর বিয়ে হয়ে গেল! কার সঙ্গে? সেই জন্যেই কি অভিমানে-হতাশায় বিশ্বজিৎ মাঠে আসা ছেড়ে দিয়েছে!

মনে মনে বিস্মিত হলেন খুব। কষ্টও পেলেন।

কাবেরী কিন্তু তার দিকে তাকিয়ে হাসল, আপনি ভাল আছেন?

—হ্যাঁ। তুমি?

কাবেরী ঘাড় নেড়ে হাসল। সে ভালই আছে। তারপর পেছন ফিরে তাকাল। তার নজর অনুসরণ করে সেদিকে তাকালেন কর্নেল। সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেলেন বিশ্বজিৎকে। আজ তার পরনে সেই সবুজ স্যান্ডো গেঞ্জি আর কালো প্যান্ট নেই। তার বদলে গরদের পাঞ্জাবি, সাদা চুস্ত পায়জামা। কর্নেলের কাছে এসে একগাল হেসে বলল, বিয়েটা করে ফেললাম।

—তাই নাকি? কর্নেলের বুকটা ভরে গেল হঠাৎ। আনন্দে তাঁর চোখ ফেটে জল এসে গেল। ততক্ষণে বিশ্বজিৎ আর কাবেরীকে ঘিরে ধরেছে সৌপ্তিক, নিলয়দের দল, কী বিশ্বজিৎদা, আমাদের না জানিয়ে এ রকম চুপ-চুপ করে—

কর্নেল সরে এলেন সেখান থেকে। দৃশ্যটা দেখে হঠাৎ একটা চাঞ্চল্য বোধ করলেন মনের ভেতর। এমন এমন সুন্দর সব ঘটনা রোজ-রোজ কেন ঘটে না! এমন

চমৎকার সব দৃশ্যে কেন ভরে যায় না পৃথিবী!

সহসা শরীরের মধ্যে যেন সেই প্রথম যৌবনের মতো একটা উত্তেজনা বোধ করলেন। তার ধাক্কা সামলাতে গিয়ে তাঁকে বসে পড়তে হল কংক্রিটের বেঞ্চে। এ রকম আনন্দের দৃশ্যও কখনও কখনও মানুষকে বিহ্বল করে তোলে।

বেঞ্চের উপর বসে পড়ে বুঝতে পারেন, এবার সত্যিই বয়স হয়েছে তাঁর। শরীরের যন্ত্রপাতিগুলো আগের মতো ঠিকঠাক কাজ করছে না। এইট্টি ইয়ার্স—ইট'স অ্যা লং টাইম। অনেক কিছু দেখেছেন এ পৃথিবীর। অনেক অভিজ্ঞতা তিল-তিল করে জমা হয়েছে মনের ভাঁড়ারে। এনাফ ইজ এনাফ। আরও বেশিদিন বেঁচে থাকা মানে আরও শোক-তাপ-দুঃখ সহ্য করা।

তাঁকে বসে থাকতে দেখে সুরঞ্জন হঠাৎ কাছে এসে দাঁড়াল, কী হল কর্নেলদা, শরীর খারাপ লাগছে নাকি?

তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালেন কর্নেল, নো, মাই বয়, ঠিকই আছি। চল, আজ একটু আগে আগে বাড়ি ফিরি।

—চলুন, সুরঞ্জন তাঁর পাশে-পাশে এগোয়। ম্যাকসাহেবের বাংলোবাড়ি ছেড়ে দুজনে গিয়ে পৌঁছল ডায়মণ্ডহারবার রোডের ওপর। আর সেই মুহূর্তে হঠাৎ সুরঞ্জনের মনে হল, পা-দুটো কেমন টলছে কর্নেলের। আর ভাবতে-না-ভাবতে হঠাৎ তাঁর সমস্ত শরীরটা দুলে উঠল।

সুরঞ্জন ধরে ফেলল তৎক্ষণাৎ। ছ-ফুট শরীরটা জাপ্টে ধরতে তাকে বেশ হিমশিম খেয়ে যেতে হল। ভাগ্যিস একটা খালি রিকশ পেয়ে গেল তখনই। তাতে কর্নেলকে কোনওক্রমে বসিয়ে তাঁর পাশে উঠে বসল, চলুন, কোনও ডাক্তারের চেম্বারে নিয়ে যাই আপনাকে। খুবই অসুস্থ আপনি।

কর্নেল ততক্ষণে নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়েছেন। বাধা দিয়ে বললেন, আপাতত কোনও দরকার নেই। বাড়ি গিয়ে কিছুক্ষণ রেস্ট নিলেই ঠিক হয়ে যাবে। বুড়োবয়সে এ রকম দু-চারবার গা-মাথা টলে যায়। ডোন্ট ওরি ফর দ্যাট।

ম্যাকসাহেবের মাঠ থেকে ব্রজমণি দেব্যা রোডের দূরত্ব রিকশয় মিনিট পাঁচেকের বেশি নয়। সুরঞ্জন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে এল। রিকশভাড়া মিটিয়ে তাঁকে পৌঁছে দিল সিঁড়ির গোড়ায়, কিন্তু তবু আজ নিশ্চিন্ত হতে পারল না, বলল, চলুন, ঘর পর্যন্ত পৌঁছে দি—

অন্যদিন হলে কর্নেল বলতেন, না সুরঞ্জন, দরকার নেই। কিন্তু আজ বললেন না। সুরঞ্জন তাঁর হাত ধরে নিয়ে গেল দোতলায় তাঁর শোয়ার ঘরটিতে। আর আশ্চর্য, বাধ্য ছেলের মতো কর্নেল গিয়ে প্রথমে তাঁর বিছানায় বসলেন, তারপর আস্তে আস্তে

শুয়েও পড়লেন। সুরঞ্জনের মনে হল, তিনি হাঁপাচ্ছেন একটু একটু।

কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কর্নেলের দিকে তাকিয়ে কী যেন জরীপ করল সুরঞ্জন, তারপর বলল, ডাক্তারকে একবার কল দেয়াই ভাল বলে মনে হচ্ছে, কর্নেলদা। অকারণে রিস্ক নেওয়ার দরকার কী। একা একা থাকেন যখন—

কর্নেল হাসলেন, ঠিক আছে, ফর ইয়োর স্যাটিস্‌ফেকশন—, ওই ডায়েরিটায় আমার হাউস ফিজিসিয়ানের টেলিফোন নম্বর আছে—

ডায়েরি খুলে নম্বর বার করে টেলিফোন করল সুরঞ্জন।

ডাক্তারকে খবর দেওয়ার পর রিসিভার রাখতেই কর্নেল হাসলেন, ডাক্তার আসা মানেই একগুচ্ছের টাকা আর ওষুধ। তা তুমি যখন নাছোড়বান্দা—

সুরঞ্জন সে কথা মানতে চাইল না, তবু ডাক্তার এসে একবার চেক-আপ করে যাওয়াই ভাল।

কর্নেল ঘাড় নাড়লেন, ঠিক আছে। তবে বুঝলে সুরঞ্জন, আমি কিন্তু মনে মনে তৈরি হয়ে গেছি। বুঝতেই পারছি, ওপারের ডাক আসতে খুব বেশি দেরি নেই আর। এনি ডে, এনি মোমেন্ট। আর চলে যাওয়ার এখনই সেরা সময়। আর, বলে একটু থামলেন কর্নেল, তোমাকে যখন বাড়িতে পেয়েছি, কয়েকটি জরুরী কথা বলে রাখি। দ্যাখো, ওই যে বইয়ের আলমারিটা আছে, ওর ওপরের তাকে কয়েকটা পোস্টকার্ড লিখে রেখেছি। সবসমেত চুয়াল্লিশটা। গত কয়েকদিন ধরে ভেবে ভেবে এই চুয়াল্লিশ জনের নাম মনে করতে পেরেছি, যারা আমার সত্যিকারের ওয়েল-উইশার। পোস্টকার্ডগুলিতে প্রত্যেকের নাম-ঠিকানাও লিখে রেখেছি। প্রত্যেকটি চিঠির বিষয়বস্তু একই। সেটা আমার মৃত্যুসংবাদ। যদি আজ, কাল বা দু-চার মাস পরেও মারা যাই, তবে তুমি এই চিঠিগুলো পোস্ট করে দেবে। খবরটা তারা জানলেই শুধু হবে। আর কিছুরই দরকার নেই। আর হ্যাঁ, আমি মারা গেলে সবাইকে বোলো, শ্রাদ্ধ করার কোনও দরকার নেই। এই ডায়েরিটায় আমি আমার পুত্র-কন্যাকে সব ইনস্ট্রাকশন দিয়ে গেছি। শুধু তোমরা, মাঠের সঙ্গীরা, খবর পেলে দাহের ব্যবস্থা করবে। যদি পার, কয়েক মিনিট নীরবতা। ব্যস্‌।

সুরঞ্জন আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে থাকে কর্নেলের দিকে। মৃত্যুর আগেই কর্নেল এতসব আগাম ভাবনা ভেবে রেখেছেন! কেউ কি এমন ভাবতে পারে!

কর্নেলের চোখেমুখে তখন এক আশ্চর্য দ্যুতি। যেন বুঝতে পারছেন, খুব বেশিদিন আর থাকবেন না এই পৃথিবীতে। চলে যাবেন অন্য কোনও এক লোকে, এক পরম প্রাপ্তির সন্ধানে। সে যাওয়া যেন খুবই সহজ। যেমন লোকাল ট্রেন ধরে কোথাও বেড়াতে যায় মানুষ।